বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থায় সুশাসন ঃ সাম্প্রতিককালের (২০০১ - ২০০৬) সরকার ব্যবস্থার একটি বিশ্লেষণ

এম.ফিল থিসিস

GIFT

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. শওকত আরা হোসেন
অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

467413
Dhak University Library
467413

গবেষক

উম্মে মাকসুদা
প্রভাষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
সরকারি রাশিদাজ্জোহা মহিলা কলেজ
সিরাজগঞ্জ

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

অক্টোবর, ২০১২

DIGITIZED

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এম.ফিল গবেষক **উম্মে মাকসুদা** এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত **'বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থায় সুশাসন ঃ সাম্প্রতিককালের (২০০১ - ২০০৬) সরকার ব্যবস্থার একটি বিশ্লেষণ'** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি এম.ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার জন্য অনুমোদন করছি।

আমার জানামতে ইতোপূর্বে অন্য কোথাও এবং অন্য কোন ভাষাতে এই শিরোনামে এম.ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি।

467413

শওকত আরা হোসেন

(ড. শওকত আরা হোসেন)

অধ্যাপক

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ও

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা প্রদান করছি যে, **'বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থায় সুশাসন ঃ সাম্প্রতিককালের (২০০১ - ২০০৬) সরকার ব্যবস্থার একটি বিশ্লেষণ'** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার এ গবেষণাকর্মের পূর্ণ অথবা আংশিক কোথাও প্রকাশ করিনি।

(উম্মে মাকসুদা)

এম.ফিল গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ২০১
সেশন ঃ ২০০৪-২০০৫
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
সরকারি রাশিদাজ্জোহা মহিলা কলেজ
সিরাজগঞ্জ

467413

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যে কোন গবেষণা কর্মই জটিল। তাই এই কাজে অনেক আলাপ-আলোচনা, পরামর্শ, দিক নির্দেশনা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দারস্থ হতে হয়। এসব কর্ম প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে উল্লেখিত গবেষণা কর্মটি শেষ পর্যন্ত সমাপ্ত করতে পারলেও বেশ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে বলে এর মাঝে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক। গবেষণা কর্মটি সম্পাদনে আমি সর্বাগ্রে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্বরণ করছি আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. শওকত আরা হোসেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। যিনি শুরু থেকেই গবেষণা শিরোনাম নির্বাচন, তথ্য সংগ্রহ, পদ্ধতি নির্ধারণ, অধ্যায় বিন্যাস, তুলনামূলক আলোচনাসহ প্রতিটি পর্যায়ে যথেষ্ট ধৈর্য্যের সাথে তার মূল্যবান সময় দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। তার নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলে আমার গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। তার মতো একজন গতিশীল ও আন্তরিক তত্ত্বাবধায়কের অধীনে কাজ করতে পেরে আমি ধন্য এবং কৃতজ্ঞ।

আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমার সহদর উম্মে তাসলিমা, আমার সহপাঠী শেফা এবং আমার সহধর্মীর প্রতি, যারা সুচিন্তিত অভিমত, সহযোগিতা ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমার গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছে। আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি TIB-তে কর্মরত কুমার বিশ্বজিৎ দাসকে যিনি বিভিন্ন তথ্য দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। একইভাবে আমি ঋণী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সেখানে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের নিকট। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, পাবলিক লাইব্রেরি, TIB, Democracy Watch, AHD Publishing House, আইন ও সালিশ কেন্দ্র লাইব্রেরি, পার্লামেন্ট লাইব্রেরি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুস্তক-বিক্রয় কেন্দ্রের নিকট।

467413

(উম্মে মাকসুদা)

এম.ফিল গবেষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
সরকারি রাশিদাজ্জোহা মহিলা কলেজ , সিরাজগঞ্জ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ

তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এসব দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস উপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রামের ইতিহাস। জাতি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। ১৯৭৫-এর রাষ্ট্রীয় পট-পরিবর্তনের পর দেশে বিরাজ করছিল বিশাল রাজনৈতিক শূন্যতা। গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এই রাজনৈতিক শূন্যতার অবসান ছিল অপরিহার্য। রাজনীতিহীন অবস্থায় জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব নয়। বিগত ৪১ বছরে রাষ্ট্র ক্ষমতার হাত বদল হয়েছে সাংবিধানিক ও অসাংবিধানিকভাবে কিন্তু যা বদলায়নি তা হলো শাসকের শ্রেণি চরিত্র।

'৭৫ পরবর্তী সময় থেকে রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর রাজনীতিকরণ প্রবনতা লক্ষণীয়। কিন্তু '৯০ এর পর থেকে পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কারণে রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা হ্রাস পায়। ধর্ম নিরেপেক্ষতাকে অন্যতম আর্দশ হিসেবে গ্রহণ করে যে দেশের যাত্রা শুরু হয়েছিল সে দেশে এখন ধর্মভিত্তিক ও ধর্মের নামে রাজনীতি বাস্তব সত্যে পরিণত হয়েছে। বিগত ৪১ বছরের রাজনৈতিক পালা বদলকে কয়েকটি পর্যায়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ১৯৭২-১৯৭৫ পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য ছিল গণতন্ত্র পেয়ে হারানোর। কারণ '৭৫-এর জানুয়ারিতে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র থেকে একদলীয় শাসনের অধীন হয়। ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত ছিল উর্দিসহ ও উর্দি ছাড়া সামরিক ব্যক্তিত্বের শাসন। ১৯৯০ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত পর্যায়টি গণতন্ত্রের দ্বিতীয় অভিযাত্রা। ১৯৯৬ এর ১২ জুনের নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। আর ২০০১ থেকে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন।

যদিও বাংলাদেশে '৯০ দশক থেকে সুশাসন ব্যাপক পরিসরে আলোচিত হয় তথাপি তা সাম্প্রতিক কালের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। ২০০১ সালে জোট সরকার একটি অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচনে জয়লাভের মধ্যদিয়ে পূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশে ক্ষমতায় আরোহণ করে। যাকে সুশাসন প্রতিষ্ঠার সূচনা বলা যেতে পারে। তবে (২০০১-২০০৬) জোট সরকার সুশাসন বাস্তবায়নে কতটা আন্তরিক ছিল সেটি আলোচনার দাবী রাখে। সংসদীয় কার্যক্রমের বাধ্যবাধকতা রক্ষা করতে সংসদ অধিবেশন যথা নিয়মে ডাকা হলেও কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিকই লক্ষ্য করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

তাই গবেষণায় বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থায় সুশাসনের সমস্যা বিভিন্ন সরকারের শাসনকালে তাদের কার্যক্রম বিশেষভাবে জোট সরকারের (২০০১ - ২০০৬) সুশাসনের সাথে সম্পৃক্ততা নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষ করে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা ও জনকল্যাণে অষ্টম জাতীয় সংসদ (২০০১-২০০৬) কতটা কার্যকর এবং দুর্নীতি পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি এবং মানবাধিকারের ক্ষেত্রে এই সরকাররের ভূমিকা কি ছিল তা তুলে ধরা। যা বাংলাদেশের সুশাসন বাস্তবায়নকে মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রত্যয়নপত্র	i
ঘোষণাপত্র	ii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	iii
সারসংক্ষেপ	iv
সূচীপত্র	vi
প্রথম অধ্যায় ঃ	
১.১ ভূমিকা	১
১.২ যথার্থতা	৩
১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য	৪
১.৪ পুস্তক পর্যালোচনা	৫
১.৫ গবেষণা পদ্ধতি	১১
১.৬ তথ্য সংগ্রহ	১১
১.৭ সীমাবদ্ধতা	১২
১.৮ উপসংহার	১২
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ শাসন বিবর্তনের ইতিহাস ও সুশাসন	
২.১ শাসনের ধারণা ও বিবর্তন	১৩
২.২ শাসনের সংজ্ঞা	১৫
২.৩ সুশাসন	১৮
২.৪ সুশাসনের বৈশিষ্ট্য	২১
২.৫ সুশাসনের উপাদান	২২
২.৬ বাংলাদেশে সুশাসন	২৪
২.৭ বিভিন্ন ধরনের সুশাসন	২৭
২.৮ বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা	৩১
২.৯ বাংলাদেশে সুশাসনের সম্ভাবনা	৩৪
তথ্য নির্দেশিকা	৩৬

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় ঃ জেনারেল জিয়া ও জেনারেল এরশাদের শাসনামল

৩.১ জেনারেল জিয়ার শাসনামল (১৯৭৫-১৯৮১) ৩৯

৩.১.১ বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া ৪১

৩.১.২ সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী ৪৩

৩.১.৩ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ ও সেনা বিদ্রোহ দমন ৪৪

৩.২ দ্বিতীয় সামরিক শাসন ও জেনারেল এরশাদের শাসনামল (১৯৮২-১৯৯০) ৪৫

৩.২.১ জেনারেল এরশাদের রাজনৈতিক বৈধতা অর্জনের প্রক্রিয়া ৪৫

৩.২.২ গণভোট '৮৫ ৪৫

৩.২.৩ উপজেলা নির্বাচন '৮৫ ৪৬

৩.২.৪ রাজনৈতিক দল গঠন ৪৬

৩.২.৫ তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৮৬ ৪৭

৩.২.৬ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন '৮৬ ৪৮

৩.২.৭ চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন '৮৮ ৪৮

৩.২.৮ সংবিধানের সংশোধনীসমূহ ৪৮

৩.৩ ১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থান ৫০

তথ্য নির্দেশিকা ৫২

চতুর্থ অধ্যায় ঃ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়ন

৪.১ পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ৫৩

৪.২ খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ গঠন ৬১

৪.৩ সংসদ অধিবেশন ৬৪

৪.৪ পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি'র জয়লাভের কারণ ৬৫

৪.৫ নির্বাচনে বিদেশী পর্যবেক্ষকদের ভাষ্য ও পরাজিত দলের বক্তব্য ৭২

৪.৬ সংসদীয় কার্যক্রম (১৯৯১-১৯৯৬) ৭৪

৪.৭ খালেদা জিয়ার সরকার (১৯৯১-১৯৯৬) শাসন কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যাসমূহ ৮৩

Dhaka University Institutional Repository

৪.৮ খালেদা জিয়ার শাসনামলে হরতালঃ একটি বিশ্লেষণ ৯২
৪.৯ ধর্মঘট ৯৬
৪.১০ ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯৬ ৯৭
৪.১১ প্রধানমন্ত্রীর ৩ মার্চের ভাষণ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাসে সম্মতি ১০২
৪.১২ রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনোত্তর সমঝোতার উদ্যোগ ১০৪
৪.১৩ অসহযোগ আন্দোলন ঃ আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিনতি ১০৭
৪.১৪ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী ১০৯
৪.১৫ খালেদা জিয়ার পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন ১১১
৪.১৬ ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১১৩
তথ্য নির্দেশিকা ১১৫

পঞ্চম অধ্যায় ঃ অষ্টম জাতীয় সংসদ (২০০১ - ২০০৬) ১১৮
৫.১ অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০১ ১২০
৫.১.১ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন ১২০
৫.১.২ নির্বাচনী তফসিল ১২১
৫.১.৩ নির্বাচনী প্রতীক ও প্রার্থিতা ১২১
৫.১.৪ নির্বাচনের ফলাফল ১২৩
৫.১.৫ নির্বাচন পরবর্তী প্রতিক্রিয়া ১২৪
৫.২ অষ্টম জাতীয় সংসদ কার্যক্রম (২০০১ - ২০০৬) ১২৬
৫.২.১ অষ্টম সংসদে কার্যদিবস ও কার্যসময় ১২৭
৫.২.২ বাজেট উপস্থাপন ও এর ওপর আলোচনা ১২৯
৫.২.৩ আইন প্রণয়ন ১৩৩
৫.২.৪ রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় সংসদ নেতার ভাষণ ১৩৮
৫.২.৫ অনির্ধারিত ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয় উত্থাপন ১৪৬
৫.২.৬ ওয়াকআউট ১৪৯

Dhaka University Institutional Repository

৫.২.৭ বয়কট বা সংসদ বর্জন ১৫৪
৫.২.৮ কোরাম সংকট ১৫৫
৫.২.৯ সংসদ সদস্যদের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ ১৫৭
৫.২.১০ মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব ১৬১
৫.২.১১ অষ্টম সংসদে সংসদীয় কমিটি গঠন প্রক্রিয়া ১৬৩
৫.৩ সংসদকে কার্যকর করার জন্য সুপারিশ ১৬৫
৫.৬ সংসদীয় কমিটি কার্যকর করার লক্ষ্যে সুপারিশ ১৬৭
তথ্য নির্দেশিকা ১৬৮

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ সুশাসন ও বাংলাদেশ

৬.১ দুর্নীতি পরিস্থিতি (২০০১ - ২০০৬) ১৭০
৬.১.১ দুর্নীতির সংজ্ঞা ১৭২
৬.১.২ বাংলাদেশে দুর্নীতি পরিস্থিতি ১৭৫
৬.১.৩ দুর্নীতির ফলে সৃষ্ট ক্ষতির ধরন ১৮০
৬.১.৪ দুর্নীতির কারণ ও ধরন ১৮১
৬.২ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি (২০০১ - ২০০৬) ১৮৫
৬.২.১ সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ১৮৫
৬.২.২ কৃষি ১৮৭
৬.২.৩ বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ ১৮৭
৬.২.৪ শিল্প ১৮৮
৬.২.৫ স্থল বন্দর ১৮৯
৬.২.৬ দারিদ্র্য বিমোচন ১৯২
৬.৩ বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও
ইসলামী জঙ্গিবাদ (২০০১-২০০৬) ১৯৪
৬.৩.১ খালেদা জিয়া শাসনামল (২০০১-২০০৬) ১৯৪
৬.৩.২ ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ঃ সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপট ১৯৫
৬.৩.৩ ইসলামী জঙ্গিবাদ ১৯৮

Dhaka University Institutional Repository

৬.৩.৪ হুজিবি ১৯৯

৬.৩.৫ জেএমবি ১৯৯

৬.৩.৬ সার্বিক পর্যালোচনা ২০০

৬.৪ মানবাধিকার পরিস্থিতি (২০০১ - ২০০৬) ২০১

৬.৪.১ গণমাধ্যমের অধিকার ২০১

৬.৪.২ হাজতী ও কয়েদীদের অধিকার ২০৫

৬.৪.৩ নারীর অধিকার ও নারী নির্যাতন ২০৮

৬.৪.৪ সংখ্যালঘুদের অধিকার ২১১

তথ্য নির্দেশিকা ২১৬

সপ্তম অধ্যায় ঃ উপসংহার ২১৮

পরিশিষ্ট ২২৪

গ্রন্থপঞ্জি ২২৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

১.১ ভূমিকা ঃ

সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সার্বভৌম বাংলাদেশের রক্তাক্ত অভ্যুদয়ের এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অকৃত্রিম গণতান্ত্রিক জীবন ধারার প্রতিষ্ঠা। প্রাক ১৯৭১ সালের অখন্ড পাকিস্তান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পত্তন করতে ও চালু রাখতে ব্যর্থ হয়। স্বৈরতন্ত্রী ও একদেশদর্শী পাকিস্তান নেতৃত্ব বাংলাদেশকে এক অন্তর্লীন উপনিবেশে পরিণত করে। ফলে এ অঞ্চলের জনগণ শোষণ, বঞ্চনা ও নিপীড়নের শিকার হয়। এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের বাঙালি গড়ে তোলে প্রবল প্রতিরোধ। পাকিস্তানি শাসক ও শোষক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে তারা গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়নে উদ্যোগী হয়।

দুঃখের বিষয় এই যে, বিভিন্ন কারণে মুক্তি সংগ্রামে বিজয়ের ৪০ বছর পরও সফল গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সফল হয়ে ওঠেনি। নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ ব্যর্থতার মূল ও কেন্দ্রীয় কারণ রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকৃতি ও অবক্ষয়।

অতি সম্প্রতি উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে, শাসন প্রক্রিয়া শব্দটি নিয়ে বেশ তর্ক/বিতর্ক ও আলোচনা চলছে। বিষয়টি শাসন সম্পর্কিত আলোচনায় নতুন সংযোজিত হলেও তা মূলত বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার শুরু থেকেই এর ধারণা প্রসার লাভ করে।

বিশ্বব্যাংক ও দাতা দেশগুলো তাদের গবেষণায় দেখেন, অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি খারাপ শাসনের কারণে ব্যর্থ হয়েছে। তাই দাতা দেশগুলো ও বিশ্বব্যাংক ঐ দেশগুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কতগুলো কাঠামো গ্রহণ করেছে। ৯০ এর দশকে এর উদ্ভব বিকাশ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালের একের পর এক যে সমস্ত ঘটনা ঘটে চলছে, তা মূলত সুশাসনের অভাবের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ১১ জানুয়ারির পটপরিবর্তনের আগে জনগণের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ এমন সব বিষয় ও সমস্যাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত যে, যা প্রথাগতভাবে রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। যেমন বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের অপ্রতুলতা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যের উর্ধ্বগতি ইত্যাদি। ২০০৬ সালে এসব বিষয়কে কেন্দ্র করে কানসাট, শনির আখড়া, মিরপুর, গাজীপুর, আশুলিয়া,

Dhaka University Institutional Repository

সাভার, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে যে স্বতঃস্ফূর্ত জনবিক্ষোভ ও সংঘর্ষ হয় তা দেশের রাজনীতিতে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তনের আভাস দেয়। ভাবাদর্শগত বিষয়গুলো, বিভিন্ন মতাদর্শের জাতীয় রাজনৈতিক নেতাদের ঐতিহাসিক মর্যাদা ও স্থান সম্পর্কিত বিতর্ক এবং সাংবিধানিক ও নির্বাচন সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থার সংস্কারের প্রশ্নগুলো গুরুত্ব যেন হ্রাস পেতে থাকে। জনগণের চোখে রাজনীতির কাঙ্ক্ষিত রূপটি ভিন্ন আকারে দেখা দেয়। তারা রাজনীতিকে মূলত এমন এক প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করে যার মূল ও অন্তিম লক্ষ্য জনজীবনে উন্নয়ন ও কল্যাণ আনা। জনমনে রাজনীতির ধ্যান-ধারণার এ পরিবর্তন আকস্মিক কিছু ছিল না। সে সময়ে অস্তিত্ববান রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়ার ব্যর্থতাই এ পরিবর্তনের মূল কারণ হিসাবে কাজ করে। ওই ব্যবস্থাকে জনকল্যাণ ও উন্নয়ন কাজে লাগাতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিফল হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞনের পরিভাষায় 'গুড গভর্নেন্স' বা সুশাসনের যে কথা বলা হয়েছে, সেই সুশাসনের বড় অভাব এই দেশটিতে। আইন আছে, কিন্তু আইনের প্রয়োগ নেই। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব সুশাসনকে বিঘ্নিত করছে। মৌলিক অধিকার বাধাগ্রস্থ হচ্ছে, দুর্নীতি সমাজকে গ্রাস করছে। এসব কিছুর পেছনে রয়েছে সুশাসনের অভাব। রাজনীতির নামে এখানে চলছে উচ্ছৃঙ্খলতা, চাঁদাবাজি, ট্রেড ইউনিয়ন ইজম এর নামে এখানে জন্ম হয়েছে মাস্তানতন্ত্রের। রাজনীতি, প্রশাসন এখানে মাস্তাননির্ভর। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবাসগুলো আজ পরিণত হয়েছে সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্যে। সংসদ আছে, সেখানে সরকারি দল আছে, আছে বিরোধী দলও। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে রাজপথে, মন্ত্রিসভায়।

বাংলাদেশের এই যে ছবি, এই ছবি 'গুড গভর্নেন্স' বা সুশাসনের কথা বলে না। একটি নির্বাচন ও নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সরকার গঠনের নামই সুশাসন নয়। সুশাসন বলতে অনেক কিছু বোঝায়। বাংলাদেশে আজ প্রায় প্রতিটি সেক্টরে এই সুশাসনের অভাব অনুভূত হচ্ছে।

দেশে সুশাসন নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের সন্দেহ নেই। কিন্তু বিরোধীদলের ভূমিকাও এতে রয়েছে। সেই সুবিধাকে ও উপক্ষো করা যাবে না। আমরা সুশাসন চাই। চাই এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা, যেখানে মানুষের অধিকার নিশ্চিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১.২ যথার্থতা ঃ

গত এক দশকের বেশি সময় ধরে সারা পৃথিবীতে সুশাসন নিয়ে নানা কথাবার্তা চলছে। মূলত রাষ্ট্রের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে এবং তার সমাধানে পন্থা বের করে রাষ্ট্রকে সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা ও সঠিক পরিচালনার মাধ্যমে উৎকর্ষের শীর্ষে পৌঁছে দেওয়াই শাসনের প্রধান কাজ। নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী গণঅভ্যুত্থানের পর প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্রের পথে বাংলাদেশের যাত্রার পর থেকে প্রধানত নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে সীমিত পরিসরে সুশাসন উচ্চারিত হতে শুরু করে। ঐ দশকে দু'টো গণতান্ত্রিক সরকারের অধীনে দেশ পরিচালিত হয়েছে। তাই গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে এবং সার্বিকভাবে রাষ্ট্র যন্ত্রের কাছে জনগণের প্রত্যাশা ছিল অনেক। কিন্তু ভোট প্রদানের মাধ্যমে জনগণের গণতন্ত্রের চর্চা সীমিত এবং প্রত্যাশিত নাগরিক অধিকার পূরণ হয়নি। জনগণ বরাবরই সুশাসন থেকে বঞ্চিত হয়েছে। যদিও সমাজ ও রাষ্ট্রে দুর্নীতি সব সময় ছিল। তবুও দেখা গেল নব্বই এর দশকের শেষের দিকে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক পরিসরে ব্যাপক দুর্নীতির কথা আন্তর্জাতিকভাবে প্রচার পেতে থাকে। ফলে নাগরিক সমাজ ছাড়াও আমাদের উন্নয়ন সহযোগী দাতা সংস্থা, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রভৃতির পক্ষ থেকে নানাভাবে বাংলাদেশের সামাজিক রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে দুর্নীতি হটানোর লক্ষ্যে সুশাসনের উপর গুরুত্ব আরোপ হতে থাকে। অষ্টম সংসদ নির্বাচনের পর থেকে দেশে আইন শৃঙ্খলার আরো অবনতি ঘটে। বেড়ে যায় প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি। সারাদেশে সার্বিকভাবে অস্থিরতা বেড়ে যায়। বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। আর এসবের সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত হয় বিশ্বব্যাপী আর্থ-রাজনৈতিক অস্থিরতা। বর্তমানে দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহ বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণদানের জন্য যেসব শর্ত উল্লেখ করেছে তার মধ্যে সুশাসন অন্যতম। ১৩ মার্চ ২০০২ প্যারিসে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ দাতা গোষ্ঠীর বৈঠকে "সুশাসনের অভাব ও ব্যাপক বিস্তৃত দুর্নীতিকে বাংলাদেশের জাতীয় অনুন্নয়নের প্রধান ইস্যু হিসেবে তুলে ধরেছে। সুতরাং বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থায় সুশাসনঃ সাম্প্রতিককালের (২০০১-২০০৬) সরকার ব্যবস্থা বিশ্লেষণের দাবী রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য ঃ

সাধারণ উদ্দেশ্য ঃ

প্রস্তাবিত গবেষণার সাধারণ উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে সুশাসন কেন প্রয়োজন সেই সাথে সুশাসনের পথে অন্তরায়গুলোকে চিহ্নিত করে তা সমাধানের পথ নির্দেশ করা।

বিশেষ উদ্দেশ্য ঃ

গবেষণার সাধারণ উদ্দেশ্যের আলোকে বিশেষ উদ্দেশ্য সমূহ নিম্নরূপঃ

- সাধারণ জনগণের সচেতনা বৃদ্ধি করা।
- আইন-শৃঙ্খলা, জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতার অভাবের প্রধান কারণ অনুসন্ধান করা।
- সাম্প্রতিককালের দুর্নীতির মাত্রা নির্ধারণ এবং শাসন ব্যবস্থায় এর প্রভাব ব্যাখ্যা করা।
- ২০০১-২০০৬ সরকার আমলে জঙ্গিবাদের উত্থান, বিস্তার এর প্রতিরোধ এবং সুশাসনের সম্পর্ক তুলে ধরা।
- সার্বিকভাবে সাম্প্রতিককালের (২০০১-২০০৬) সরকার সুশাসনের ক্ষেত্রে কতটা কার্যকর, তার ব্যাখ্যা করা।

Dhaka University Institutional Repository

১.৪ পুস্তক পর্যালোচনা ঃ

সমাজ বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণের পর বিজ্ঞান ভিত্তিক ও পদ্ধতিগতভাবে কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রাথমিক বইপত্রের পর্যালোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সকল বইপত্র পর্যালোচনা থেকে নির্বাচিত গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এছাড়া গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট বই পুস্তক, জার্নাল, প্রবন্ধ ইত্যাদি থেকে অনেক ধারণা পাওয়া যায় যা গবেষণা কর্মকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করে। আলোচ্য বিষয়ের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত তেমন কোন গবেষণা কর্ম পাওয়া যায়নি। তথাপি বিষয়টির সাথে পরোক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত কতিপয় গবেষণামূলক কর্মের পর্যালোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

1. V.A Pai Pannandiketc (ed.), *Problems of Governance*, University Press Limited, 2000.

দক্ষিণ এশিয়ার পাঁচটি দেশের শাসন সমস্যার ক্ষেত্রে বিদ্যমান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে এই সংকলন গ্রন্থটির সমীক্ষায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। সমীক্ষিত দক্ষিণ এশিয়ার পাঁচটি দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ও শ্রীলংকা এই পাঁচটি দেশ কতিপয় বিষয়ে শাসন ক্ষেত্রে একই সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। গ্রন্থটিতে দক্ষিণ এশীয় শাসন সমস্যাকে আঞ্চলিক প্রেক্ষিতে দেখা হয়েছে। শাসনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সমস্যা সীমাহীন। যে সকল সমস্যা প্রধান এবং দক্ষিণ এশীয় জনগণের জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত তা গ্রন্থটির বিষয়বস্তু হিসেবে আলোচিত হয়েছে। সম্পাদক সমাপ্তি অধ্যায়ে পনেরটি মৌলিক সমস্যা চিহ্নিত করেন। দক্ষিণ এশিয়ার জন্যে ন্যূনতম আটটি কর্মসূচি গ্রহণের নির্দেশনা দিয়েছেন। গ্রন্থটির দ্বিতীয় অধ্যায় দক্ষিণ এশীয় জনতান্ত্রিক সমস্যা, তৃতীয় অধ্যায়ে দক্ষিণ এশিয়ার গণতন্ত্রের কার্যকারিতা, চতুর্থ অধ্যায়ে শাসন প্রতিষ্ঠানসমূহ, পঞ্চম অধ্যায়ে দক্ষিণ এশীয় রাজনৈতিক দল ও শাসন, ষষ্ঠ অধ্যায়ে সামরিক বাহিনী ও শাসন, সপ্তম অধ্যায়ে দক্ষিণ এশিয়ার শাসন ও সন্ত্রাসের উত্থান, অষ্টম অধ্যায়ে দক্ষিণ এশিয়ার উপ-জাতীয় (SWB National) গোষ্ঠীর পরিচিতি ও শাসন সমস্যা, নবম অধ্যায়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দক্ষিণ এশিয়ার অপশাসন ও উন্নয়ন, দশম অধ্যায়ে দারিদ্র্য বৃদ্ধি ও শাসন, একাদশ অধ্যায়ে শিক্ষা, ক্ষমতায়ন ও শাসন, দ্বাদশ অধ্যায়ে শাসনের সমস্যা এবং দক্ষিণ এশিয়ার জন্য কর্মসূচি শিরোনামে আলোচ্য বিষয়কে বিন্যস্ত করা হচ্ছে। গ্রন্থটিতে বলা হয়েছে, শাসন সমস্যার মূলে রয়েছে রাজনীতি। রাজনীতি ও সুশাসন কিছু কিছু ক্ষেত্র ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দ্বন্দ্ব অবস্থায় রয়েছে। রাজনীতির সামান্য ক্ষেত্রেই সামাজিক ন্যায়

Dhaka University Institutional Repository

বিচার পরিলক্ষিত হয়। এ লক্ষ্যে কার্যকর অর্থনীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা নেই। আরো বলা হয়েছে, রাজনীতিবিদ্যায় এজেন্ডা সীমিত শুধু ক্ষমতার ক্ষেত্রে।

২. আতিউর রহমান, *সুশাসনের সন্ধানে,* ঢাকা ঃ অন্য প্রকাশ, একুশে বইমেলা ২০০৩ - এই গ্রন্থে বাংলাদেশে সামাজিক পুঁজির বিকাশ ঘটিয়ে মানুষের জন্য উন্নয়নের পক্ষে জোরালো যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেছেন বইটিতে। তিনি বইটিতে এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্র ও সমাজের পারস্পারিক অবস্থান তুলে ধরলেও মূলত বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও সুশাসনের মধ্যকার সম্পর্ক, গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিক সমাজের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বইটিতে সুশাসনের জন্য সরকারের আকার, সরকারি সংগঠনসমূহ, সরকারি কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা, নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, সুস্বাস্থ্য, সামাজিক পুঁজির ভূমিকা, গণ-মাধ্যমের ভূমিকা, নির্বাচন প্রক্রিয়া ও সুশাসন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, ঋণ খেলাপি সংস্কৃতি ইত্যাদির উপর আলোচনা করেছেন। এছাড়া কিভাবে জরুরি ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে লক্ষ্য অর্জন করা যায় তার উপর আলোকপাত করেছেন। সেই সাথে তিনি শর্তযুক্ত কাঠামোগত উন্নয়ন কর্মসূচির কারণে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিস্থিতি সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাধা সৃষ্টি করেছে তা উল্লেখ করেছেন।

৩. Dr. Gyasuddin Molla, Bangladesh's Imperiled Democracy: Change in Political culture and strengthening capacity Building-A-Sine Qua Non, *BPSR Journal,* Vol-3, No-1, December 2005 শিরোনামে মূলত বাংলাদেশের সংকটাপন্ন গণতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি ২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সরকারের কিছু গণতন্ত্র বিরোধী কার্যাবলীর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ২০০১ নির্বাচনে জয়লাভের পর বিএনপি সরকার গঠন করলে আওয়ামী লীগ সমর্থনকারী হিন্দু ও মুসলিমদের অপহরণ, লুট, হত্যা এবং সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। এই সময়কালে শাসক দল ব্যাপকভাবে দুঃস্কৃতিকারীদের মদদ যোগায়। দুর্নীতি সর্বত্র বিস্তার লাভ করে যা আইন-কানুন, মানবাধিকার পরিস্থিতি তথা গণতান্ত্রিক পরিবেশকে দূষিত করে তোলে। এভাবে দেশের জন-জীবনের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে পড়ে। এরূপ পরিস্থিতিতে বিরোধী দল সংসদ বর্জন করতে বাধ্য হয় এবং আইনসভা অকার্যকর হয়ে পড়ে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়। সর্বোপরি বিএনপি সরকার (জোট সরকার) ২০০১-২০০৫ এ সময়কালে পুলিশ, নিম্ন আদালত সব কিছুই দলীয় স্বার্থে

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহার করে। আইনের শাসন লংঘিত হয় এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতাও প্রদান করা হয়নি। উল্লেখিত Article টিতে এই রূপচিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

৪. Prof. A.K.M Shahidullah, Corruption and Development: Bangladesh Perspective, *BPSR Journal*, Vol-3, No-1, December 2005.

Article - এ ২০০১ - ২০০৫ চারদলীয় ঐক্যজোটের কার্যালীর বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। জোট সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সরকারের দুর্নীতি এবং অব্যবস্থাপনা বহাল রেখেছেন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি আইন শৃঙ্খলার দিকটি তুলে ধরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বিশেষ বাহিনী RAB এর Cross Fire এর উল্লেখ করেছেন। যা আইনশৃঙ্খলার উন্নয়নে সাহায্য করে এবং জনগণ, বিভিন্ন সংস্থা দ্বারা প্রশংসিত হয় সেই সাথে দেশের কিছু উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরেন। যেমন- পরিবেশ দূষণ রোধ, পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার বন্ধ করা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ ১১২ মিলিয়ন থেকে ৩০০ মিলিয়ন US ডলার উন্নীত হয়।

অপরদিকে তিনি এই সরকারের সময়ে বিভিন্ন বোমা হামলার মাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলার নেতিবাচক চিত্র তুলে ধরেছেন। যেমন- সিলেটে বোমা হামলা, যে হামলায় বৃটিশ হাই কমিশনার আহত হন। তিনি ২১ আগস্ট ২০০৪ আওয়ামী লীগের জনসভায় গ্রেনেড হামলার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখ্য এই সমস্ত বোমা/গ্রেনেড হামলার তদন্ত হলেও তার রিপোর্ট পেশ করেনি বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

৫. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ও খন্দকার মোয়াজ্জেম ঃ *বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিনিয়োগ প্রবাহ গতি প্রকৃতি ও প্রভাব,* পেপার ৫৭, CPD Occasional Paper Series, ফেব্রুয়ারি ২০০৬ তে সুশাসন ও বৈদেশিক বিনিয়োগ নিয়ে কিছু তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সাধারণত একটি দেশে ভৌত অবকাঠামোর দূর্বলতার জন্য বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি পায়, এবং সংঘাতপূর্ণ অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ বিনিয়োগের পরিবেশের অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে অতিরিক্ত উপার্জনের মানসিকতা থাকায় লেনদেন ব্যয় প্রভাবিত করছে এবং সবকিছু বিনিয়োগকে প্রভাবিত করছে। এই কারণে প্রতিষ্ঠানগুলো সুশাসনের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে। সুতরাং বাংলাদেশের বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হলে সুশাসন প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

৬. **www.albd.org** "বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সাড়ে চার বছরের সংবিধান লংঘন দুঃশাসন হত্যা, সন্ত্রাস, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, দুর্নীতি-দলীয়করণ এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং প্রতারণার বিবরণ" এই শিরোনামে আওয়ামী লীগ, বিএনপি-জামায়েত জোটের কার্যাবলী তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে সংবিধান লংঘন, গণতন্ত্র হত্যা, সংসদের কার্যকারিতার বিঘ্ন ঘটানো, হত্যা, সন্ত্রাস ও মানবাধিকার লংঘন ইত্যাদির চিত্র তুলে ধরেছেন। এই সরকার আমলে সংগঠিত বিভিন্ন উগ্র সাম্প্রদায়িক জঙ্গি গোষ্ঠীর হামলাসমূহের বর্ণনা দিয়েছেন এবং RAB এর বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ডের সমালোচনা করেছেন। এছাড়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি (সিন্ডিকেট) এবং জনজীবনের প্রভাব তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি দলীয়করণ, পুলিশ প্রশাসন, বিচার বিভাগ, কর্মকমিশন, মন্ত্রীবর্গ ও হাওয়া ভবনের দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরেছেন এই লেখাটিতে।

৭. **মোহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার, *সন্ত্রাস দুর্নীতি ও আগ্রাসন*, ঢাকা ঃ আখতার পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারি ২০০১** গ্রন্থে সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও আগ্রাসন বিষয়ে তার কতিপয় প্রকাশিত প্রবন্ধ সংকলিত করেছে। প্রবন্ধগুলো চারদলীয় জোট ক্ষমতায় আসার দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বছরে লেখা। মোট ৩৫টি প্রবন্ধের এর মধ্যে ২১টি সন্ত্রাস বিষয়ে, ৭টি করে প্রবন্ধ দুর্নীতি ও আগ্রাসন বিষয়ে লেখা। সন্ত্রাস বিষয়ক লেখাগুলো ২০০৫ এর মধ্য আগস্টের দেশব্যাপী বোমা হামলা, ২০০৪ এর ২১ আগস্ট আওয়ামী সমাবেশে গ্রেনেড হামলা, সিলেটের হবিগঞ্জের গ্রেনেড হামলা, জঙ্গি তৎপরতা, র‍্যাবের কার্যক্রম, ক্রসফায়ার, সন্ত্রাস দমনে সরকারের ব্যর্থতা- সাফল্য, গ্রেনেড হামলার তদন্ত, তোরণ কালচার ও সন্ত্রাস বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে লেখা। দুর্নীতি বিষয়ক লেখাগুলো হচ্ছে দুর্নীতিবাজদের ভালো থাকা, স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন ও এর কার্যক্রম, দুর্নীতি দমন ব্যুরোর সক্রিয়তা প্রভৃতি বিষয়ের ওপর।

৮. **মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত, *গণতন্ত্র*, ঢাকা ঃ মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৬** *সংকলনে* গণতন্ত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রবন্ধ সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোকে দৃশ্যমান নানা সমস্যার ভিত্তিতে "গণতন্ত্র" বিষয়টাকে এই গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রফেসর তালুকদার মনিরুজ্জামান তাঁর প্রবন্ধে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বর্তমান সংকট এবং ১৯৯০ সালে যে সংকটের কথা বলা হয়েছে তা সম্পর্কে একটি চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদ বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সমস্যা ও বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সরকারের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অবস্থা পর্যালোচনা করে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকারের পক্ষে সমর্থন করেছেন। তাঁর মতে, স্থিতিশীল সরকারের জন্য সংসদীয় ব্যবস্থা উপযুক্ত নয়।

প্রফেসর ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন তাঁর প্রবন্ধে বাংলাদেশে গণতন্ত্র চর্চা যে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি পায়নি তার উপর আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে স্বৈরাচার ও গণতন্ত্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

জনাব আহমদ রফিক গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তিনি মনে করেন গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অন্ধকার এবং বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে দেশে আবার স্বৈরতন্ত্র অথবা ধর্মীয় রাজনীতি প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী মনে করেন সব জিনিসের মতো গণতন্ত্রের ও বাড়তি কমতি রয়েছে। পৃথিবীর দেশে দেশে গণতন্ত্র কিভাবে কাজ করছে, তাও এসেছে তাঁর প্রবন্ধে।

বিচারপতি মোস্তফা কামাল তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন, চূড়ান্তভাবে রাজনীতি হল সমঝোতায় পৌঁছার একটা আর্ট। গণতন্ত্র কার্যকর থাকে না যদি রাজনৈতিক দলগুলো কোনো কিছু গ্রহণ করে কিছু প্রদান না করে।

প্রফেসর মাহ্‌বুব উল্লাহ গণতন্ত্রের সংকটের পাশাপাশি সম্ভাবনার ব্যাপারেও আশাবাদী। তিনি মনে করেন গণতন্ত্রের পথে কাঠামোগত অন্তরায়গুলো দূর করা গেলে প্রতিদ্বন্দ্বী এলিটেরা গণতান্ত্রিক উপায়ে তাদের ক্ষমতার লড়াই সীমাবদ্ধ রাখতে সক্ষম হবে।

জনাব মাহবুবুর রহমান তাঁর প্রবন্ধে সংসদীয় গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন । তিনি মনে করেন, সংসদকে পরিপূর্ণভাবে কার্যকর করার উপরই সংসদীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিহিত।

অধ্যাপক কামাল উদ্দিন সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধীদলের ভূমিকা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরেছেন তাঁর প্রবন্ধে।

গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত হল ঃ সহনশীলতা। কিন্তু সেই সহনশীলতার সীমানা কতটুকু? প্রশ্ন তুলেছেন প্রফেসর সরদার ফজলুল করিম।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলো দলীয়ভাবে স্বেচ্ছাচার করে থাকে সেটাকে প্রকারান্তরে 'গণতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচার' বলে উল্লেখ করেছেন জনাব আহমদ ছফা।

Dhaka University Institutional Repository

বামপন্থী দৃষ্টিকোণ থেকে গণতন্ত্র সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন জনাব হায়দার আকবর খান রনো। তিনি পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের সংজ্ঞা অভিন্ন নয় বলে উল্লেখ করেছেন।

অধ্যাপক আল মাসুদ হাসান উজ্জামান তাঁর প্রবন্ধে বাংলাদেশে কমিটি ব্যবস্থার প্রকৃতি ও সংসদীয় কমিটিগুলোর কার্যপ্রণালী সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন ।

গণতন্ত্রের সংকট শুধু আমাদের দেশেই নয়। উন্নয়নশীল বিশ্বের বহু দেশে রয়েছে গণতন্ত্র বিকাশের সংকট। অভ্যন্তরীণ নানা সংকটের কারণে এই বিকাশ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। উন্নয়নশীল বিশ্বের গণতন্ত্রের সংকটের মূল্যায়ন করেছেন ড. তারেক শামসুর রেহমান।

ড. হাসান উজ্জামান লিখেছেন গণতন্ত্রের ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে। প্রকৃত গণতন্ত্র একবারের সংগ্রামের বা কেবলই ভোটের বিষয় নয় বরং জনগণের নিত্য দিনের গণভোটের মাধ্যমে জবাবদিহিতামূলক ও স্বচ্ছ সরকারি কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব।

সংসদীয় বা যেকোনো গণতন্ত্রের একটা শর্ত হল যে, গণমাধ্যম মুক্ত ও স্বাধীন হতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশের গণমাধ্যম গণতান্ত্রিক আমলে কতটা স্বাধীন; এ ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন জনাব মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর।

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে এথেন্সে যে গণতন্ত্রের সূচনা হয় তার সূত্র ধরে বিশ্বের নানা দেশে কিভাবে গণতন্ত্র বিকশিত হয়েছে তা সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে বর্ণনা করেছেন শফিক রেহমান।

প্রফেসর ড. শওকত আরা হোসেন "গণতন্ত্র ও বাংলাদেশ" প্রবন্ধে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের প্রকৃত অবস্থা কী তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। পাশাপাশি পশ্চিমের গণতন্ত্রের সাথে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

১.৫ গবেষণা পদ্ধতি ঃ

সকল গবেষণার ক্ষেত্রে একই রকম পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় না। গবেষণা বিষয়বস্তুর সাথে সংগতি রেখে পদ্ধতি নির্বাচন করতে হয়। এ ক্ষেত্রে গবেষণায় পদ্ধতি নেয়া হয়েছে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি।

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি ঃ

প্রাথমিক তথ্যে পাওয়া বিষয়বস্তুর রীতিবদ্ধ, বস্তুনিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করাকে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি বলা হয়।

বৈশিষ্ট্য ঃ

(১) নির্ভুল তথ্য প্রদান করে।

(২) প্রাথমিক তথ্য এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, বুলেটিন, নিউজ লেটার সাময়িকী ইত্যাদিতে প্রকাশিত তথ্য থেকে সমাজের কোন বিষয়ে গবেষণা করা যায়।

যেহেতু (২০০১-২০০৬) সরকারের উপর লিখিত বই পত্রের সংখ্যা অনেক কম তাই গণমাধ্যম, সংবাদপত্র ও সাময়িকীতে প্রকাশিত বিভিন্ন ঘটনার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সুতরাং আমার গবেষণার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির ব্যবহার অপরিহার্য।

১.৬ তথ্য সংগ্রহ ঃ

মূলত প্রাথমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন বই, জার্নাল, সংবাদপত্রের উপর নির্ভর করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৭ সীমাবদ্ধতা ঃ

যে কোন সামাজিক গবেষণা কাজ পরিচালনা করার ক্ষেত্রে গবেষনার মধ্যে কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। "বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থায় সুশাসনঃ সামপ্রতিককালের (২০০১-২০০৬) সরকার ব্যবস্থার একটি বিশ্লেষণ" শিরোনামে গবেষণার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। সীমাবদ্ধতা সমূহ নিম্নরূপঃ

(ক) সুশাসন একটি ব্যাপক প্রক্রিয়া। কিন্তু আমার গবেষণায় বাংলাদেশের সুশাসনের আলোকে শুধু (২০০১-২০০৬) বিএনপি সরকারের শাসন ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

(খ) সুশাসন প্রক্রিয়া নিয়ে কিছু পুস্তক ও প্রকাশনা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে (২০০১-২০০৬) সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে লেখনীর সংখ্যা খুব বেশি নয়। তাই বিভিন্ন সংবাদপত্রের উপর নির্ভর করতে হয়েছে।

(গ) এই গবেষণা কার্য অনেকটা সংবাদপত্র ও গণমাধ্যম নির্ভরশীল কিন্তু বাংলাদেশের গণমাধ্যম ততটা স্বাধীন নয়।

১.৮ উপসংহার ঃ

সুশাসন একটি বহুমাত্রিক ধারণা। একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উপর সুশাসন নির্ভরশীল। তাই গবেষণায় বাংলাদেশের সুশাসন এবং জোট সরকারের (২০০১ - ২০০৬) শাসনামলে সুশাসনের সম্পৃক্ততা নির্ণয়ের লক্ষ্যে গবেষণা কর্মটি কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণা পদ্ধতি, দ্বিতীয় অধ্যায়ে শাসন ও সুশাসনের ধারণা এবং বাংলাদেশে সুশাসন প্রত্যয়টির বাস্তবতা, তৃতীয় অধ্যায়ে অগণতান্ত্রিক তথা সামরিক শাসনের চিত্র, চতুর্থ অধ্যায়ে গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন এবং গণতন্ত্রায়নের প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে, যা সুশাসন বাস্তবায়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে রয়েছে জোট সরকারের (২০০১ - ২০০৬) সংসদীয় কার্যক্রম ও সুশাসনের বিভিন্ন উপাদান, মানবাধিকার ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ শাসন বিবর্তনের ইতিহাস ও সুশাসন

চতুর্দশ শতাব্দী থেকে 'শাসন' শব্দটির সাথে সবাই কমবেশি জড়িত। শাসনের ক্ষেত্রে সবাই কমবেশি অংশগ্রহণ করতে পারে এবং এভাবে শাসনের দায়িত্ব ছড়িয়ে পড়ে। 'সরকার' (গভর্নমেন্ট) ও শাসন (গভর্ন্যান্স) পার্থক্য আছে। শাসন হচ্ছে প্রায়োগিক প্রক্রিয়া যা প্রভাবিত করে জননীতির ফলাফলকে এবং শাসনের ক্ষেত্র ও উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে স্বীকৃত।[১] শাসন বা গভর্ন্যান্স বলতে বোঝায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকে। শাসন বলতে শুধুমাত্র রাজনৈতিক শাসনকে বোঝায় না। আরও কিছু শাসন ব্যবস্থার ধারণা অন্তর্ভূক্ত হতে পারে, যেমন ঃ- আন্তর্জাতিক শাসন ব্যবস্থা, জাতীয় শাসন ব্যবস্থা, গণপ্রজাতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থা বা প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থা বা স্থানীয় শাসন ব্যবস্থাকে বোঝায়। আর এই শাসন ব্যবস্থার ধারণা গণতন্ত্রের সূতিকাগার নামে খ্যাত গ্রীক থেকে বেশিরভাগ গৃহীত। প্রাচীন গ্রীকে শাসন ব্যবস্থার মূলভিত্তির অস্তিত্ব পাওয়া যায়, যেমন- ন্যায় বিচার, স্বাধীনতা, সাংবিধানিক সরকার এবং আইনের মর্যাদা অথবা ন্যূনপক্ষে তাদের সংজ্ঞা সমূহ গ্রীক চিন্তাবিদগণের নগর রাষ্ট্র সর্ম্পকে ভাবনা হতে উদ্ভূত। তবে বলা যায় গ্রীক সভ্যতা থেকে রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারণা উদ্ভাবিত হতে দেখা যায়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, গ্রীক সমাজের পূর্বে রাষ্ট্রচিন্তার কোন ধারণা ছিল না। শাসক শাসিতের মতো না থাকলেও একটি সমাজ ছিল, যে সমাজ শাসন করত। শাসন কয়েক ধরনের হতে পারে রাজনৈতিক, অভিজাততান্ত্রিক, স্বৈরতান্ত্রিক, ধনিকতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক, জনতাতান্ত্রিক, একনায়কতান্ত্রিক। আর এ সমস্ত শাসন ব্যাবস্থায় জনগণ দেশ ও তাদের পরিবেশের উপর নির্ধারিত হয়। আর এ সমস্ত শাসন ব্যবস্থার মধ্যে অতি উত্তম সেটি হলো গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। যে দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা যত শক্তিশালি সে দেশে শাসন ব্যবস্থার সফলতাকেই সুশাসন বলা যায়।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সুশাসন প্রত্যয়টি অধুনাবহুল আলোচিত বিষয়। কারণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সমুন্নত রাখার জন্য সুশাসনের কোন বিকল্প নেই। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির পর হানটিংটনের ভাষায় যে 'তৃতীয়' ঢেউ গোটা বিশ্বকে টালমাটাল করে তুলেছে তা হচ্ছে গণতন্ত্র ও গণতন্ত্রায়নের প্রপঞ্চ। গণতন্ত্রকে কার্যকর ও অর্থবহ করে তুলতে হলে এবং গণতন্ত্রায়নের প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠু পদ্ধতিতে প্রাতিষ্ঠানিকতা দিতে হলে যে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সুশাসনকে নিশ্চিত করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

২.১ শাসনের ধারণা ও বিবর্তন ঃ

শাসন শব্দটি নতুন নয়। মানব সভ্যতার ক্ষেত্রে এটি একটি প্রাচীন বিষয়। শাসন শব্দটির ইংরেজী শব্দ হচ্ছে 'Governance' যার অর্থ হচ্ছে 'শাসন'। সে শব্দটিকে বৃহৎ পরিধি থেকে বিশ্লেষণ করলে বলা যায় যে, এগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে ক্ষমতার মাধ্যমে একটি কর্তৃত্বপূর্ণ কার্যাবলীর বন্টন। মূলত শাসন বা গভর্ন্যান্স ধারণাটি অতিমাত্রায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে ১৯৮০ সালের দিকে। বিশ্ব ব্যাংকের একটি রিপোর্টে শাসন বা গভর্ন্যান্স ধারণাটি উঠে আসে এবং রিপোর্টির নাম ছিল 'Sub-Saharan Africa : Crisis to Sustainable Growth' আর এর মাধ্যমে শাসন বা গভর্ন্যান্স ধারণাটি মূর্ত রুপ লাভ করে। সম্প্রতি ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারির দিকে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট 'Interim Staff Instruction on Governance' বিষয়টি উত্থাপন করেন এবং পরবর্তীতে প্রতিবেদন পত্র তৈরি করেন। ১৯৮০ এর দশকে বাজার অর্থনীতি ও কাঠামোগত সামঞ্জস্যের ধারণা যখন উত্থাপিত হয় তখন থেকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে শাসন সম্পর্কিত ধারণাটি বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠে। অতীতের সকল ত্রুটি ও বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে শাসন কাঠামোকে জনগণের কল্যাণে নিয়ে আসার জন্য অনেক এজেন্সী ও দাতা সংস্থা ৯০ এর দশকে শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি নতুন ধারণার অবতারণা করেন। আর এই ধারণাটি হলো শাসন। শাসন বলতে শুধুমাত্র রাজনৈতিক শাসনকে বোঝায় না, এটি হতে পারে আর্ন্তজাতিক, জাতীয় এবং স্থানীয় অর্থাৎ শাসন হলো কিভাবে সংগঠন চালিত হচ্ছে এবং এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য কি প্রক্রিয়া এবং কাঠামো ব্যবহার করা হচ্ছে। যেহেতু শাসন হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং বাস্তবায়নের একটি প্রক্রিয়া। সেহেতু যারা সিদ্ধান্ত প্রনয়ণকারী এবং যারা সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিয়োজিত থাকে তাদের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়ে থাকে শাসন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য অর্থাৎ জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকার যখন তার দায়িত্ব পালন করে তখন সরকারের মধ্যে শাসন বিষয়টি উঠে আসে। তবে এসকল কাজ শুধু মাত্র যে সরকার করবে তা নয় এছাড়াও আরও কিছু ক্রিয়াশীল গোষ্ঠী রয়েছে যারা কিনা গণমাধ্যমে, সমাজে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে, ব্যবসায়িক সংগঠনে জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ঠ বিভিন্ন বিষয়ে ভুমিকা পালন করতে পারে। শাসন ধারণাটি একটি আলাদা বিষয় হিসাবে দাঁড়ায় সরকারের ধারণা থেকে। সরকার যখন নাগরিকদের কাছ থেকে একটি দেশ পরিচালনা করার জন্য সংগঠিত হয় তখন তাকে শাসন বলে ।

Dhaka University Institutional Repository

২.২ শাসনের সংজ্ঞা ঃ

শাসনের বিষয়ে বিভিন্ন পন্ডিত ব্যক্তি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা বিভিন্নভাবে তাদের সংজ্ঞা প্রদান করেছে। বিভিন্ন সংজ্ঞার মধ্যে যে সংজ্ঞাগুলো সবচেয়ে বেশি প্রচলিত নিম্নে উল্লেখ করা হলো। উৎপত্তিগত অর্থে শাসন শব্দটি ল্যাটিন শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ "steering" যার অর্থ পরিচালনা। শাসন সম্পর্কে উইকিপিডিয়া, এনসাইক্লোপিডিয়ার মতানুসারে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সেটি হলো- Governance relates to decisions that define expectations, great power or verify performance. It consists either at a Separate process or of a Specific part of management or leadership process.[২]

বিশ্ব ব্যাংকের মতে শাসন হলো - 'Exercise of Political Power to manage nation's affairs.'[৩]

এছাড়াও শাসন হচ্ছে "The traditions and institutions by which authority in a country is exercised. Governance has been as the rules of the political system to solve conflicts between actors and adopt decision (legality). It has also been used to describe the proper functioning of been used to invoke the efficacy of government and the achievement of consensus by democratic means (participation).

বৃটিশ কাউন্সিল গভর্ন্যান্স সম্পর্কে সংজ্ঞা প্রদান করে এভাবে -

'Governance involves interaction between the formal institutions and those in civil society. Governance refers to process whereby elements in society yield power, authority, influence and enact policies and decisions concerning public life and social upliftment.'[৪]

কনসাইস অক্সফোর্ড অভিধান শাসনকে উল্লেখ করেছে এভাবে 'Act or manner of governing and the offices of function of governing.'[৫] এছাড়াও গভর্ণ্যান্স সম্পর্কে

Dhaka University Institutional Repository

"How peopled are ruled, how he affairs of the state are administered and regulated – in relation to public and administration and law."[৬]

Landell- Mills, P and Serageldin, I - এর মতে শাসন হলো- জনগণ কিভাবে শাসিত হয়, কিভাবে রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলী ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় এবং কিভাবে তা জনপ্রশাসন ও আইনের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে।[৭]

Oxford Dictionary অনুযায়ী-"শাসন হলো শাসন করার কাজ বা উপায় কাজ সম্পাদনের কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়মনীতিমূলক পদ্ধতি।"

অধ্যাপক রেহমান সোবহানের মতে "শাসন হচ্ছে একটি প্রায়োগিক প্রক্রিয়া যা প্রভাবিত করে জননীতির ফলাফলকে।"

সমাজ বিজ্ঞান বিশ্বকোষ অনুযায়ী শাসন বিষয়টি সংজ্ঞায়নে তিনটি পরিভাষা কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে জবাবদিহিতা, যাতে শাসক কর্তৃক শাসিতের উপর প্রভাবের কার্যকারিতা নিশ্চিত হয়, দ্বিতীয়টি হচ্ছে বৈধতা যাতে নাগরিকদের উপর ক্ষমতা চর্চায় রাষ্ট্রের অধিকার এবং এই ক্ষমতা চর্চা সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা তা টেনে দেয়া সীমারেখা দেখা হয় এবং তৃতীয়টি হচ্ছে স্বচ্ছতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের উপর নির্ভরশীল।

লোক প্রশাসনের একজন বিশেষজ্ঞ শাসন বিষয়টিকে সাতটি স্তরের এপ্রোচের মাধ্যমে দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন- শাসন ব্যবস্থা তখনই সহজ হবে যখন কি না জনগণকে সেবা করার জন্য নিম্নোক্ত সাতটি বিষয় থাকবে।

(ক) জনগণের অভাব এবং চাহিদা নিরুপন করাঃ

(খ) বাস্তবতার মাধ্যমে গন্তব্য স্থির করা যেটি কি না জনগণের ইচ্ছা পূরণ করে।

(গ) সফলতার জন্য বিভিন্ন বিষয় ঠিক করা।

(ঘ) সঠিক লোককে সঠিক জায়গায় কাজ দেয়া।

(ঙ) একটি কাজের সফলতার জন্য দায়িত্বশীল নেতার কাছে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা।

(চ) সময়মত সব কাজ করা।

Dhaka University Institutional Repository

(ছ) কাজকে সুন্দরভাবে করা যেন সেটা নিম্ন মানের না হয়। আর এ সমস্ত কাজকে সফল করতে পারে যে কোন দেশের জাতি। এছাড়াও অন্যান্য যে সকল স্তরগুলো রয়েছে সেগুলো হল-

> রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সম্পদের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনতাকে ব্যবহার করবে।

> সরকারের বিভিন্ন কার্যাবলীর মাধ্যমে নীতি নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন থাকবে এবং অন্যান্য সাধারণ কার্যাবলীগুলোও থাকবে। বিভিন্ন সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করলে শাসন ব্যবস্থার তিনটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেমন-

(ক) রাজনৈতিক

(খ) অর্থনৈতিক

(গ) প্রশাসনিক

শাসন ব্যবস্থা সমাজ তথা রাষ্ট্রের সবস্তরে জড়িত। এটি ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। চূড়ান্তভাবে বলা যায় শাসন বা গভর্ন্যান্স হলো ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের চর্চা যে ব্যবস্থা সমাজের মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত হবে। এটি অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে, শাসনব্যবস্থা রাষ্ট্রের একটি বৃহৎ অংশ। সরকার একটি ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠান। সরকার হলো জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা তারপর এটি জনগণের জন্য যখন পরিচালিত হয় তখন সেটা শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্র বিন্দু রূপে পরিগণিত।

পৃথিবীর যে কোন দেশের সরকার সব সময়েই প্রত্যাশা করে যে তাদের দ্বারা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হউক। সেই শাসন ব্যবস্থাকে কিভাবে আরও উন্নয়ন করা যায় সেজন্য যুগে যুগে সরকার সভ্যতার বিকাশে বিভিন্ন সময় উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করেছেন। সে কারণে তার ফলশ্রুতিতে প্রাচীন গ্রীক নগর রাষ্ট্রের উদ্ভব। তাই প্রাচীন গ্রীককে বলা হয় গণতন্ত্রের সূতিকাগার। প্রাচীন গ্রীসের সাথে সাথে বিশ্বের আরও বিভিন্ন দেশ তাদের নিজ নিজ প্রশাসনিক কাঠামো অনুযায়ী তাদের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেছে। বলা যায়, সময়ের পরিবর্তনীয় ধারায় চতুর্দশ শতাব্দীতে শাসন ব্যবস্থার ধারণা জনপ্রিয় হয়ে উঠে। যেটি কি না বিশ্বায়নের ধারায় ১৯৮০-র দশকে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে এ বিষয়টিকে বেশি ব্যবহার করতে দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

২.৩ সুশাসন ঃ

সুশাসন একটি গতিশীল এবং চলমান ধারণা। এটি শাসন ব্যবস্থার রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে। সুশাসন বলতে লোক প্রশাসনের রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলী সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনায় শুধু সীমিত নয় বরং এ বিষয়টি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহেও প্রসারিত। সুশাসন ধারণাটি বিশ্বব্যাংকের উদ্ভাবিত একটি ধারণা, একটি উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্বব্যাংক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে সুশাসন ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। ১৯৮৯ সালে বিশ্বব্যাংকের এক সমীক্ষায় সর্বপ্রথম সুশাসন প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয়। এতে উন্নয়নশীল দেশের অনুন্নয়ন চিহ্নিত হয় সুশাসনের অভাববোধ থেকে। অনুন্নয়ন চিহ্নিতকরণে এবং সুশাসন নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক শাসন সংক্রান্ত সমস্যাবলীর উপর অধিক গুরুত্বারোপ করে থাকে। সুশাসন নিশ্চিতকরণের শর্তাবলীর অধীনে আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রথমে ঋণ সাহায্য ও পরে প্রকল্প সাহায্য দেয়। ১৯৪৪ সালে ব্রেটন উডস এর সম্মেলনের ত্রিশ দশকের মত মন্দা মোকাবেলায় বৈশ্বিক অর্থনৈতিক আন্তঃক্রিয়ার কথা বলা হয়। কিন্তু যে সকল নীতির আওতায় বিশ্বব্যাংক ঋণ সাহায্য ও প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান করে উন্নয়নশীল দেশে তা ব্যর্থ হয়। ১৯৮০ দশকে বিশ্বব্যাংক উন্নয়নশীল দেশের জন্য কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি গ্রহণ করে। ঐ কর্মসূচি ও ব্যর্থ হয়। কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন উন্নয়ন নীতিমালার ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে সুশাসন ধারণা আবির্ভূত হয়। বলিষ্ঠ ও ন্যায়ানুগ উন্নয়নকে পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য একটি সুষ্ঠু নীতিমালার মাধ্যমে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা এবং সেই পরিবেশকে টেকসই করে অব্যাহতভাবে বজায় রাখাই হলো 'সুশাসন'। তাই সুষ্ঠু অর্থনৈতিক নীতিমালা সুশাসনের একটি অন্যতম জরুরি অঙ্গ-উপাদান। এই সুষ্ঠু নীতিমালার মধ্যে বাজার ব্যবস্থা সাধারণত দক্ষতার সাথে কাজ করবে, আর যে কোন ব্যর্থতার ক্ষেত্রে বাজার ব্যবস্থাকে সংশোধন করার নিয়ম প্রতিষ্ঠায় সরকার তার অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সুশাসন সম্পর্কে বিভিন্ন জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠান সংজ্ঞা প্রদান করেছেন নিম্নে সেসব সংজ্ঞার মধ্যে যে সংজ্ঞাগুলো প্রণিধানযোগ্য সেগুলো উল্লেখ করা হলো।

G. Bilney এর মতে সুশাসন হচ্ছে - "The effective of a management of a country's social and economic resources in manner that is open transparent, accountable and equitable.[৮]

Dhaka University Institutional Repository

মারটিন মিনোগের মতে সুশাসন হচ্ছে 'সরকারকে আরো বেশি গণতান্ত্রিক মুক্তমনা, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার ক্ষেত্রে সিভিল সোসাইটির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সক্রিয় করার ব্যাপারে সুশাসন বৃহৎ অর্থে কতিপয় উদ্যোগের সমাহার ও একটি সংস্কার কৌশল।[৯]

The Social Science Encyclopedia তে সুশাসন সম্পর্কে বলা হয়েছে It is a broader concept than government, which is specifically concerned with the role of Political authorities in maintaining social order within a defined territory and the exercise of executive power.[১০]

সুশাসনের সবচেয়ে ব্যবহার উপযোগী সংজ্ঞা দিয়েছেন Mc Corny. তিনি বলেন "Governance is the relationship between civil society and the state, between government and governed, the ruler and ruled." [১১]

সুশাসন ধারণাটির সাথে কতগুলো প্রতিষ্ঠান জড়িত আছে যেমনঃ-

(ক) কেন্দ্রীয় বা স্থানীয় সরকার এবং ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল।

(খ) রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী বা সরকার পরিবর্তনের লক্ষ্যে নিজস্ব সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালনা করে।

(গ) সিভিল সমাজ নিজস্ব ও জনগণের একাংশের স্বার্থ রক্ষায় সচেষ্ট।

(ঘ) উন্নয়ন এনজিও সেবা সংস্থা যারা নিজস্ব কাজে অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানের মতামত প্রতিফলিত করে এবং

(ঙ) জনগণের অসংগঠিত এবং গ্রামীণ অংশ।[১২]

সুশাসনের নির্দেশক হিসাবে Sir Kanneth Stwoe নিচের বিষয়গুলোর কথা বলেছেন ঃ

(ক) বাক্ ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা;

(খ) সংবিধান ও বিচার বিভাগ কর্তৃক জনগণের অধিকার সংরক্ষণ;

(গ) স্বাধীন আইনসভা কর্তৃক আইন প্রণয়ন;

(ঘ) মুদ্রার স্থিতিশীলতা;

(ঙ) শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার মাধ্যমে জড়িত উন্নয়ন; এবং

(চ) স্বাধীন নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত আইনসভার নিকট নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহিতা।[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

সুশাসন নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকেও নির্দেশ করে। যথা ঃ-

(ক) সরকারের গুণাগুণ বিচার;

(খ) রাষ্ট্রীয় কার্য ব্যবস্থাপনায় রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োগ;

(গ) রাষ্ট্রের উন্নয়নে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনায় ক্ষমতা প্রয়োগের ধারা এবং

(ঘ) রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় নিয়ম ও কর্তৃত্ব প্রয়োগের ধারা।[১৪]

অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (OECD) এর উন্নয়ন সহায়ক কমিটি (Development Assistance Committee, DAC) ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বরে সুশাসন, অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন, মানবাধিকার এবং গণতন্ত্রায়নের মধ্যে নিম্নলিখিত আন্তঃসম্পর্ক দেখিয়েছেন।

(ক) সরকারের বৈধতা শাসিতের সম্মতি এবং অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার বিদ্যমানতার উপর নির্ভর করে।

(খ) সরকারি কর্মকান্ডে সরকারের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় উপাদানের জবাবদিহিতা, তথ্যের সহজ প্রাপ্যতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বচ্ছতা এবং ব্যক্তির আচরণ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে।

(গ) জবাবদিহিতা রাজনৈতিক পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে বজায় থাকে।

(ঘ) যথার্থ নীতি প্রণয়নে সরবরাহের দক্ষতা, সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, এসব কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন, সমান সেবা বিতরণ, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা, আইনের শাসন, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর অধিকার ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা কার্যকর অর্থনৈতিক কাঠামো, সামাজিক কর্মকান্ড এবং ব্যক্তির অংশগ্রহণ উৎসাহ প্রদানের ক্ষেত্রে দক্ষতা থাকবে।[১৫]

Linz and Stepan সুশাসন বিষয়ক পাঁচটি আন্তঃসম্পর্ক যুক্ত কাঠামোর কথা বলেছেন। যথাঃ-

(ক) A Robust civil Society.

(খ) An Autonomous Political Society.

(গ) Rule of Law.

(ঘ) An Efficient and Responsive Bureaucracy;

(ঙ) An Economic Society.

Dhaka University Institutional Repository

২.৪ সুশাসনের বৈশিষ্ট্য ঃ

ইউএনডিপির টেকসই মানব উন্নয়ন কার্যালয় সুশাসনের যেসব বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছে সেগুলো হলো ঃ-

১. অংশগ্রহণমূলক

২. জনগণের প্রতি দায়িত্বশীল

৩. সম্পদ উন্নয়নে ও সুশাসন পদ্ধতি উন্নয়নে সক্ষম

৪. সামাজিক উদ্দেশ্যে সম্পদ আহরণে সক্ষম

৫. আইনের শাসন দ্বারা পরিচালিত

৬. সম্মান ও বিশ্বাস যোগ্যতা নিশ্চিত করে

৭. সেবামুখী

৮. টেকসই

৯. জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য

১০. সাম্য ও সমতা বিধান

১১. জেন্ডার ভারসাম্যমূলক

১২. বিভিন্ন ও ভিন্নমুখী প্রেক্ষিতকে ধারণ ও গ্রহণে সামর্থ্য

১৩. দক্ষ ও কার্যকর

১৪. জবাবদিহি

১৫. জাতীয় ভিত্তিক সমাধান দান ও মালিকানা গ্রহণে সক্ষম এবং

১৬. যেসব বিষয়ে অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ কম সেগুলো সীমিতকরণ। [১৬]

অর্গানাইজেশন ফর ইকোনোমিক কো-অপারেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (OECD) সুশাসনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছেন। এগুলো হলোঃ-

১। গণতন্ত্রের উন্নয়ন ও মুক্ত বহুত্ববাদী সমাজ

২। অবাধ ও প্রবেশগম্য আইন ও বিচার ব্যবস্থাসহ আইনের শাসন শক্তিশালী করা

৩। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা জোড়ালো করা

৪। দুর্নীতি বিরোধী উদ্যোগ

৫। স্বাধীন গণমাধ্যমের উন্নয়ন ও তথ্য প্রচার এবং

৬। অতিরিক্ত সামরিক ব্যয় হ্রাসের প্রচেষ্ঠা।[১৭]

Dhaka University Institutional Repository

২.৫ সুশাসনের উপাদান ঃ

সুশাসনের বিভিন্ন উপাদান রয়েছে। তার মধ্যে প্রধান চারটি উপাদান হলোঃ-

১। জবাবদিহিতা

২। অংশগ্রহণ

৩। ভবিষ্যদ্বানী করার ক্ষমতা

৪। স্বচ্ছতা

নিম্নে এসকল উপাদানের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো।

১। জবাবদিহিতা ঃ

সুশাসনের অন্যতম প্রধান উপাদান হলো জবাবদিহিতা এ উপাদানটি ব্যতীত কোন দেশে সুশাসন আশা করা যায় না। জবাবদিহিতা হলো একটি অবশ্য পালনীয় বিষয় এবং এর মাধ্যমে সরকার ও তার আচরণ ও কার্যকলাপের জন্য জনগণের কাছে দায়ী থাকে বা দায়ী করে তোলে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন উপায়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে থাকে। আর জবাবদিহিতা মূলত নির্ভর করে কোন দেশের রাজনৈতিক কাঠামোর উপর। আমলাদের নির্ধারিত সম্পদ এবং কর্তৃত্ব সীমার মধ্য থেকে অর্জিত ও স্বীকৃত দায়িত্ব পালন সম্পর্কে বাধ্য বাধকতা হলো প্রশাসনিক জবাবদিহিতা। জবাবদিহিতা না থাকলে কোন দেশের নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন দক্ষ হয় না। আর নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন দক্ষ না হলে সে সরকারের উপর বেসরকারি সংস্থাগুলো আস্থা হারিয়ে ফেলে। যার ফলে সেদেশে বেসরকারি সংস্থাগুলোর বিনিয়োগের পাশাপাশি বিদেশী বিনিয়োগ কমে যায়। জবাবদিহিতার অন্তর্ভূক্ত অন্যান্য বিষয়গুলো হলো নিম্নরুপঃ-

(ক) সরকারি ক্ষেত্রগুলোর ব্যবস্থাপনা

জনগণ জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা পেয়ে থাকে সরকারি ক্ষেত্রগুলোর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে। সরকারি ক্ষেত্রগুলোর প্রধান লক্ষ্যই হলো জনগণকে সেবাদান করা আর সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে হতে হবে দক্ষ এবং তাদের নির্দিষ্ট কতগুলো কার্যাবলী থাকতে হবে। যে সকল কার্যাবলীর মাধ্যমে ভালো মানের সেবা পাবে।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) পাবলিক এন্টারপ্রাইজগুলোর ব্যবস্থাপনা এবং সংস্কার

যেহেতু সরকারি সেক্টরগুলি জনগণকে সেবা দিয়ে থাকে ধীরগতিতে এবং জনগণ তাদের কাছ থেকে কাম্য সেবা পায় না সেহেতু পাবলিক এন্টারপ্রাইজগুলোকে সংস্কার করা যায় বেসরকারিকরন, স্বায়ত্বশাসন নিশ্চিত করে, বাজেটে সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে।

২। অংশগ্রহণ ঃ

যে কোন কর্মসূচি সফল করে তুলতে হলে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। অংশগ্রহণকে সুশাসনের অন্যতম উপাদান হিসাবে মনে করা হয়। এখানে অংশগ্রহণ বলতে নীতি প্রণয়ন বা নির্ধারণে এবং বাস্তবায়ন যতদূর সম্ভব জনগণকে সম্পৃক্ত করাকে বোঝায়। জনগণের অংশগ্রহণের সাথে আরও কিছু বিষয় জড়িয়ে আছে। যেমন- কোন দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ অধিকতর জবাবদিহিমূলক হতে হবে। ব্যক্তিখাতের সাথে সরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যেহেতু সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেহেতু সরকারের সাথে বেসরকারি সংস্থাগুলোর সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

৩। ভবিষ্যৎ বাচ্যতাঃ

কোন দেশের উন্নয়নের জন্য একটি আইনগত কাঠামোর ভিত্তিতে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা খুবই জরুরি। আর সে কারণে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আইনগত সংস্কার করতে হবে। উন্নয়নকে ব্যহত করে এমন ধরনের আইন প্রণয়ন থেকে দূরে থাকতে হবে। আইনের প্রয়োগ ও ব্যবহার হবে নিরপেক্ষ। কোন দলের স্বার্থে তা ব্যবহার করা যাবে না । শুধু আইন প্রণয়ন করলেই হবে না বরং সকল আইন বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। আইনের জন্য আইনগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলেই যেকোন দেশে সুশাসন নিশ্চিত হবে বলে আশা করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

২.৬ বাংলাদেশে সুশাসন ঃ

এদেশে বেশ কয়েকবার নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসলেও সুশাসন কাঙ্খিত মাত্রায় পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। এর কারণে শাসন ব্যবস্থায় দেখা গেছে নানা রকম সমস্যা। ফলে শাসন ব্যবস্থা তেমন একটা সফলতা অর্জন করতে পারেনি। বাংলাদেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে আরোপিত শাসন ব্যবস্থার প্রক্রিয়ার ব্যর্থতার কয়েকটি দিক তুলে ধরা হলো।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় এ যাবৎ মূলত ব্যর্থতাই সাধারণ চিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে শাসন ব্যবস্থার মৌলিক ও প্রাথমিক ব্যর্থতা হচ্ছে জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যের উপর জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের মালিকানার অভাব। যেহেতু আমাদের দেশের উন্নয়ন বীক্ষণ দেশজ ভিত্তি থেকে উৎসারিত হয়নি বলতে গেলে তা বাইরে থেকে ধার করা অর্থাৎ উন্নয়ন বীক্ষণের মালিক যেহেতু সরকার নিজে নয়, তাই স্বাভাবিকভাবেই বীক্ষণ বাস্তবায়নের জন্য দাতা সংস্থা কর্তৃক নির্দেশিত কর্মসূচিকেই প্রধান্য দেওয়া হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন ও কার্যক্রমের প্রতি সরকারের কোন দৃঢ় অঙ্গীকার সৃষ্টি হয়নি। অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য সংস্কারগুলো দ্রুত বাস্তবায়িত হলেও ক্ষমতা স্বার্থগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত সিস্টেম লসের নামে দিনের পর দিন প্রশাসনিক দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয়া হয়েছে। যা পরে সামষ্টিক ব্যয়ের ভারসাম্যহীনতার জন্ম দিয়েছে। এছাড়াও সমাজের বিভিন্ন শক্তিশালী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীকে এক্ষেত্রে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে সকল সরকারসমূহ তেমন একটা সফলতা প্রদর্শন করতে পারেনি। অন্যদিকে তারা আবার অপেক্ষাকৃত দূর্বল জনগোষ্ঠীকে সংস্কারের প্রাথমিক বিরূপ প্রভাবের ঐ সকল থেকে রক্ষা করতে পারেনি। একদিকে সরকারি উন্নয়ন কর্মকর্তাদের রাষ্ট্রীয় অপচয় কমিয়ে রাজস্ব উদ্বৃত্ত করতে ব্যর্থতা। অন্যদিকে তারাই আবার প্রকল্প সাহায্যের অধীনে প্রাপ্ত উন্নয়ন বরাদ্দের সবটুকু সদ্ব্যবহার করতে অদক্ষতার পরিচয় দিয়েছে।

আর্থিক খাত ঃ

বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা অর্থনৈতিক স্থিতিশীল ও প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে যথেষ্ট মন্দ ফল বয়ে এনেছে। আর এদেশের শাসন ব্যবস্থার ব্যর্থতা মূলতঃ অঙ্গীকার ও সামর্থ্যের ঘাটতি থেকে উদ্ভূত। অপর্যাপ্ত আইন কাঠামো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দুর্বল নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ও স্বায়ত্বশাসনের প্রভাব এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর বোর্ডসমূহ ও ব্যবস্থাপকের দূর্বল কার্যকরী অক্ষমতার কারণে মূলতঃ এই সামর্থ্যের ঘাটতি সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে ঋণদান প্রক্রিয়ায় নানা অনাকাঙ্খিত হস্তক্ষেপ অঙ্গীকারের ব্যর্থতা সূচিত করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ঃ

রাজস্ব ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে শাসন ব্যবস্থার ব্যর্থতা মুলতঃ বাস্তবায়ন ক্ষমতা সংক্রান্ত। রাজস্ব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বীক্ষণের মালিকানা অভ্যন্তরীণ শক্তির হাতে থাকলেও প্রশাসন যন্ত্রের প্রশাসনিক ক্ষমতা ও আইনী ক্ষমতা খুবই সীমিত হওয়ায় বীক্ষণের সঙ্গে বাস্তবায়ন ক্ষমতার একটি বিরাট ফাঁক হয়েছে। এছাড়াও সরকারের আকার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উন্নয়ন বাজেটে অর্থ স্থানান্তরিত হচ্ছে, পরোক্ষ কর ব্যবস্থা ও ইপ্সিত মাত্রায় রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থ হয়েছে।

কৃষি খাত ঃ

অতীতে সরকার সমূহের মধ্যে কৃষি সমন্ধে কোন দীর্ঘ মেয়াদী বীক্ষণ ছিল না। তাদের অঙ্গীকারও ছিল দ্বিধাগ্রস্থ। যা কিছু সীমিত পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল তাও বাস্তবায়নের ক্ষমতা তাদের ছিল না। তাই দেখা যায় তারা কেবল দাতাদের নির্দেশিত মুক্তবাজারমূখী বীক্ষণের সহযোগী মূল্য বিষয়ক কর্মসূচিগুলো কার্যকর করতে সক্ষম হয়েছিল। কৃষকদের রাজনৈতিক প্রতিরোধের অভাবে পূর্বতন সরকারগুলো এই মুক্তবাজারমূখী সংস্কার সাধনে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম অঙ্গীকার ও সামর্থ্যের সংস্থান ঘটাতে পেরেছিল। যদিও তখন কৃষি খাত থেকে ভর্তুকি সর্ম্পূণ প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে নাগরিক মহল সোচ্চার হয়েছিল। কৃষি খাতে সরকারের নানা ব্যর্থ কর্মসূচির কারণে সুশাসন প্রতিষ্ঠা পায়নি।

দারিদ্র বিমোচন ঃ

দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে সকল সরকারই কম বেশি কার্যকরী কোন সমাধানের পথ দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রতিবারই রাজনৈতিক দলগুলো দারিদ্র বিমোচনের জন্য নির্বাচনী ইশতেহার দিয়েছিল কিন্তু তার কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে। দারিদ্র বিমোচনের জন্য যদি পুরোপুরিভাবে কোন কর্মসূচি করাই হতো তাহলে আমাদের দেশে দারিদ্রতা অনেকাংশে দূর হয়ে যেত।

শিক্ষা খাত ঃ

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকারের একটি অংশ। শিক্ষিত জাতি ব্যতীত সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয়। কাজেই শিক্ষাকে দুর্নীতি মুক্ত রাখা সরকারের অন্যতম একটি লক্ষ্য ও অত্যাবশ্যক। শিক্ষা বিভাগে এক সময় যে বিষয়গুলো কল্পনা করা যেতনা এখন সে সকল বিষয়গুলো বেশি হচ্ছে। যেমন ঃ বরাদ্দ বৃদ্ধি, নানা পর্যায়ে অনিয়ম জবাবদিহিতার অভাব, বরাদ্দকৃত অর্থের অপচয় ইত্যাদির কারণে এই খাতে সুশাসন এখনও পৌঁছাতে পারেনি।

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশ খাত ঃ

দেশের আইন-শৃংঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ দমনে পুলিশ বাহিনীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ-রাষ্ট্রের প্রয়োজনে বাংলাদেশে পুলিশের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি করা হয়েছে, ঠিক তেমনি এদের আধুনিকায়ন ও গৌরব বৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপও নেয়া হয়েছে। কিন্তু নানা কারণে পুলিশ সারা বছর তুমুল আলোচনা ও সমালোচনার বিষয় হয়ে থাকে। এই আলোচনার বিষয়ববস্তু পুলিশের চাঁদাবাজি অর্থ আত্মসাৎ, ক্ষমতার অপব্যবহার, দায়িত্ব পালনে অবহেলা, মামলা দায়েরের মাধ্যমে হয়রানি, গ্রেফতার বাণিজ্য ইত্যাদির সাথে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে টাকা ছিনতাই। ট্রাফিক সার্জেন্টের বিরুদ্ধে রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে বিভিন্ন অজুহাতে চাঁদাবাজি অভিযোগ দীর্ঘদিনের।

Dhaka University Institutional Repository

২.৭ বিভিন্ন ধরনের সুশাসন ঃ

১. বৈশ্বিক সুশাসন

বর্তমানে 'রাষ্ট্র' জাতি রাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক স্বার্থ ও নীতির একটি বিশ্বজনীন রূপধারণ করেছে। তথ্য ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে বিশ্ব সমাজ ও রাষ্ট্রসমূহ মার্শাল ম্যাকলুহান বর্ণিত বৈশ্বিক গ্রামে পরিনত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ইউরোপের বদলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক শক্তি কেন্দ্র হয়ে গড়ে ওঠা এবং পুঁজিবাদী আধুনিকায়ন তত্ত্বের দ্বারা মার্কিন স্বার্থ নিশ্চিত করা, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের বিস্তৃতি বৈশ্বিক শাসনের বাতাবরণ তৈরি করেছে। বৈশ্বিক পর্যায়ে বিভিন্ন নীতি ও কর্মতৎপরতার ফলে জাতিসংঘ ইউএনডিপিসহ বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন, দাতা, উন্নয়ন সহযোগী, বহুজাতিক কোম্পানী, রাজনৈতিক বলয় প্রভৃতি বৈশ্বিক শাসনের ভিত্তি তৈরি করেছে। এ অবস্থাটাকে বলা যায়- " Governing without government" দাতা গোষ্ঠীর বুদ্ধি বৃত্তিক অনুশীলনের ধারায় যে শাসন ও সুশাসনের রূপরেখা দাড় করানো হয়েছে নিচের উদ্ধৃতির মাধ্যমে তার কিছুটা স্পষ্ট হয়েছে।

The five care areas poverty eradication, food security, trade co-operation, payments union and external resource mobilization are not only closely interrelated, but also necessary prerequisites for achieving the vision of a Economic community with sustainable human development, real democratic political formations, good governance and poverty eradication.[১৮]

স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বৈশ্বিক সুশাসন বিষয়ে Commission on Global Governance এর উদ্যোগে ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত Our Global Neighbourhood প্রতিবেদনে বৈশ্বিক সুশাসনে নির্দিষ্টভাবে পাঁচটি বিষয় উল্লেখ করা হয় ঃ

১। সুশাসন পরিবর্তন এবং বহুমূখী মূল্যবোধের সঙ্গে মানিয়ে নেয়া;

২। নিরাপত্তার বিষয়টি বাস্তবোচিতভাবে নিশ্চিত করা;

৩। অর্থনৈতিক আন্তনির্ভরশীলতা উপলব্ধি;

৪। জাতিসংঘের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন এবং

৫। বিশ্বব্যাপী আইনের শাসন জোরদারকরণ।[১৯]

Dhaka University Institutional Repository

২. জাতীয় সুশাসন ঃ

কেন্দ্রীয় প্রশাসনের আওতায় রাষ্ট্রের বিভিন্ন উপাদান, রীতিসিদ্ধ কাঠামোর ক্ষমতা চর্চা করে। স্থানীয় সুশাসন ব্যবস্থায় একটি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হিসেবে জাতীয় শাসন ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বাস্তবায়ন, জনঅংশীদারিত্বমূলক ভূমিকায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দক্ষতা, মিতব্যয়িতা, নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, আইনের শাসন, উন্নয়নে দুর্নীতিরোধ ও অবাধ গণমাধ্যম প্রভৃতি জাতীয় সুশাসনের অন্যতম ভিত্তি।[২০]

রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্রের অদক্ষতা, জবাবদিহিতা, অস্বচ্ছতার ফলশ্রুতিতে উদ্ভূত শাসন সমস্যা নিয়ে উন্নয়ন সহযোগী দাতা সংস্থাসমূহ বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্কার কার্যের সুপারিশ করে থাকে। জাতীয় সুশাসন প্রক্রিয়া বহিঃশক্তির নীতি ও কর্মসূচির প্রভাবে জাতীয় শাসন কাঠামোর দক্ষতা, কার্যকারিতা, স্বচ্ছতা ও অংশগ্রহণের দিকে নজর দেয়। সিভিল সমাজের গঠনমূলক ভূমিকা জাতীয় সুশাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করে। সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্য নির্ধারণের প্রয়াসে নিবেদিত একটি জাতীয় সরকার সিদ্ধান্ত ও কাজের মধ্য দিয়ে জাতীয় সুশাসন ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকে।[২১]

৩. ই-সুশাসন (E-good Governance) ঃ

তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং স্বাধীন গণ্যমাধ্যম একটি মুক্ত ও বহুত্ববাদী সমাজের অন্যতম পূর্বশর্ত। প্রশাসনিক, রাষ্ট্রীয় ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবামূখীকরণের অন্যতম উপায় সরকারি তথ্যের সহজ প্রাপ্যতা এবং তথ্য ভান্ডারের সুবিধা কম খরচে আয়ত্ব করার মধ্যে নিহিত। সরকারি সেবা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার দিক নির্দেশনা হিসেবে কম্পিউটার, ইন্টারনেট ও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর প্রশাসনের উদ্ভবের ফল হিসাবে জন প্রশাসনের চিরাচরিত ভূমিকা বদলে যেতে শুরু করেছে। সরকারি প্রশাসনের একটি বাড়তি উদ্যোগ হিসেবে এই নতুন শাসন বা ই-সুশাসনের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ই-সুশাসনের প্রত্যক্ষ হিসেবে জনগণের বাসগৃহে সেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।[২২]

৪. অনানুষ্ঠানিক সুশাসন ঃ

আনুষ্ঠানিক সুশাসনের সুনির্দিষ্ট কোন রূপরেখা নেই। অনানুষ্ঠানিক শাসন ব্যবস্থায় আইনগত ক্ষমতার বিষয়টি তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। উদাহরণ হিসাবে সালিশ ব্যবস্থার কথা বলা যায়, যা অনানুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার পাশাপাশি ঐতিহ্যগতভাবে চলে আসছে। অনেকে অনানুষ্ঠানিক সুশাসনকে সিভিল সমাজ ও এনজিওতে সীমিত করে ফেলে। বাংলাদেশ অনানুষ্ঠানিক শাসন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তার অতীত ভূমিকা ধরে রাখতে পারছে না। গ্রামীণ পর্যায়ে বিভিন্ন সহযোগিতার মাঝে রাষ্ট্রের অনুপ্রবেশ এবং

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রীয় সম্পদের মুখাপেক্ষীকরণের কারণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগঠিত সামাজিক উদ্যোগগুলোর ভিত্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে অনানুষ্ঠানিক সুশাসনের কিছু উদাহারণ নিম্নে দেয়া হলো ঃ-

১। রাস্তা প্রশস্তকরণ।

২। ঋণ এবং সঞ্চয়ী সমাজ গঠন ও ব্যবস্থাপনা।

৩। আবর্জনা অপসারণ কমিউনিটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার।

৪। মসৃজিদ, কবরস্থান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, গ্রন্থাগার ক্লাব, হাটবাজার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা।

৫। সামাজিক বনায়ন, কচুরিপানা পরিস্কার, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, দাফন কার্য এবং মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে বৃত্তির ব্যবস্থা।

৬। পারিবারিক বিষয়, ভূমি বিরোধ, ঋণ সম্পর্কিত বিরোধ ও শারিরীক আঘাত নিয়ে সালিশ ব্যবস্থা।

৭। মাদকাশক্তি, মাস্তানি, বল প্রয়োগ বা হুমকি প্রদর্শন করে কিছু আদায়ের বিরুদ্ধে কমিউনিটির পদক্ষেপ।

৮। বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি ও নিম্নতম সেবার বিরুদ্ধে কমিউনিটি ভিত্তিক প্রতিবাদ।

৯। জরুরি অবস্থা ও প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় পারস্পারিক সহযোগিতা।

১০। ছোট খাট বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন, নালা তৈরি এবং পানি সেচ কার্য প্রভৃতি।[২৩]

বাংলাদেশে নয় ধরনের অনানুষ্ঠানিক সুশাসন চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন-

১। অনানুষ্ঠানিক সুশাসন অতীত ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা হিসেবে বিদ্যমান। যেমন- গ্রাম সালিশ।

২। যেখানে অনানুষ্ঠানিক শাসন ব্যবস্থা জনগণকে রক্ষায় অসমর্থ, যেখানে কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থা।

৩। যেখানে অনানুষ্ঠানিক শাসন ভৌত বাধার কারণে পৌঁছাতে অসমর্থ যেমন- বঙ্গোপসাগরে দূরবর্তী দ্বীপ সমূহ।

৪। বন্যা, যুদ্ধ, সাইক্লোন, ভূমিকম্পন, নদীভাঙ্গন, শরণার্থী অগ্নিকান্ড প্রভৃতি জরুরি ও প্রাকৃতিক দূর্যোগে অনানুষ্ঠানিক সুশাসন সারা দেয়।

৫। স্থানীয় সরকার সমূহ কমিনিটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে সরকারি পানি ব্যবস্থাপনার অবকাঠামোর নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস করা।

৬। এনজিওর মতো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্বীয় ব্যবস্থাপনায় পল্লী এলাকায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিক সুশাসনে সক্রিয় রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৭। যেখানে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সুশাসন সহাবস্থান রয়েছে। যেমনঃ- অনানুষ্ঠানিক সালিশ এবং অনানুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থা।

৮। যেখানে আনুষ্ঠানিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কমিউনিটির অধিকার রক্ষায় সক্রিয় যেমন- ১৯৯৫ সালে সার বিতরণে অব্যবস্থার বিরুদ্ধে কৃষকদের স্বতঃস্ফুর্ত প্রতিবাদ।

৯। যেখানে অনানুষ্ঠানিক শাসন অনগ্রসর ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগ নেয় এবং পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করে।[২৪]

৫. স্থানীয় সুশাসন ঃ

স্থানীয় সুশাসন তৃনমূল পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও শাসিত জনগোষ্ঠীর মধ্যকার সম্পর্ক, সামাজিক পুঁজি, যৌথ সামাজিক দায়-দায়িত্ব, স্থানীয় ক্ষমতা কাঠামোতে অংশগ্রহণ প্রভৃতি বিষয়কে ধারণ করে। স্থানীয় সুশাসনে একই সাথে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। আনুষ্ঠানিক সুশাসনের বিভিন্ন দিক ও ধরণ সমূহ স্থানীয় সুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। স্থানীয় সুশাসনের ইস্যুগুলো হলো ঃ-

(ক) নির্বাচিত স্থানীয় সরকার কাঠামোর জনগণের কম সুবিধা প্রাপ্ত অংশ, নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে দরিদ্র ও নারীদের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা এবং এই সময়ে দীর্ঘ ও স্বল্প স্বার্থ রক্ষায় সুদক্ষভাবে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা।

(খ) স্থানীয় নির্ধারিত সরকার কাঠামোগুলোর প্রশাসনকে স্থানীয় জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক ভূমিকা পালনে সক্ষম করা।

(গ) রাজস্ব ও কার্য বিকেন্দ্রীকরণের বাস্তবায়নের মাধ্যমে অধিকাংশ মৌলিক প্রয়োজন যেমনঃ- প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, প্রাথমিক শিক্ষা, নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে কার্যকর ও পর্যাপ্তভাবে সম্পন্ন করা।

(ঘ) এনজিও ব্যক্তিখাতের প্রতিষ্ঠান কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন, সমবায় এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড বিষয়ে সহযোগিতা ও পারস্পারিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করা।[২৫]

স্থানীয় সুশাসনের ক্ষেত্রগুলো সুনির্দিষ্ট করা কঠিন। কেননা স্থানীয় পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক কাঠামোর বাইরে বিভিন্ন লোকজ ঐতিহ্য ও অনানুষ্ঠানিক কাঠামো বিদ্যমান থাকে। জাতীয় গণমাধ্যমসমূহ স্থানীয় বিষয়সমূহ উপস্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় সুশাসনে ভূমিকা রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

২.৮ বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা ঃ

সুশাসনের বিষয়টি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। সুশাসনের বিষয়টি নির্ভর করে সেই দেশের জনসাধারণের জীবনযাপনের মান, সরকার পদ্ধতি, সংস্কৃতিসহ আরও নানা বিষয়ের ওপর। যেমন- পাশ্চাত্যের নাগরিকের কাছে যা স্বাভাবিক বাংলাদেশের নাগরিকের কাছে তা অতি সুশাসন। [২৬]

সুশাসনকে যদি কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা হয় তাহলে প্রথম পর্যায়টিকে বলা যায়, প্রদান বা ডেলিভারী। অর্থাৎ ক্ষমতা বা ষ্টাবলিশমেন্টের সঙ্গে জড়িত নয় তারা কী পাচ্ছে? বিশ্বব্যাংকের মতে, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে যা রুটিন ব্যাপার, বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য তা নয়। যেমন- একটি পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়া বা বিদ্যুৎ বা পানির সংযোগ লাভ। [২৭]

এ পর্যায়ে যদি কর জমা দেওয়ার অধিকার বা সামান্য বিল মেটাতে গেলে যদি হয়রানি না হয় তাহলেই বাংলাদেশের মানুষ মনে করবে সে সুশাসন পাচ্ছে।[২৮]

এর পরের পর্যায় হচ্ছে, জনগণের ক্ষমতায়ন বা রাষ্ট্রনীতিতে জনগনের ইচ্ছার প্রতিফলন। বাংলাদেশ, পাকিস্থান বা নেপালের মানুষ এখনও সুশাসনের প্রথম পর্যায়ের স্বাদ পায়নি। ভারত বা শ্রীংলকা হয়তো দ্বিতীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। কিন্তু যে কোনো সাধারণ মানুষ কতোটা তার ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে পেরেছে তা সন্দেহজনক । [২৯]

সাধারনভাবে প্রথাগত রাষ্ট্রের উপাদান বলতে সংসদ, সরকার ও বিচার বিভাগকে বোঝানো হয়। আধুনিক সংজ্ঞা তার সাথে যুক্ত হয়েছে ব্যক্তি মালিকানা বা বেসরকারি খাত, স্থানীয় সরকার এবং সিভিল সমাজ। বাংলাদেশে এখনও শাসনের মূল দায়িত্ব সরকারের নির্বাহী বিভাগের। যেখানে সহায়তা করবে সংসদ ও বিচার বিভাগ। কোন কোন ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও সেখানে অংশগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্তিম দায়িত্ব বর্তায় সরকারের ওপর। অন্ততঃ জনগণ তাই মনে করে। কেননা, আইন এবং নির্বাহী বিভাগের আদেশের সাহায্যে সব দায়িত্ব সরকারই গ্রহণ করেছে। উপনিবেশিক কাঠামো না বদলানোই এর কারণ। যেমন - বাংলাদেশে কিছু এনজিও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কাজ করছে। কিন্তু তাদের কাজ করতে হয় সরকারের হরেক রকমের বিধি নিষেধের আওতায়। অর্থাৎ সে সম্পূর্ণ স্বায়ত্বশাসিত হতে পারছে না। সরকারের সুশাসনে সে সহযোগী মাত্র। যদি সরকারের বিধি নিষেধ না থাকতো সে স্বায়ত্বশাসিত হতো এবং সে ক্ষেত্রে নিজ কার্যের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

দায়বদ্ধ থাকতো। মানুষ এখন তার কাছে সুশাসন আশা করতো এবং তা না দিতে পারলে তাকে দায়ী করা যেতো (অর্থাৎ সুশাসনের অংশীদার হিসেবে) এক্ষেত্রে তা যাচ্ছে না।

বাংলাদেশে সুশাসনের যেসব সমস্যাগুলো দেখা যায় সেগুলো হলো ঃ

১। আমলাতন্ত্র নির্ভর সরকার ব্যবস্থা। এদেশের আমলারা সবসময় কাজ করে ভবিষ্যৎ সরকারের জন্য আর তাই প্রতিটি দলের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে আমলাতন্ত্রের সংস্কারের কথা বলা হয়। কারণ, মানুষ সুশাসন চায় এবং মনে করে যে, সে যে সুশাসন পাচ্ছে না তার একটি বড় কারণ আমলাতন্ত্র এবং রাজনীতিবিদদের কমিটমেন্টের অভাব। [৩০]

২। বাংলাদেশে সুশাসনের আরেকটি অন্যতম সমস্যা দুর্নীতি।

৩। সরকারের দেয়া প্রতিশ্রুতির পঁচিশ ভাগও কার্যকর হয় না। সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (১৯৯৮) এক্সাইসিস ইন গভর্নেন্স, শীর্ষক আলোচনায় বলা হয়, যেসব সংস্কার কার্যকর হয়নি, তার অধিকাংশই শাসন সম্পর্কিত । এর অনেকগুলি উদ্ভূত অর্থনৈতিক অপরাধ থেকে। এসব বিষয়ে ব্যবস্থা নিলে গুটিকয়েক (যারা এর সঙ্গে জড়িত) ছাড়া সাধারণ মানুষ সমর্থন করবে। [৩১]

৪। দক্ষ ও অদক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা বাংলাদেশে সুশাসনের আরেকটি অন্যতম বাধা। আমাদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উত্তরাধিকার এবং তার স্বরূপ পর্যালোচনা করলে তা আরও স্পষ্ট হয়ে আসে।

৫। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ এখনো সন্তষ্টজনক অবস্থায় এসে পৌঁছেনি। বাংলাদেশের জনগণ এখনো রাষ্ট্রীয় কার্যে অংশগ্রহণের গুরুত্ব সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারছে না। আর ঐটি সুশাসনের একটি সমস্যা।

৬। সুশাসন প্রতিষ্ঠার একটি অন্যতম শর্ত হলো সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ। অথচ বাংলাদেশে এটির অনুপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। সরকার তার কাজের জন্য জবারদিহি করতে প্রস্তুত নয় এবং বিরোধীদলও এতে সরকারকে কোন চাপ বা সহযোগিতা করছে না।

৭। বাংলাদেশের রাজনৈতিক কৃষ্টি এদেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অন্যতম বাধা। আমাদের দেশে গণতন্ত্র এখনও হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগুচ্ছে। এদেশে গণতন্ত্র সবে মাত্র প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

৮। সুশাসনের একটি অন্যতম উপাদান হলো সর্বস্তরের জনগণের রাজনৈতিক সচেনতা। আমাদের দেশের অধিকাংশ জনগণ অশিক্ষিত বলে তারা রাজনৈতিকভাবে সচেতন নয়। এখনো তারা কেবলমাত্র আবেগের বশবর্তী হয়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করে। তারা দেশের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ও সচেতন নয়।

Dhaka University Institutional Repository

৯। দেশে সুশাসন স্থাপনের ক্ষেত্রে জাতীয় প্রচার মাধ্যমগুলো একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখা যায় জাতীয় প্রচার মাধ্যমগুলো যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে তাদের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত হয়ে যায়। ফলে সরকারের ভাল এবং খারাপ, সফলতা এবং ব্যর্থতাগুলো চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার কেউ থাকে না।

১০। সুশাসন প্রতিষ্ঠার আরেকটি অন্যতম উপাদান হলো সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব। রাষ্ট্রকে নেতৃত্ব দেবার জন্য যে সব জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন তাদের অনেকের যোগ্যতা নিয়েই আমাদের দেশে প্রশ্ন রয়েছে। তাদের অনেকেই দেশ ও জনগণের চেয়ে নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত, যা বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অন্যতম বাধা।

১১। একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম একটি উপাদান। বাংলাদেশে প্রতিটি রাজনৈতিক দলই ক্ষমতায় যাবার আগে পৃথক বিচার ব্যবস্থার কথা বলে এবং ক্ষমতায় যাবার পর এত দীর্ঘ মেয়াদে তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করে যে ক্ষমতায় থাকাকালীন মেয়াদে তা আর শেষ করা সম্ভব হয় না।

১২। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় একটি অন্তরায় হলো সামরিক বাহিনীর রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ। বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একুশ বছর সামরিক শাসন চলেছে। আর এ সময় বাংলাদেশে সৃষ্টি হয়েছে নতুন এক শ্রেণী, ঋণ খেলাপী শ্রেণী যাদের থাবা থেকে এদেশের অর্থনীতি, সমাজ, রাজনীতি মুক্ত হতে পারেনি। [৩২]

১৩। বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পূর্ণই আত্মকেন্দ্রীক। জনগণের স্বার্থের চেয়ে আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা নিজেদের কথা এবং নিজেদের দলেই কথাই বেশি ভাবেন। এছাড়া সরকারি ও বিরোধী দলের প্রতিযোগিতাপূর্ণ মনোভাব, সহনশীলতার অভাব, পারস্পারিক শ্রদ্ধার অভাবে বাংলাদেশে সুশাসন ভীষণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এছাড়াও রাজনীতিবিদদের কোন প্রকার দায়বদ্ধতা না থাকায় তারা দেশের প্রতি আন্তরিক নয় যা সুশাসনের পথে বাধা।

১৪। সরকারের তিনটি বিভাগ আইন বিভাগ শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ এদের মধ্যে কাজের সমন্বয়হীনতা ও বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্তরায়। বিরোধীদল সংসদে বসে আলোচনা না করে রাজপথে কেবলই আন্দোলন করা এবং সরকারকে কোন কাজেই সহযোগিতা না করাও সুশাসন স্থাপনের অন্যতম বাধা।

Dhaka University Institutional Repository

২.৯ বাংলাদেশে সুশাসনের সম্ভাবনা ঃ

বাংলাদেশে সুশাসন এখনো প্রতিষ্ঠিত না হলেও এর সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য স্থানীয় পর্যায় থেকে ধীরে ধীরে জাতীয় পর্যায়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হচ্ছে। স্থানীয় পর্যায়ে যদি সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহলে তার সুফল সাধারণ জনগণ ভোগ করতে পারবে এবং জাতীয় পর্যায়েও তার সুফল পৌঁছে যাবে। নিচে স্থানীয়ও জাতীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্য উপায় চিহ্নিত করার চেষ্ঠা করা হলো ঃ-

১। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার কার্যকর করলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সুশাসন নিশ্চিত করার বড় উপায় স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করা। এভাবে পর্যায়ে পর্যায়ে সংসদে পৌঁছায়। তাহলেই জনগণ যা চায় তা হবে এবং সেটাই হবে তাদের মন মতো শাসন। যদি তা তাদের মন মতো হয় তা হলে সেটাই হবে সুশাসন। [৩৩]

২। সুশাসনের পূর্বশর্ত হচ্ছে সব পর্যায়ে বিশেষ করে তৃনমুল পর্যায়ে স্বশাসিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকর থাকা। স্থানীয় সরকার হচ্ছে এমনি ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান যা রাজনৈতিক নেতৃত্ব সৃষ্টিতে সহায়ক হতে পারে, জনগণের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে পারে। [৩৪]

৩। স্থানীয় সরকারের ভিত্তি হচ্ছে গণতন্ত্র। প্রতিষ্ঠানগুলিতে নির্বাচনের ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু করে স্থানীয় সরকার।

স্থানীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে তুলতে পারে এবং এর উদ্দেশ্য হতে পারেঃ-

(ক) স্থানীয় সরকার নির্বাচনে জন মানুষের রাজনৈতিক অংশীদারিত্ব;

(খ) স্থানীয় সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রক্রিয়ায় লিঙ্গের অংশীদারিত্ব;

(গ) স্থানীয় সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ গ্রহণ;

(ঘ) গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বিষয়ে শিক্ষা;

(ঙ) নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ এবং

(চ) সচেনতা বৃদ্ধি, স্থানীয়ভাবে জনমত গঠন।

আর স্থানীয় পর্যায়ে রাজনীতিকে শক্তিশালী করে তুলতে পারলে সুশাসন স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে স্থাপন করা সম্ভব। [৩৫] স্বাধীনতার তিনদশক পরও বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা অস্থিতিশীল। রাজনৈতিক সমঝোতার অভাব, রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান সমূহের দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতার অভাব, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, মানবাধিকার লংঘন, আইনগত

Dhaka University Institutional Repository

কর্তৃত্ব ও স্থানীয় শাসনের দূর্বলতা প্রভৃতিই হচ্ছে বাংলাদেশে শাসনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা বা চ্যালেঞ্জ।[৩৬] এ প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করা গেলে বাংলাদেশে সুশাসনের দ্বার খুব সহজেই উন্মোচিত হবে।

জাতীয় পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিত করার উপায় ঃ

১। সরকারের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, দক্ষতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা।

২। জনগণের মতামত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা ও তথ্য প্রবাহের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

৩। দেশে আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হবে।

৪। ক্ষমতার পৃথকীকরণ এবং বিচার ব্যবস্থার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে।

৫। মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রশাসনিক পদে নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন প্রকার অনিয়ম বা দুর্নীতি কাম্য নয়।

৬। শক্তিশালী ও সুগঠিত সিভিল সোসাইটি গঠন।

৭। দেশের জনগণ যদি তাদের নিজেদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকে তাহলে সুশাসন নিশ্চিত করা সম্ভব।

৮। দেশের সকল উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগেও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে জনগণের অংশ নেয়া উচিত।

৯। সরকার গঠনের ক্ষেত্রে, সরকার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ও ক্ষমতার হস্তান্তরের পদ্ধতি শান্তিপূর্ণ হওয়া এবং নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিশ্চয়তা বিধান করা।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা

১) সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ২০০০, নং - ৭৬, পৃষ্ঠা - ৬৫, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

২) http://en.wikipedia.org/wiki/governance

৩) সাইফুদ্দিন আহমেদ, *লোকপ্রশাসন ও বাংলাদেশ ঃ প্রাসঙ্গিক ভাবনা*, ঢাকা ঃ অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা - ২৮।

৪) http://www.gdrc.org/ugov/governanceunderstand

৫) Barthwal, C. P (ed), *Good Governance in India*, Page-15, Deep and Deep Publication: New Delhi, 2000.

৬) সাইফুদ্দিন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*।

৭) Landell – Mills, P and Serageldin, I, *Governance and external factor*, Proceeding of the world bank Annual Conference on Development Economics, 1991, Washington, D.C. The world Bank. P. 304).

৮) Bilney, G., "*Good Governance and Participatory Development in Australia's Aid Programme.*", Development Bulletin, Volume-32, October, 1994, Page-17.

৯) Human Development in South Asia 1999, *The crisis of governance,* Dhaka : university Press Ltd., Dhaka- 1999.

১০) Robinson, Mark Kuper, Adam and Kuper. Jessica (eds), *The Social Science Encylopedia*, 2nd edition, Routledge, New York 1996, Pg - 347.

১১) McCorney, p.l., *Cities and Governance: New Directions in Latin America, Asia and Africa, Toronto, centre for urban and community studies*, University of Toronto, 1998, pp. 195-196.

১২) ড. মাহবুবুর রহমান খোরশেদ, "*সুশাসন ও উন্নয়ন*" আব্দুল লতিফ মাসুম (সম্পাদিত) একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ ঃ সার্বিক উন্নয়ন সমীক্ষা, ঢাকা ঃ আফসার ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃঃ ৫৩.

Dhaka University Institutional Repository

১৩) নীলুফার বেগম, সাইফুদ্দিন আহমদ, *বাংলাদেশ সুশাসন সমস্যা ও সম্ভাবনা*, সমাজ নিরীক্ষন, ঢাকা ঃ সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, সংখ্যা-৬৫, পৃঃ ৮৪।

১৪) Hasnat Abdul Hye (ed). *Governance: South Asian Perspectives*, Dhaka : University Press Ltd., 2000, P.2.

১৫) Bilney, G, *OP.Cit*, P.16.

১৬) Guhatakurta Meghna & Karim Shahnaz, "*Perception of Governance by Bilateral and multilateral Donors*" in Jowards of theory of governance and Development learning from east Asia (ed.) Rehman Sobhan, Dhaka: UPL, 1998 PP. 80-81.

১৭) www.oecd.org

১৮) Panna, wignaraja, "*Towards a Transitional strategy or good Governance and poverty Eradication*" in south Asia, South Asia Economic Journal, Vol, No.1, March 2000, P.140.

১৯) Commission on global governance: "*Our goot global neighbourhood*" Oxford university press, 1995, P-2.

২০) মোহাম্মদ আবুল বাশার '*সুশাসন ও উন্নয়নে পারস্পারিক সম্পর্ক ঃ পীর যাত্রাপুর গ্রাম-একটি তৃণমূল সমীক্ষা*' - এম.এস.এস থিসিস, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

২১) *ঐ*

২২) *ঐ*

২৩) *ঐ*

২৪) Siddique Kamal, "*Local Governance in Banladesh, Leading Issues and Major Challenges*", Dhaka: University Press Ltd. 2000.

২৫) Siddique Kamal, *Ibid*, P-129.

২৬) মুনতাসীর মামুন, *দক্ষিণ এশিয়ার শাসন ঃ বাংলাদেশে সুশাসন*, সমাজ নিরীক্ষণ, ঢাকা ঃ সমাজ নিরীক্ষা কেন্দ্র, সংখ্যা ৭৬, পৃষ্ঠা - ৬৬।

২৭) World Bank, *Bangladesh: Government that works*, Dhaka, 1996.

২৮) মুনতাসীর মামুন, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা - ৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

২৯) ঐ, পৃষ্ঠা - ৬৭।

৩০) ঐ, পৃষ্ঠা - ৭৭।

৩১) মুনতাসীর মামুন - বই - তথ্য পঞ্জিকা - ১৩।

৩২) মুনতাসীর মামুন, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা - ৭১।

৩৩) ঐ, পৃষ্ঠা - ৮০।

৩৪) ঐ, পৃষ্ঠা - ৮০।

৩৫) ঐ, পৃষ্ঠা - ৮০।

৩৬) ঐ, পৃষ্ঠা - ৮১।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় ঃ জেনারেল জিয়া ও জেনারেল এরশাদের শাসনামল

৩.১ জেনারেল জিয়ার শাসনামল (১৯৭৫-১৯৮১)

বঙ্গবন্ধুর আহবানে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ২৭ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারের মাধ্যমে মেজর জিয়া (তখন তিনি মেজর) সর্বপ্রথম জনসম্মুখে পরিচিতি লাভ করেন। স্বাধীনতার পর একজন দক্ষ ও পেশাদার অফিসার হিসেবে তিনি বেশ সুনাম অর্জন করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের হত্যাকান্ডেরর মাধ্যমে খন্দকার মোশতাক আহমেদ রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হলে, তিনি (মোশতাক) জেনারেল এ.কে.এম শফিউল্লাহকে চিফ অব ষ্টাফ পদ থেকে সরিয়ে তদস্থলে জিয়াউর রহমানকে নিযুক্ত করেন (জিয়া তখন ডেপুটি চিফ অব ষ্টাফ ছিলেন)। ঐ বছর ৩ নভেম্বর বিগ্রেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে এক সেনা অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এর চারদিনের ভেতর ৭ নভেম্বর জিয়ার নিজ সমর্থক ও জাসদের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার উদ্যোগে সংঘটিত হয় এক পাল্টা সেনা অভ্যুত্থান। এ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জেনারেল জিয়ার ক্ষমতার কেন্দ্র বিন্দুতে উত্থান ঘটে। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি এ.এস.এম সায়েম প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৬ সালের ৩০ নভেম্বর জেনারেল জিয়া প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন। পরের বছর ২১ এপ্রিল বিচারপতি সায়েম স্বাস্থ্যগত কারণ দেখিয়ে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেন এবং জিয়া সে পদে নিজেকে অধিষ্ঠিত করেন।

ক্ষমতায় আরোহণের পর জেনারেল জিয়া নিজ অবস্থান সুসংহত করার লক্ষ্যে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তা নিম্নরূপ ঃ-

প্রথমত, জিয়ার ক্ষমতার প্রতি জাসদ ও সেনাবাহিনীর মধ্যে এর গোপন সংগঠন বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার তরফ থেকে বড় ধরণের হুমকি দেখা দেয়। ৭ নভেম্বরের সিপাহী অভ্যুত্থানের সহযোগী এই শক্তি জিয়াকে 'বিশ্বাস ঘাতক' হিসেবে চিহ্নিত করে। তার বিরুদ্ধে নতুন করে সেনা অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা চালায়। কর্ণেল তাহেরকে ফাঁসি দেয়া সহ জিয়া এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। জিয়ার শাসন আমলে বিভিন্ন সময় কমপক্ষে ২০ বার কথিত সামরিক অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে সেনাবাহিনীর বহু সংখ্যক জোয়ানকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়ত, ৭ নভেম্বর অভ্যুত্থানের পর জেনারেল জিয়ার হাতে কার্যত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ন্যস্ত থাকলেও তখনই তিনি রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ পদে নিজেকে আসীন করেননি। বিচারপতি সায়েমকে সামনে রেখে তিনি পর্যায়নুক্রমে অগ্রসর হওয়ার নীতি গ্রহণ করেন।

তৃতীয়ত, শুরু থেকেই তিনি সামরিক-বেসামরিক আমলাদের মধ্যে সুসম্পর্ক এবং এদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় মনোযোগ দেন।

চতুর্থত, খন্দকার মোশতাক ও পরে বিচারপতি সায়েমের ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা থাকলেও, নিজ অবস্থান সুসংহত করতে তিনি আরো সময় নেন।

পঞ্চমত, সামরিক বাহিনীর মধ্যে নিজ অবস্থান সুদৃঢ় ও সমর্থন বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি সামরিক খাতে বাজেট ব্যয় বৃদ্ধি, নতুন সেনা ডিভিশন গঠন, গোয়েন্দা তৎপরতা জোরদার করা সহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পুলিশের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং বিশেষ পুলিশ ফোর্স গঠন করা হয়।

ষষ্ঠত, জিয়া নিজ অবস্থান পাকাপোক্ত করতে এবং তার শাসনের একটি রাজনৈতিক ভিত গড়ে তোলার লক্ষ্যে এক পর্যায়ে অর্থ, বিত্ত ও ক্ষমতার প্রলোভন দেখিয়ে বিদ্যমান রাজনৈতিক দল ভেঙ্গে এর নেতা-কর্মীদের নিজের পক্ষে টানতে উদ্যোগী হন।

সপ্তমত, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তিনি প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে প্রাথমিক বৈরীভাব কাটিয়ে উঠে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়ন, চীন ও পশ্চিমের দেশসমূহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি ও মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হন।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১.১ বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া ঃ

জেনারেল জিয়া তার শাসনকে বেসামরিকীকরণের লক্ষ্যে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তা নিম্নরূপঃ-

১. রাজনৈতিক দল বিধি (পি.পি.আর) ঃ ১৯৭৬ সালের ২৮ জুলাই সরকার রাজনৈতিক দল বা পি.পি. আর- এর ঘোষণা দেয়। এই নতুন বিধি অনুযায়ী, রাজনৈতিক দলগুলোকে সরকারের কাছ থেকে বৈধতার সনদ লাভ করতে হয়। এভাবে অনুমোদনপ্রাপ্ত ২১ দলকে প্রথম 'ঘরোয়া রাজনীতি' (Indoor Politics) করার অনুমতি দেয়া হয়। ১৯৭৮ সালের ১ মে থেকে রাজনৈতিক দল বিধি তুলে দেয়া হয়।

২. গণভোট অনুষ্ঠান ঃ ১৯৭৭ সালের ৩০মে দেশব্যাপী এক গণভোটের আয়োজন করা হয়। এতে কোন প্রার্থী ছিল না। জিয়ার উপর আস্থা আছে কি-নাই সে বিষয়ে ভোটারদের কাছে জানতে চাওয়া হয়। ভোটে শতকরা ৯৮.৮৮ ভাগ হ্যাঁ সূচক ফলাফল দেখানো হয়।[১]

৩. ১৯ দফা কর্মসূচি ঃ ১৯৭৭ সালে গণভোটের একমাস পূর্বে জিয়া তার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ১৯ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। একে 'উৎপাদনের রাজনীতি' হিসেবে আখ্যায়িত করে তিনি এই কর্মসূচি নিয়ে ৪ সপ্তাহব্যাপী সারা দেশজুড়ে এক গণসংযোগে বের হন এবং ৭০টি জনসভায় ভাষণ দেন।

৪. স্থানীয় সংস্থার নির্বাচন ঃ ১৯৭৭ সালের জানুয়ারি মাসে গ্রাম পর্যায়ে ৪৩৫২ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর আগস্ট মাসে দেশের ৭৮ টি পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ।

৫. রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ঃ ১৯৭৮ সালের ৩ জুন দেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর পূর্বে জিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় তার ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুস সাত্তার জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল) নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন।

এর সঙ্গে আওয়ামী লীগ বিরোধী ৫টি দল (ন্যাপ-ভাসানী, মুসলিম লীগ, ইউ,পি,পি লেবার পার্টি ও তপসিলি ফেডারেশন) মিলিত হয়ে 'জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট' নামে একটি নির্বাচনী জোট গঠন করে। জিয়া ছিলেন এ জোটের প্রার্থী। অপরদিকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে অপর ৫টি দলের (জাতীয়

Dhaka University Institutional Repository

জনতা পার্টি, ন্যাপ-মোজাফফর, সিপিপি, গণ-আজাদী লীগ ও পিপলস্ লীগ) সমন্বয়ে 'গণতান্ত্রিক ঐক্য জোট' গঠন হয়। মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি এম.এ.জি ওসমানী ছিলেন এ জোটের প্রার্থী। নির্বাচনে আরো কয়েকজন প্রার্থী থাকলেও, এটি জিয়া ও ওসমানীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পর্যবসিত হয়। সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছিল ওসমানীর প্রধান নির্বাচনী ইস্যু। নির্বাচনে জিয়া শতকরা ৭৬.৬৩ ভাগ এবং ওসমানী ২১.৭ ভাগ ভোট পান। জিয়ার সহজ বিজয় হয়। সামরিক শাসনাধীনে অনুষ্ঠিত এসব নির্বাচনে প্রধানত সরকারি নীল-নকশার বাস্তবায়ন ঘটে।

সারণি ৩.১ ঃ ১৯৭৮ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলাফল।

দল/ফ্রন্টের নাম	প্রার্থী	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার
জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট	জেনারেল জিয়াউর রহমান	৭৬.৬৩
গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট	জেনারেল এম.এ.জি ওসমানী	২১.৭০
অন্যান্য		১.৬৭
মোট		১০০

উৎস: ইঞ্জিনিয়ার আবুল হোসেন, বাংলাদেশের রাজনীতি, পৃষ্ঠা - ২৮৯।

৬. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি) গঠন ঃ ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টভূক্ত দলগুলোকে একীভূত করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) গঠন করা হয়। পূর্বে প্রতিষ্ঠিত জাগদল বিলুপ্ত হয়ে যায়। জিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপি'র নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

৭. জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঃ ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ছোট বড় ৩১টি দল অংশগ্রহণ করে। ৩০০ আসনের মধ্যে ২০৭টি আসন ও শতকরা ৪৪ ভাগ ভোট পেয়ে বিএনপি বিজয়ী হয়। আওয়ামী লীগ ৩৯টি আসন ও ২৫ ভাগ ভোট লাভ করে এবং সংসদে প্রধান বিরোধী দল হিসাবে আবির্ভূত হয়। নির্বাচনের ফলাফলকে ভোটারদের ইচ্ছার প্রতিফলন ধরে নেয়া ঠিক নয়। কেননা সামরিক শাসনকে বৈধতাদানের প্রয়োজন থেকে ফলাফল এভাবে সাজানো ছিল তখনকার রীতি। যা হোক, ২ এপ্রিল নব নির্বাচিত সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। ৬ এপ্রিল থেকে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। এর মাধ্যমে জিয়ার বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া পূর্ণতা পায়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ৩.২ ঃ ১৯৭৯ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল।

দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা	আসন লাভ	প্রাপ্ত ভোট (প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার)
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	২৯৮	২০৭	৪১.১৬
আওয়ামী লীগ	২৯৫	৩৯	২৪.৫৫
মুসলিম লীগ ও ইসলামী ডেমোক্রেটিক লীগ	২৬৬	২০	১০.০৮
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	২৪০	৮	৪.৮৪
আওয়ামী লীগ (মিজান)	১৮৪	২	২.৭৮
ন্যাপ (মোজাফফর)	৮৯	১	২.২৫
বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি	১১	--	০.৩৯
অন্যান্য দল	৩২০	৭	৩.৮৫
স্বতন্ত্র	৪২২	১৬	১০.১০
মোট	২১২৫	৩০০	১০০

উৎস ঃ আবুল ফজল, বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা, পৃ- ১৭৫।

৩.১.২ সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী ঃ

জিয়ার শাসন আমলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী। ১৯৭৯ সালের জাতীয় সংসদে তা গৃহীত ও পাশ হয়। এ দ্বারা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল পর্যন্ত সকল সামরিক আইন বিধি, আদেশ, ঘোষণা, অধ্যাদেশ বা অন্যান্য আইন ও আদেশকে সাংবিধানিক বৈধতা দেয়া হয় (পরবর্তীতে ২০০৫ সালের ২৯ আগস্ট আদালত কর্তৃক পঞ্চম সংশোধনী বাতিল ঘোষণা করা হয়)। পঞ্চম সংশোধনীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচেছ, এ দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন আনা হয়। 'ধর্মনিরপেক্ষতার' স্থলে 'সর্বশক্তিমান' আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস', সমাজতন্ত্রের নতুন ব্যাখ্যায়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার, জাতীয়তাবাদ বলতে 'বাঙালির' পরিবর্তে 'বাংলাদেশী' (অর্থাৎ ধর্মীয় উপাদান সংযুক্ত জাতীয়তাবাদের ধারণা) ইত্যাদি প্রতিস্থাপিত ও সংযোজিত হয়। ইসলামি সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক সংহত, সংরক্ষণ এবং জোরদার করার নীতিও সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৭৭ সালের ২২ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল জিয়া রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে উল্লেখিত পরিবর্তন এনে এক সংশোধনী আদেশ জারি করেন। ১৯৮১ সালের ৩০ মে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে এক সেনা বিদ্রোহে নির্মমভাবে নিহত হন। এর সঙ্গে তার সাড়ে পাঁচ বছরের শাসনের অবসান ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১.৩ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ ও সেনা বিদ্রোহ দমন ঃ

১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে এক সেনা বিদ্রোহে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হলে সংবিধান অনুযায়ী উপ-রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার (বয়স ৭৩) অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সে সময়ে সেনাবাহিনীর চিফ অব ষ্টাফ জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের এবং বিভিন্ন সেনাছাউনির সমর্থনে বিচারপতি সাত্তার চট্টগ্রামে সেনা বিদ্রোহ দমনে সফল হন। আওয়ামী লীগ সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও বেসামরিক শাসনের প্রতি সমর্থন পূণর্ব্যক্ত করেন, যা বিদ্রোহ দমনে বৃদ্ধ সাত্তারকে শক্তি ও সাহস যোগায়।

Dhaka University Institutional Repository

৩.২ দ্বিতীয় সামরিক শাসন ও জেনারেল এরশাদের শাসনামল (১৯৮২-১৯৯০)

বিচারপতি সাত্তারের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি, অন্তর্দ্বন্দ্ব, সংকট ইত্যাদির কারণ দেখিয়ে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ রাষ্ট্রের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সারাদেশে সামরিক আইন জারি করা হয়। জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়া হয়। সংবিধান স্থগিত ঘোষিত হয়। সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আহসান উদ্দিনকে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করা হয়। এরশাদ নিজে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং অপর দুই বাহিনীর প্রধানগণ উপ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন। ১৯৮৩ সালের ১১ ডিসেম্বর আহসান উদ্দিনকে সরিয়ে এরশাদ নিজেই রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হন। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তার দৃশ্যত এরশাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিলেও, প্রকৃতপক্ষে তা ছিল রক্তপাতহীন এক সামরিক অভ্যুত্থান। ক্ষমতা গ্রহণের পর জেনারেল এরশাদ তার সামরিক শাসনকে বৈধকরণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

৩.২.১ জেনারেল এরশাদের রাজনৈতিক বৈধতা অর্জনের প্রক্রিয়া ঃ

জেনারেল এরশাদ রাজনৈতিক বৈধতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি সফলতা অর্জন করতে পারেননি। তিনি সব সময় সামরিক বাহিনীর উপর নির্ভর করতেন। জেনারেল এরশাদ কখনো বেসামরিক প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল ছিলেন না।[২] জেনারেল এরশাদ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্যে ছিল গণভোট, উপজেলা নির্বাচন, সংসদ নির্বাচন ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ইত্যাদি। তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাবে বৈধতার প্রক্রিয়া ব্যর্থ হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রাজনৈতিক বৈধতা অর্জন করতে সক্ষম হননি।

৩.২.২ গণভোট '৮৫ঃ

জেনারেল এরশাদের রাজনৈতিক বৈধতা অর্জনের জন্য তার প্রথম পদক্ষেপ ১৯৮৫ সালে ৬ এপ্রিলের সংসদ নির্বাচনে বিরোধী দলকে অংশগ্রহণ করাতে ব্যর্থ হয়েছিলো। ঐ সময় বিরোধী দলকে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করাতে নির্বাচনের তারিখ ৪ বার পরিবর্তন করেন। তিনি ক্ষমতা বৈধকরণ এবং নির্বাচনের পথকে প্রশস্ত করার জন্যে গণভোটের আয়োজন করেন এবং ১ মার্চ এক গণভোট অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। তার সরকারের নীতি এবং কর্মসূচি এবং নির্বাচন অনুষ্ঠান পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের উপর জনগণের আস্থা আছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য এক গণভোটের আয়োজন করা হয়। 'হাঁ'-'না' এ পদ্ধতিতে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত গণভোটে লেঃ জেনারেল হুসেইন মোহাম্মদ

Dhaka University Institutional Repository

এরশাদ বিপুল আস্থা ভোট পেয়েছিলেন।[৩] বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী প্রদত্ত ভোট ৭২.২ শতাংশ এবং আস্থা সূচক ভোট লাভ ৮৪.১৪ শতাংশ। কিন্তু জেনারেল এরশাদের এই নির্বাচন ছিলো প্রহসনমূলক। তখন দেশের সকল বিরোধী জোট এ গণভোট প্রত্যাখান করে।[৪] এভাবে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতাকে বৈধ করার চেষ্টা করেন।

৩.২.৩ উপজেলা নির্বাচন '৮৫ ঃ

জেনারেল এরশাদ পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী উপজেলা নির্বাচন করতে ব্যর্থ হয়। কারণ ১৯৮৩ সাল থেকে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন ১৫ দলীয় ঐক্যজোট উপজেলা নির্বাচনের বিরোধীতা করে দেশব্যাপী দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৮৪ সালের ২৪ মার্চ দেশে প্রথম বারের মত উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু তৎকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে এ নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করা হয়। ১৯৮৫ সালে ১ মার্চ তারিখে সরকার দ্বিতীয় বারের মত উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করে। সে অনুসারে নির্বাচন কমিশন ১৬ ও ২০ মে নির্বাচনী কর্মসূচি ঘোষণা করেন। "১৯৮২ সালের স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ পুনর্গঠন অধ্যাদেশ) এবং ১৯৮৩ সালের উপজেলা পরিষদ (চেয়ারম্যান নির্বাচন) বিধিমালা" অনুসারে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সরকার উপজেলা নির্বাচনকে অরাজনৈতিক ও নির্দলীয় বলে ঘোষণা করেন। ১৬ মে প্রথম উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। স্থগিতকৃত ভোট কেন্দ্রগুলোতে ২০ মে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২৫ মে অনুষ্ঠিত হয় উপজেলা চেয়ারম্যানদের শপথ গ্রহণ।[৫]

৩.২.৪ রাজনৈতিক দল গঠন ঃ

জেনারেল এরশাদের বেসামরিকীকরণের অন্যতম পদক্ষেপ ছিলো রাজনৈতিক দল গঠন। তার দল গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৮ দফা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে। এর প্রথম পদক্ষেপ ছিলো ১৮ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিষদ' নামে বিভিন্ন পর্যায়ে তথাকথিত অরাজনৈতিক কমিটি গঠন করেন। এছাড়া নতুন বাংলা ছাত্র সমাজ ও নতুন বাংলা যুব সংহতি নামে সরকার সমর্থক ছাত্র ও যুব সংগঠন গড়ে তোলা হয়। ১৯৮৩ সালে ২৭ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি আহসান উদ্দীন চৌধুরীকে চেয়ারম্যান করে জাগদল নামে একটি সরকার সমর্থক রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়। ১৯৮৫ সালের ১৬ আগস্ট জনদল, ইউ.পি.পি, গণতান্ত্রিক পার্টি, মুসলিম লীগ (সিদ্দিকী) এবং বি.এন.পি (শাহ আজিজ) এই ৫টি দল সমন্বয়ে একটি সরকার সমর্থক জোট গঠন করা হয়। এই জোটভূক্ত দলগুলো একীভূত হয়ে ১৯৮৬

Dhaka University Institutional Repository

সালের ১ জানুয়ারি জাতীয় পার্টি নামে একটি নতুন দল গঠন করে। জেনারেল এরশাদ আনুষ্ঠানিক ভাবে যোগদান না করলেও পার্টির সভা সমাবেশে উপস্থিত হয়ে তার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন।[৬]

৩.২.৫ তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৮৬ ঃ

জেনারেল এরশাদ ২৬ এপ্রিল জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান ঘোষণা করেন। ২১ মার্চ তিনি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে বিরোধী দলকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বলেন, "বিরোধীদল যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে তা হলে সব রকমের রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে। আওয়ামী লীগ সহ ৮ দল জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষনা করে। বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট নির্বাচন বর্জন করে। পরবর্তীতে ৭ মে সারাদেশে হাঙ্গামার মধ্য দিয়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে জাতীয় পাটি ১৫৩, আওয়ামী লীগ ৭৬, জামায়াতে ইসলামী ১০, কমিউনিস্ট পাটি ৫, এন.এ.পি. ৫, মুসলিম লীগ ৪, জাসদ (রব) ৪, জাসদ (সিরাজ) ৩, ওয়ার্কাস পাটি ৩, ন্যাপ (মোজাফ্ফর) ২, এবং স্বতন্ত্র ও অন্যান্য সদস্যরা ৩২ টি আসন লাভ করে।[৭] অতঃপর প্রেসিডেন্ট হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ ২৫ মে নবনিযুক্ত মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।[৮]

সারণি ৩.৩ ঃ ১৯৮৬ সালের তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তি

দলের নাম	প্রার্থীর সংখ্যা	আসন লাভ	প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার
জাতীয় পার্টি	৩০০	১৫৩	৪২.৩৪
আওয়ামী লীগ	২৫৬	৭৬	২৬.১৬
এন.এ.পি	১০	৫	১.২৯
কমিউনিস্ট পার্টি	৯	৫	০.৯১
বাকশাল	৬	৩	০.৬৭
জাসদ (সিরাজ)	১৪	৩	০.৮৭
ওয়ার্কাস পার্টি	৪	৩	০.৫৩
ন্যাপ (মোজাফ্ফর)	১০	২	০.৭১
গণ আজাদী লীগ	১	-	০.৮৮
জামায়াত-ই-ইসলামী	৭৬	১০	৪.৬১
জাসদ (রব)	১৩৮	৪	২.৫৪
মুসলিম লীগ	১০৩	৪	১.৪৫
স্বতন্ত্র ও অন্যান্য	৬০০	৩২	১৬.১৯
মোট	১৫২৭	৩০০	১০০

Source- Government of the people's Republic of Bangladesh. Election commission, Report: Jatiya Sangsad Elections. 1986. Dhaka, 1988.

Dhaka University Institutional Repository

৩.২.৬ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন '৮৬ ঃ

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ অবৈধভাবে যে ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়া শুরু হয় তা বৈধ করার অপচেষ্টায় এ নির্বাচন। ১৭ সেপ্টেম্বর তৃতীয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার তারিখ ধার্য করা হয়েছিলো। নির্বাচনে হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদসহ ১৬ জন মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। পরে ৪ জন মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন। অতঃপর ১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জেনারেল এরশাদ বিপুল ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ঘোষণা করা হয়। নির্বাচনে তিনি ২,১৭,৯৫,৩৩৭ ভোট পান। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী খেলাফত আন্দোলনের প্রার্থী মাওলানা মোহাম্মাদ উল্লাহ হাফেজী হুজুর ১৫,১০,৪৫৬ ভোট পান।[৯]

৩.২.৭ চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন '৮৮ ঃ

বিরোধী দলবিহীন সংসদের সপ্তম সংশোধনী বিল পাশের পর ১০ নভেম্বর সামরিক শাসন প্রত্যাহার ও সংবিধান পুনরুজ্জীবিত করা হলো। বিরোধী দলসমূহ এরশাদ সরকারকে বৈধ সরকার হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং রাষ্ট্রপতি এরশাদের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত রাখে। বিরোধী জোট সমূহ ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর "ঢাকা অবরোধ" কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই পরিস্থিতিতে সরকার ২৭ নভেম্বর সারাদেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে সকল রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ৬ ডিসেম্বর তারিখে রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদও ভেঙ্গে দেন এবং ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ সংসদ নির্বাচনের তারিখ ধার্য করেন। নির্বাচনে ৩০০টি আসনের মধ্যে জাতীয় পর্টি ২৫১টি আসন লাভ করে। কিন্তু বিরোধী দলগুলো অবৈধ এরশাদ সরকারের পদত্যাগ ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অবাধ নির্বাচনের দাবি অব্যাহত রাখেন। ৮ দল, ৭ দল, ৫ দল, জামায়াতে ইসলামী দল এবং অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দ জেনারেল এরশাদ সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী জানান।[১০]

৩.২.৮ সংবিধানের সংশোধনী সমূহ ঃ

সপ্তম সংশোধনী

১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর নবনির্বাচিত সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী বিল গৃহীত হয়। ১১ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতি লাভ করে। (পরবর্তীতে ২০১০ সালের ২৬ আগস্ট সংশোধনীটি আদালত কর্তৃক বাতিল ঘোষণা করা হয়) এই

Dhaka University Institutional Repository

সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ তারিখের সামরিক আইন ঘোষণা এবং উক্ত ঘোষণা বলে ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর পর্যন্ত প্রণীত সকল সামরিক আইন, আদেশ, নির্দেশ ও অধ্যাদেশ এবং গৃহীত সকল ব্যবস্থা অনুমোদন ও বৈধতা লাভ করে।

অষ্টম সংশোধনী

চতুর্থ জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অষ্টম সংশোধনী। ১৯৮৮ সালে ১১ মে অষ্টম সংশোধনী জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয়।[১১] ৭ জুন অষ্টম সংশোধনী বিল সংসদে পাশ হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে ঘোষণা করা হয় যে, ইসলাম হবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম এবং ঢাকার বাইরে হাইকোর্ট বিভাগের ৬ টি বেঞ্চ স্থাপন করার কথা বলা হয়।

নবম সংশোধনী

চতুর্থ জাতীয় সংসদে ১৯৮৯ সালের ৬ জুলাই নবম সংশোধনী বিল উত্থাপিত হয়। ১০ জুলাই তারিখে বাংলাদেশের সংবিধানের নবম সংশোধনী বিল পাশ হয়। ১১ জুলাই রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে। এই সংশোধনীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ঃ

* উপ রাষ্ট্রপতি নির্বাচকমন্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত হবেন।

* রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন একসঙ্গে একই তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।

* উপরাষ্ট্রপতি পদে কোন ব্যক্তি একাদিক্রমে দুই মেয়াদের অধিক অধিষ্ঠিত থাকতে পারবে না।

দশম সংশোধনী

১৯৯০ সালের ১০ জুন চতুর্থ জাতীয় সংসদের দশম সংশোধনী বিল উত্থাপিত হয়। ১২ জুন জেনারেল এরশাদের শাসনামলে সর্বশেষ সংশোধনী পাশ হয়। এ বিল ১৯৯০ সালের ২৩ জুন তারিখে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে। তা নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

১। নবম সংশোধনীতে রাষ্ট্রপতির মেয়াদ পূর্তির ১৮০ দিন পূর্বে নতুন নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। তা নিরসনের জন্য নির্ধারণ করা হয় যে, মেয়াদ পূর্তির ১৮০ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে।

২। ৬৫ নং অনুচ্ছেদে জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য নির্ধারিত ৩০টি আসন আরও ১০ বছরের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।[১২]

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩ ১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থান

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ জেনারেল এরশাদ বিনা প্রতিরোধে ক্ষমতা দখল করলেও কোন রাজনৈতিক দল তার সরকারের বৈধতা স্বীকার করেনি। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয়ে গঠিত ১৫ দলীয় এবং ৭ দলীয় জোট অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার ও একটি নির্বাচিত সংসদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। বিক্ষোভ, মিছিল, হরতাল, ঘেরাও ইত্যাদি ছিল বিরোধী দল সমূহের আন্দোলনের হাতিয়ার। অপরদিকে, এরশাদ আন্দোলন দমনের জন্য জেল, হত্যাসহ সকল প্রকার নিপীড়ন চালাতে থাকে। ফলে আন্দোলন তীব্র হতে থাকে।

মূলতঃ তার ৯ বছরের শাসনামলে জনগণের মনে সঞ্চিত হয় ক্ষোভ, ঘৃণা এবং ক্রোধ। জেনারেল এরশাদ যখন ১৯৯১ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিতব্য রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রার্থীতা ঘোষণা করেন তখন থেকে গণঅন্দোলনের সূচনা হয়। ১৯৯০ সালের ২৮ জুন এরশাদ সরকারের পতনের দাবিতে ৩ জোট সরাদেশে হরতাল পালন করে। এই ধারাবাহিকতায় ২৯ জুলাই গণবিক্ষোভ দিবস ২৬ আগস্ট অনুরূপ কর্মসূচি পালন করে। ১৯৯০ সালের ১০ অক্টোবর, পাচঁ, সাত ও আট দলীয় ঐক্যজোটের সচিবালয় অবরোধের মাধ্যমে দেশব্যাপী দূর্বার গণআন্দোলন শুরু হয়।

মূলত ১০ অক্টোবর থেকে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ে রাজধানী ঢাকা শহর রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে এরশাদ ২৭ নভেম্বর জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। রাস্তায় রাস্তায় পুলিশ, বি.ডি.আর এবং সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়। ২৬ নভেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত সরকার উৎখাতে আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে ৫০ জন নিহত হয়। ৩ ডিসেম্বর এরশাদ সরকার সেনাবাহিনীকে কঠোর হওয়ার নির্দেশ দেন। রাত সাড়ে ৯ টায় এইচ.এম. এরশাদ জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া এক রেডিও, টিভি ভাষণে কেয়ার টেকার সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের শর্ত দেন। কিন্তু বিরোধী জোট ও দলগুলো নিঃশর্ত পদত্যাগ দাবি করে। ৪ ডিসেম্বর রাত ১০ টায় টিভির খবরের ঘোষণা দেন যে, প্রেসিডেন্ট এরশাদ বিরোধী দলের মনোনীত ভাইস প্রেসিডেন্টের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে রাজী আছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তীব্র গণ আন্দোলনের মুখে প্রেসিডেন্ট এরশাদ ৪ ডিসেম্বর রাতে রেডিও-টেলিভিশনের ভাষণের মাধ্যমে পদত্যাগের ঘোষণা দেন এবং বিরোধী দল সমূহকে উপরাষ্ট্রপতি পদে একজন ব্যক্তিকে মনোনীত করার আহবান করেন। বিরোধীদলগুলো ৫ ডিসেম্বর ১৯৯০ সালে মনোনীত উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের নাম ঘোষণা দেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদ তা গ্রহণ করেন। বৃহস্পতিবার ৬ই ডিসেম্বর ১৯৯০ সালে ভাইস প্রেসিডেন্ট মওদুদ আহম্মেদ সংবিধানের ৫১ ক (৩) অনুচ্ছেদ মোতাবেক পদত্যাগ করেন। এরপর উপরাষ্ট্রপতির পদ শূণ্য হয়। এরপর প্রেসিডেন্ট এরশাদ সংবিধানের ৫৫ ক (১) অনুচ্ছেদে উপরাষ্ট্রপতির শূণ্য পদে বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহম্মদকে উপরাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগ করেন। শপথ বাক্য পাঠ করানোর পর এরশাদ পদত্যাগ করেন এবং পদত্যাগের দরুন উপরাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন আহম্মদ রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বিচারপতি শাহাবুদ্দিন অস্থায়ী সরকার প্রধান হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর এক বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, তার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান দায়িত্বই হচ্ছে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে সত্যিকার জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা। এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান কাজ হচ্ছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় একটি নির্বাচনের ব্যবস্থা করে দেয়া। যা করতে সরকার শত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও সফল হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা

১. *সাপ্তাহিক বিক্রম*, ১৮-২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১।

২. আমীর খসরু "*সামরিক আমলাতন্ত্রের পেশাদারিত্ব এবং রাজনীতিতে বৈধতার সংকট*" মুস্তফা মজিদ (সম্পাঃ) রাজনীতিতে সামরিক আমলাতন্ত্র, প্রশাসনিক গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা ঃ ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-৭৫।

৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা ঃ ২১-২৩ মার্চ, ১৯৮৫।

৪. The Times "*Helpers Ensure Ershad Bangladesh Poll and Propaganda Victory*" London: 22-23 March, 1985.

৫. *দৈনিক সংবাদ*, ঢাকা ঃ ১৩ মে, ২১-২৫ মে, ১৯৮৫ ।

৬. *দৈনিক সংবাদ*, ঢাকা ঃ ১৩ জানুয়ারি, ১৯৮৬।

৭. Mahammad A. Hakim, "*Bangladesh Politics: The Shahabuddin Interregnum*", Dhaka: University Press Limited, 1993, P. 25-26.

৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা ঃ ২৬ মে, ১৯৮৬।

৯. *দৈনিক বাংলা*, ঢাকা ঃ ২১ অক্টোবর, ১৯৮৬।

১০. M. Nazrul Islam, "*Parliamentary Democracy in Bangladesh An Assessment*" Perspective in Social Science, Vol. 5, University of Dhaka, October, 1988, P-59.

১১. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, "*বাংলাদেশের তারিখ*", ঢাকা ঃ মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-২২৬।

১২. *The Bangladesh Observer*, Dhaka: 13 June, 1990.

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় ঃ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়ন

প্রেসিডেন্ট এরশাদের পতনের পর তিনজোটের অঙ্গীকার ছিল বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, গত ১৯ বছরে জাতীয় পর্যায়ে ৪টি সংসদ নির্বাচন ৩টি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং ২টি গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু কোন নির্বাচনই বিতর্কের উর্দ্ধে ছিল না। তাই ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণের অল্পক্ষণ পরেই তিনি বলেন, যথাসম্ভব শীঘ্র নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গঠিত জাতীয় সংসদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করাই তার একমাত্র দায়িত্ব। তাই স্বৈরাচার মুক্ত পরিবেশে সকল দলের অংশগ্রহণের জন্য অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করেন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন ১৯৯০ সালের ১৪ ডিসেম্বর এবং ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯০ তারিখে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন। সংবিধান মোতাবেক ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

৪.১ পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ঃ

নির্বাচনী তফসিল ঃ

দেশে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ জাতীয় সংসদ নির্বাচন করার লক্ষ্যে সরকার সর্বপ্রথম যে কাজটি সম্পন্ন করেন, তা হলো নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন। এরশাদ আমলের প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি সুলতান আহম্মদ পদত্যাগ করেন। তিনি পদত্যাগ করায় ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯০ইং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন আহম্মদ সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফকে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত করেন। তাছাড়া বিচারপতি নঈম উদ্দিন আহম্মদ ও বিচারপতি আমিনুর রহমান খানকে সরকার নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত করে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করেন।

নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা ঃ

নির্বাচন কমিশন ১৫ ডিসেম্বর '৯০ তারিখে ৫ম জাতীয় সংসদের নির্বাচনের তারিখসহ বিস্তারিত তফসিল ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে নির্বাচনের তারিখ এগিয়ে ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ সালে ৫ম জাতীয় নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ভোটার তালিকা সংক্রান্ত ঘোষণা ঃ

কমিশনার সূত্র অনুযায়ী ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটার ছিল ৬ কোটি ১৯ লক্ষ ৬৬ হাজার ১০৮ জন এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ছিল ৩ কোটি ২৮ লক্ষ এবং মহিলা ভোটার ছিল ২ কোটি ৯০ লক্ষ।

রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ ও নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ ঃ

নির্বাচন কমিশন ৫ম জাতীয় সংসদ ১৯৯১ নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য সারা দেশের ৬৪টি জেলা প্রশাসককে রিটার্নিং অফিসার ও ২টি আন্তঃজেলা নির্বাচনী এলাকার জন্য ২ জন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনারকে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করেন। ৬৬ জন রিটার্নিং অফিসার ও ৪১৭ জন সহকারী রিটার্নিং অফিসারকে সহায়তা করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন ৪৬০ জন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ১০ জন জেলা নির্বাচনী অফিসার এবং ১ জন থানা শিক্ষা অফিসার। ১৯৮৪ সালের ২০ অক্টোবর প্রকাশিত গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে জাতীয় সংসদের ৩০০টি নির্বাচনী এলাকার যে সীমানা প্রকাশিত হয় ৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন সে সীমানা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচন কর্মকর্তা অধ্যাদেশ ঃ

নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ বিধানের লক্ষ্যে নির্বাচন কর্মকর্তা অধ্যাদেশ ১৯৯০ নামে একটি নতুন অধ্যাদেশ ২৬ ডিসেম্বর '৯০ তারিখ জারি করেন। এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী নির্বাচনের দায়িত্বে নিয়োজিত সকল ব্যক্তিকে সরাসরি নির্বাচন কমিশনের অধীনে আনবার বিধান করা হয়েছে।

বিভাগওয়ারী নির্বাচনী আসন ঃ

১. রাজশাহী বিভাগে সর্বমোট আসন ৭২টি

২. খুলনা বিভাগে সর্বমোট আসন ৬০টি

৩. ঢাকা বিভাগে সর্বমোট আসন ৯০টি

৪. চট্টগ্রাম বিভাগে সর্বমোট আসন ৭২টি

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনী ইশতেহার ঃ

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সাধারণ নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক দলগুলো তাদের কর্মসূচি ও অঙ্গীকার জনগণের সামনে পেশ করার মাধ্যমে গণরায় গ্রহণের চেষ্টা করে। সেই অর্থে ইশতেহার হচ্ছে রাজনৈতিক দলের প্রদত্ত অঙ্গীকারে লিখিত দলিল।

পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে ভোটাররা রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মসূচি ও প্রতিশ্রুতি বিবেচনা করে তাদের ভোট প্রদান করে থাকে । আমাদের দেশে ইশতেহার ছাড়া কথাবার্তা দ্বারাই জনগণ প্রভাবিত হয়ে থাকে । '৯১ এর ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও দেশের প্রথম সারির রাজনৈতিক দলগুলো যথা- আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, কেন্দ্রীয় পাঁচ দল, বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি, ফ্রিডম পার্টি, ন্যাপ প্রভৃতি দলগুলো বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে তাদের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে। সাধারণ ভোটাররা এসব ইশতেহার তুলনামূলকভাবে পুংখানুপুংখ বিচার করবেন না। তবে সচেতন নাগরিক ও বুদ্ধিজীবিদের নিকট ইহা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আওয়ামী লীগের ইশতেহার ছিল সংবিধান কর্তৃক সংরক্ষিত জনগণের মৌলিক অধিকার পরিপন্থি সকল বিবর্তনমূলক আইন ও কালাকানুন বাতিল করা। বিএনপির ইশতেহার ছিল সংবিধান পরিবর্তন না করে সর্বপ্রকার কালাকানুন বাতিল করে জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করা । জাতীয় পার্টির লক্ষ্য হলো রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় সংসদের ক্ষমতার মধ্যে উপযুক্ত ভারসাম্য সৃষ্টি করা এবং তাদের মৌলিক আদর্শ ও মূলনীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যসমূহ অব্যাহত রাখা সংবিধানের কোন প্রকার পরিবর্তন হবে না। ৫ দলের ইশতেহার ছিল ১ম ও তৃতীয় সংশোধনী বাদে অন্য সব বাতিল করা হবে। জামায়াতের ইশতেহার হলো সংবিধানের ধারা হবে কোরআন সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে।

বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া নির্বাচনী জনসভায় বলেন, তার দল ক্ষমতায় গেলে দেশে কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষা ও কলকারখানা স্থাপন করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রসার ঘটানো হবে। ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণের সুদ মওকুফ ও ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করবে।

শেখ হাসিনা দেশের উত্তরাঞ্চলের এক নির্বাচনী সভায় বক্তৃতা প্রদানকালে বলেন, তার দল ক্ষমতায় গেলে 'যমুনা' বহুমুখী সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ নিবে।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচন ঃ

নির্বাচন কমিশন ২৭ ফেব্রুয়ারি '৯১ এর ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ধার্য করেন। ২৭ ফেব্রুয়ারি '৯১ ২৯৮টি আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২৯৮টি আসনের মধ্যে ২৭ ফেব্রুয়ারি '৯১ তারিখে ২৯৪টি আসনের ২১টি কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ স্থগিত হয়ে যায়। এই ২১টি কেন্দ্রের ভোট অনুষ্ঠিত হয় ৯ মার্চ '৯১। ৩০০টি আসনের মধ্যে বাকী ২টি আসন 'ময়মনসিংহ'- ও 'কুষ্টিয়া'-২ আসনে প্রার্থীর মৃত্যুজনিত কারণে নির্বাচনের তারিখ পুনঃনির্ধারণ করা হয় যথাযথভাবে ১৪ মার্চ '৯১ ও ২৮ মার্চ '৯১ তারিখ।

সারণি ঃ ৪.১

নির্বাচনী মোট সাধারণ আসন	৩০০টি (সংরক্ষিত আসন ছাড়া)
মোট দলীয় প্রার্থী-২৩৫০জন স্বতন্ত্র প্রার্থী-৪২৫ জন	সর্বমোট প্রার্থীর সংখ্যা- ২৭৭৪ জন
অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল	৭৬ টি

সংখ্যা	
মোট ভোটারের সংখ্যা	৬,১৯,৬৩,১০৮ জন
পুরুষ ভোটারের সংখ্যা	৩,২৮,৮৭,৮৩৩ জন
মহিলা ভোটারের সংখ্যা	২,৯০,৭৫,২৭৫ জন
মোট ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা	২৩,৯৬২ টি
রিটার্নিং অফিসার	৬৭ জন
প্রিজাইডিং অফিসার	২৩,৯১৬ জন
সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার	১,১১,৬১৬ জন
পোলিং অফিসার	২,২৩,২৩২ জন
ভোটার কক্ষের সংখ্যা	১,১১,৬১৬ টি
ভোট কেন্দ্রে নিয়োজিত ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা সর্বমোট সংখ্যা	৩,৫৮,৮৮০ জন

Dhaka University Institutional Repository

মনোনয়নপত্র দাখিল ঃ

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯১ এ প্রতিদ্বন্দ্বিতার লক্ষ্যে মনোনয়নপত্র দাখিলের নির্ধারিত দিনে ১৩ জানুয়ারি (১৯৯১) ৩০০টি নির্বাচনী এলাকার জন্য ৭৫টি রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র সদস্যদের পক্ষ থেকে ৩৮৭২ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে ৫৭টি বাতিল ঘোষিত হলে বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা দাড়ায় ৩৮১৫ জন। কিছু নির্বাচনী এলাকায় বাতিলকৃত প্রার্থীর আবেদন ও আবেদন নিষ্পত্তির পর এবং তিনটি নির্বাচনী এলাকার প্রার্থীগণের মৃত্যুজনিত কারনে নতুনভাবে ঘোষিত তিনটি নির্বাচনী তফসিল অনুযায়ী গৃহীত ৩২টি বৈধ মনোনয়নপত্র সহ বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা দাড়ায় ৩৮৩০ জন [১]। নির্বাচনী তফসিল অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১০৪৩ জন প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন। ফলে চূড়ান্তভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা দাড়ায় ২৭৮৭ জন।

সারণি ঃ ৪.২

প্রার্থীতা প্রত্যাহারের পর বিভাগ অনুযায়ী আসন সংখ্যা, বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা, প্রার্থীতা প্রত্যাহারের সংখ্যা ও চূড়ান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা দেখা হলঃ

ক্রঃ নং	বিভাগ	আসন সংখ্যা	আপীল ও রীট আবেদন নিস্পত্তির পর বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা	প্রার্থীতা প্রত্যাহার - কারীর সংখ্যা	চূড়ান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা
১	রাজশাহী	৭২	৯১৫	২৬১	৬৫৪
২	খুলনা	৬০	৭৫৮	২০০	৫৫৮
৩	ঢাকা	৯০	১১৫৬	২৮৬	৮৭০
৪	চট্টগ্রাম	৭৮	১০০১	২৯৬	৭০৫
	মোট	৩০০	৩৮৩০	১০৪৩	২৭৮৭

সূত্রঃ নির্বাচনী কার্যক্রম প্রতিবেদন, জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯১, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, পৃঃ ১৫।

নির্বাচনী ফলাফল ঃ

৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন/৯১ সর্বমোট আসন সংখ্যা হিল ৩৩০টি। এর মধ্যে ৩০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। ৩০০টি সাধারণ আসন যা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ৩০০ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১৪০টি আসন লাভ করে। তাদের ভোটের শতকরা হার ৩০.৮১% । বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২৪৬টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

Dhaka University Institutional Repository

করেন। আওয়ামী লীগ ৩৬টি আসন ৮ দলীয় অন্যান্য শরীকদের বন্টন করেন। আওয়ামী লীগের প্রাপ্ত আসন ৮৮ এবং তাদের প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার ৩০.০৮% অর্থাৎ বিজয়ী বিএনপি'র থেকে সামান্য কম। ৭৫টি রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র সদস্যগণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে তন্মধ্যে ১২টি রাজনৈতিক চল ২৯৭ টি আসন লাভ করে এবং ৩টি আসন লাভ করে স্বতন্ত্র প্রার্থীগণ। ফলে ৬৩টি রাজনৈতিক দল কোন আসন লাভ করে নাই। আবার যে ১২টি দল আসন পেয়েছে তন্মধ্যে ৬টি রাজনৈতিক দল ১টি করে আসন পায়। প্রদত্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে দলগতভাবে ৫টি দলের অবস্থান সুদৃঢ় আর ক্ষমতার লড়াই হয়েছে ২টি দলের মধ্যে, আবার ৩০টি মহিলা সংরক্ষিত আসন যা ৩০০জন নির্বাচিত এমপিদের ভোটে নির্বাচিত হন।

৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০টি মহিলা সংরক্ষিত আসনের মধ্যে বিএনপি জামায়াতের সাথে আঁতাত করে যথাক্রমে ২৮টি ও ২টি আসন ভাগাভাগি করে নেন। কারণ মহিলা আসন নির্বাচন পদ্ধতি হল সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। সেক্ষেত্রে বিএনপির ১৪০ ও জামায়াতের ১৮টি সর্বমোট ১৫৮টি ভোটের মাধ্যমে মহিলা আসনগুলো নির্বাচিত হয়।

৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সর্বমোট ৭৬টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে এর মধ্যে ৬৫টি রাজনৈতিক দল একটি আসনও পায়নি।

ফলাফল বিশ্লেষণ ঃ

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উক্ত নির্বাচনে সর্বমোট ৬,২১,৮১,৭৪৩ জন বৈধ ভোটারের মধ্যে ৩,৪৪,৭৭,৮০৩ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। এর মধ্যে সর্বমোট বৈধ ভোটের সংখ্যা ৩,৪১,০৩,৭৭৭ এবং বাতিলকৃত ভোটের সংখ্যা ৩,৭৩,৩২২। প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার ৫৫.৪৫ এর মধ্যে বৈধ ভোটের হার ৯৮.৯২% এবং বাতিলকৃত ভোটের হার ১.০৮%। উক্ত নির্বাচনে ৭০৪টি টেন্ডার্ড ভোট পরে যার শতকরা হার ০.০০২।[২]

নিম্নের সারণিতে (৪.৩) বাংলাদেশের ইতিহাসে (১৯৭৩-১৯৯১) জাতীয় সংসদের যে, ৫টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে উক্ত নির্বাচন সমূহে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলের সংখ্যা, মোট প্রার্থী সংখ্যা মোট ভোটার সংখ্যা এবং প্রদত্ত ভোটের শতকরা হারের তুলনামূলক চিত্র প্রদত্ত হল।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ঃ ৪.৩

বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচন ঃ ১৯৭৩-১৯৯১

ক্রমিক নং	নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ও বছর	অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলের সংখ্যা	মোট প্রার্থীর সংখ্যা (স্বতন্ত্র সহ)	সর্বমোট ভোটার সংখ্যা	প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার
১	৭ মার্চ, ১৯৭৩	১৪	১২০৯	৩,৫২,০৫,৬৪২	৫৫.৬১
২	১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯	২৯	২৫৪৭	৩,৮৩,৬৩,৮৫৮	৫০.২৪
৩	৭ মে, ১৯৮৬	২৮	১৯৮০	৪,৭৩,২৫,৮৮৬	৬০.২৮
৪	৩ মার্চ, ১৯৮৮	৮	১১৯২	৪,৯৮,৬৩,৮২৯	৫৪.৯৩
৫	২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১	৭৫	২৭৮৭	৬,২১,৮১,৭৪৩	৫৫.৪৫

সূত্রঃ Professor M. Saydullah Bhuyan and Arun Kumar Goswami, The June 1996 Parliamentary Election In Bangladesh: A Review, SS Vol. XV, No.2 (1998): p-26 এবং নির্বাচনী কার্যক্রম প্রতিবেদন জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়। পৃঃ ১৬-৫১।

উক্ত সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৯৭৩ থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে অনুষ্ঠিত ৫টি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্যে ১৯৯১ সালের ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সর্বাধিক সংখ্যক ৭৫টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। এরপরেই অবস্থান দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৯টি রাজনৈতিক দল। ৩য় এবং ৪র্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সকল দল অংশগ্রহণ না করার ফলে উক্ত দুটি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যার ২য় ও ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের থেকে অনেক কম। পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ছিল স্বতন্ত্র সহ ২৭৮৭ এবং দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র সহ ২৫৪৭ জন।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহম্মদ ২৬ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের প্রাক্কালে রেডিও এবং টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ অনুষ্ঠানের দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, "দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই আমার অস্থায়ী সরকারের প্রধান কর্তব্য ছিল একটি অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করা। এই লক্ষ্যে আমি ছিলাম অবিচল, অটল ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাজনৈতিক দলগুলোর দাবীর প্রেক্ষিতে সুপ্রীম কোর্টের তিন জন কর্মরত বিচারপতি সমন্বয়ে নির্বাচন কমিশনকে পুনর্গঠন করেছি। এই নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ স্বাধীন। এর কর্তব্য সম্পাদনের জন্য একটি বিশেষ অধ্যাদেশ জারি করে একে যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তা এই উপমহাদেশে নজীর বিহীন। নির্বাচনে নিযুক্ত কর্মচারীদেরকে কর্তব্য কাজে অবহেলার জন্য এই

Dhaka University Institutional Repository

কমিশন প্রয়োজনীয় শাস্তি প্রদান করতে পারবে।[৩] প্রকৃত পক্ষেই ২৭ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন ছিল নিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে নজীর বিহীন। নির্বাচনের পর দেশী বিদেশী পত্র পত্রিকা ও পর্যবেক্ষণ দল উক্ত নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে এস, আব্দুল হাকিম তার বইয়ে উল্লেখ করেছেন, "২৭ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন ছিল এক অভূতপূর্ব নির্বাচন। এটিকে দেশের সবচেয়ে সুষ্ঠু অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আখ্যা দেয়া হয়। জনসাধারণ দলে দলে নির্বিঘ্নে তাদের ভোট দিতে আসে। নির্বাচনের দিনটি মনে হয়েছিল একটি উৎসবমূখর দিন। বৃটেন, জাপান, সার্ক দেশসমূহের এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের বৈদেশিক পর্যবেক্ষকরা আমাদের নির্বাচন দেখে সকলেই মন্তব্য করেছেন যে, নির্বাচন সত্যিই সুষ্ঠু, অবাধ এবং নিরপেক্ষ হয়েছে।"[৪] কিন্তু নির্বাচনে সূক্ষ কারচুপি হয়েছে কিংবা নির্বাচন সুষ্ঠু হয় নাই এমন প্রশ্ন তোলেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা।

১ মার্চ (১৯৯১) নির্বাচনোত্তর এক সাংবাদিক সম্মেলনে নির্বাচনে বিজয়ী বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া বলেন, "নির্বাচন অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তবে ভোটার তালিকা ছিল ত্রুটিপূর্ণ। ভোটার তালিকায় ত্রুটি না থাকলে বি.এন.পি দুই তৃতীয়াংশ আসন পেত"।[৫] অতএব, একথা বলা যায় যে, ১৯৯১ এর পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই নির্বাচনই প্রথম বারের মত অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হিসেবে বিবেচিত। এই নির্বাচনের মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয়েছে। গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা সূচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.২ খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ গঠন ঃ

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি,এন,পি) একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেলেও নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারায় সরকার গঠন নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহম্মদ ১ মার্চ (১৯৯১) রাতে রেডিও-টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্য নির্বাচনোত্তর এক ভাষণে বলেন, "কোন দল নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করেছে এ ব্যাপারটি নিশ্চিত না হওয়ায় এ মুহূর্তে মন্ত্রিপরিষদ গঠন সম্ভব নয়।"[৬] বিএনপির পক্ষ থেকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির এ বক্তব্যের প্রতিবাদ করা হয়। ২ মার্চ (১৯৯১) বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, " সরকার গঠনে কোন প্রকার দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকা উচিত নয়।"[৭] এর ১ দিন পূর্বে বেগম জিয়া সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সম্মেলনেও বলেছিলেন, প্রয়োজনে তারা জাতীয়তাবাদী শক্তিকে নিয়ে সরকার গঠন করবে। তবে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি বহাল থাকায় বিভিন্ন দল খালেদা জিয়াকে সরকার গঠন করতে না দেয়ার জন্য রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করেন। ৪ মার্চ (১৯৯১) আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের একটি প্রতিনিধি দল অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক মিমাংসা ছাড়া মন্ত্রিপরিষদ গঠন করতে পারেন না।" এর জবাবে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন আহম্মদ প্রতিনিধিদলকে বলেন, "যিনিই প্রধানমন্ত্রী হবেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নিরপেক্ষতা হারাবেন না।"[৮] প্রকৃতপক্ষে সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের নির্বাহী কর্তৃত্ব হস্তান্তর করতে না পারলেও প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিপরিষদ নিয়োগে কোন বাধা নেই। সংবিধানের ৫৮(১) ও ৫৮(৩) অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। সংবিধানের ৫৮(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্রপতিকে তাহার দায়িত্ব পালনে সহায়তা করিবার এবং পরামর্শ দানের একটা মন্ত্রিপরিষদ থাকিবে" এবং ৫৮(৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্রপতি তাহার বিবেচনায় সংসদ সদস্য গণের মধ্যে হইতে কিংবা সংসদ সদস্য হইবার যোগ্য ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে একজন প্রধানমন্ত্রী এবং তিনি যে রূপ আবশ্যক মনে করিবেন সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী নিয়োগ করিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী পরিষদের সদস্য হইবেন না।" [৯] এমতাবস্থায় সংবিধান অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ গঠনে বাধা না থাকলেও রাষ্ট্রপতির কাছে বিবেচ্য বিষয় বিএনপি'র সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে কি না? ঐ মুহূর্তে জাতীয় সংসদের নির্বাচিত ৩০০ আসনের মধ্যে একাধিক আসনে বিজয়ী সাংসদদের ছেড়ে দেয়ার কারণে ১০টি আসন শূন্য ঘোষিত হয়। এর মধ্যে বিএনপি প্রধান বেগম খালেদা জিয়ার ৪টি জাতীয় পার্টি প্রেসিডেন্ট হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের ৪টি, আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহম্মদের ১টি ও বাকশালের আব্দুর রাজ্জাকের ১টি আসন। উক্ত ১০টি আসন বাদ দিলে জাতীয় সংসদে তখনকার আসন সংখ্যা দাড়ায় ৩০০ - ১০ = ২৯০টি। এর মধ্যে বিএনপি'র ৪টি আসন ছেড়ে দেয়ায় আসন সংখ্যা দাড়ায় ১৩৬টি।

Dhaka University Institutional Repository

২৯০টি আসনের মধ্যে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন ২৯০/২=১৪৫+১=১৪৬টি । কিন্তু বিএনপি'র আসন ছিল ১৩৬; নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতার জন্য তাদের ১০টি আসন কম ছিল। এইরূপ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ১১ মার্চ (১৯৯১) একটি স্থিতিশীল সরকার গঠনের লক্ষ্যে বিএনপিকে সমর্থন দানের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন। ঐ দিন জামায়াত ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান স্বাক্ষরিত এক পত্রে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে জানান, "পার্লামেন্টে তার পার্টি একটি স্থিতিশীল সরকার গঠনে বিএনপি'র পার্লামেন্টারী পার্টিকে পূর্ণ সহযোগিতা ও সমর্থন দিবে।" [১০] জামায়াতে ইসলামীর ১৮ জন সংসদ সদস্যদের সমর্থনের ফলে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির কাছে জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল নিয়ে আর কোন প্রশ্নের অবতারণা রইলো না। ফলে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি'র মন্ত্রিপরিষদ গঠনে সকল বাধা অপসারিত হল। অবশেষে ১৯ মার্চ (১৯৯১) অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহম্মদ সাংবিধানের ৫৮(১) ও ৫৮(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিএনপি'র পার্লামেন্টারী পার্টির প্রধান বেগম খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী করে ১০ জন কেবিনেট মন্ত্রী ও ২১ জন প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ করেন। ঐ দিন বঙ্গভবনের দরবার হলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া এক অনাড়ম্বর পরিবেশে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। বেগম জিয়ার নেতৃত্বে ১০ জন মন্ত্রী ও ২০ জন প্রতিমন্ত্রী শপথ গ্রহণ করে মন্ত্রিসভা পূর্ণ করে। বিএনপি'র সাংসদ আব্দুল মতিন চৌধুরী প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত হলেও ঐ দিন শপথ গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে নব আঙ্গিকে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। যদিও রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি বহাল থাকায় পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক সরকার গঠনে আরও কয়েক মাস সময়ের প্রয়োজন হয়। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণের পর সাপ্তাহিক বিচিত্রার সাথে এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, "আমাদের সরকারের প্রধান করণীয় হবে দেশের বিধ্বস্থ অর্থনৈতিক পুনর্জীবনের লক্ষ্যে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি, রুগ্ন ও বন্ধ শিল্প পুনরায় চালু করা নতুন শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা এবং বেকার সমস্যা সমাধান করা। শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে লেখাপড়া করতে পারে। মহিলা সমাজের উন্নয়নের জন্য সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ দেয়া হবে।" [১১] সাপ্তাহিক রোববারের সঙ্গে অপর এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, "স্বৈরাচারের হাতে পর্যুদস্থ দেশে জনগণের গণতান্ত্রিক আকাঙ্খা রূপায়নের জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক পুনর্গঠনের মধ্য দিয়েই অগ্রসর হতে হবে।" [১২] প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার উল্লেখিত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণা ও মানসিকতার প্রকাশ পেয়েছে এবং স্বৈরাচার মুক্ত পরিবেশে অর্থনৈতিকভাবে

Dhaka University Institutional Repository

পর্যুদস্থ দেশটির পুনর্গঠনের তাঁর সদিচ্ছার কথা ব্যাখ্যা করেছেন। মন্ত্রিপরিষদ গঠনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সরকার প্রধান না হলেও নির্বাহী সরকার গঠনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল ৯১ এর পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির বিজয়ের মাধ্যমে। ৩১ মার্চ (১৯৯১) জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের ৩০ জন সংসদ সদস্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। এর মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) লাভ করে ২৮টি আসন এবং জামায়াতে ইসলামী ২টি আসন। সংরক্ষিত মহিলা আসনে ২৮টি আসন লাভ করায় বিএনপি এককভাবে জাতীয় সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে সমর্থ হয়। ফলে একটি স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক সরকারের অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তার মন্ত্রিপরিষদ ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহম্মদের পরামর্শদাতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তনের পর ১৯ সেপ্টেম্বর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মদের পরামর্শদাতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তনের পর ১৯ সেপ্টেম্বর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহম্মদ রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থাধীনে গঠিত খালেদা জিয়ার মন্ত্রিপরিষদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন এবং একই দিন সংশোধিত সংবিধান অনুযায়ী সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় নির্বাহী সরকার প্রধান হিসেবে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ৪০ সদস্যের (মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী সহ) মন্ত্রী সভা শপথ গ্রহণ করে। ১৯ সেপ্টেম্বর (১৯৯১) প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ১৬ বছর পর দ্বিতীয় বারের মত সংসদীয় সরকারের যাত্রা শুরু হয়। নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার প্রধান হিসেবে বেগম খালেদা জিয়ার দায়িত্বশীল সরকার ৫ বছরের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়। সূচিত হয় গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩ সংসদ অধিবেশন ঃ

৫ এপ্রিল/৯১ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ৫ম সংসদের প্রথম অধিবেশন আহবান করেন। এর আগে ০১-০৩-১৯৯১ ইং তারিখে সংসদের সদস্যবৃন্দ নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আবদুর রউফের নিকট শপথ বাক্য পাঠ করেন। সংসদ অধিবেশন শুরু হয় ৫ এপ্রিল শুক্রবার ৯টা ৭মিঃ। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে সংসদের যাত্রা শুরু হয়। সংসদের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্পিকার সামছুল হুদা চৌধুরী, তারপর স্পিকার নির্বাচনের পালা শুরু হলো। বিএনপি সংসদীয় দলের সদস্য আব্দুর রহমান বিশ্বাস নিযুক্ত হলেন, পরবর্তীতে তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির নিকট শপথ গ্রহণ করেন। আব্দুর রহমান বিশ্বাস স্পিকার হিসেবে তার কার্যক্রম শুরু করলেন। তারপর সংবিধান অনুযায়ী অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি দেশের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে সংসদ সদস্যদের সম্মুখে বক্তব্য রাখেন। ৫ এপ্রিল/৯১ জাতীয় সংসদের অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে জল্পনাকল্পনা শুরু হয়ে গেল যে দেশের সরকার পদ্ধতি কি হবে। সরকার পদ্ধতির প্রশ্নে ১৪ এপ্রিল/৯১ সংসদ অধিবেশনে বিরোধীদল আওয়ামী লীগ দেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব উত্থাপন করে। সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে বিএনপি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ২টি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ৪ জুলাই/৯১ তে ওয়াকার্স পার্টি ৪ টি বিলের নোটিশ প্রদান করে। এ অবস্থায় আইন মন্ত্রীর নেতৃত্বে সরকারি ও বেসরকারি দলের মোট ১৫ জন সদস্যের সমবায়ে একটি বাছাই কমিটি গঠন করা হয় এবং বাছাই কমিটি ২৮ জুলাই/৯১ সর্বসম্মতিক্রমে একটি রিপোর্ট পেশ করে। এ রিপোর্টের ভিত্তিতে ৬ আগস্ট/৯১ মধ্য রাতে ৩০৭-০ ভোটে সংবিধান সংশোধনীর দ্বাদশ বিলটি পাশ হয়। এর ফলে ষোল বছরের রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির শাসনের পরিবর্তে দেশের সংসদীয় পদ্ধতির সরকার যাত্রা করে। বিলটি জনগণের সমর্থনের জন্য গণভোট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর/৯১ গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। গণভোটে জনগণ এ বিলের পক্ষে রায় দেয়। গণভোটের ফলাফলের মধ্য দিয়ে দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল। তারপর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হলো। রাষ্ট্রপতি পদটি নামে মাত্র সেহেতু সংসদ সদস্যদের দ্বারা এ পদটি নির্বাচিত হবে। ৯ অক্টোবর/৯১ আব্দুর রহমান বিশ্বাস রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস ৯ অক্টোবর শপথ গ্রহণ করেন অস্থায়ী বিচারপতি জনাব এম এইচ রহমান রাষ্ট্রপতিকে শপথ বাক্য পাঠ করান। সংসদে পাশকৃত একাদশ সংশোধনী অনুযায়ী নতুন রাষ্ট্রপতি শপথ গ্রহণের সাথে সাথেই রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন আহম্মদ ঘটনাবহুল ৩০৭ দিনের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনের পরে প্রধান বিচারপতি পদে ফিরে যান।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৪ পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি'র জয়লাভের কারণ ঃ

বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহম্মদের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে অবাধও নিরপেক্ষ নির্বাচন হিসেবে বিবেচিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন এবং পরবর্তীতে সরকার গঠন করতে সক্ষম হন। ১৯৮২ সালে তৎকালীন সেনা প্রধান লেঃ জেঃ হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বিএনপি'র কাছ থেকে যে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল ১৯৯১ সালে বিএনপি নেত্রী ও এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের আপোষহীন নেত্রী হিসেবে খ্যাত বেগম খালেদা জিয়া সেই ক্ষমতায় পুনঃপ্রবর্তন করেন। দীর্ঘ এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে বেগম জিয়া জনগণের যে আস্থা ও বিশ্বস্ততা অর্জন করতে পেরেছিলেন সেই আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করে জনগণ ১৯৯১ সালে খালেদা জিয়ার হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল। বিএনপি'র এই ক্ষমতা আরোহণ কোন নির্দিষ্ট কারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বিএনপি'র ক্ষমতারোহনের পিছনে বহুবিধ কারণ নিহিত ছিল। সাপ্তাহিক পূর্ণিমা ২৮ সংখ্যার ইয়াসিফ আকবরের প্রচ্ছদ প্রতিবেদন, "জাতীয়তাবাদী শক্তির বিপুল বিজয়" নিবন্ধে বিএনপি'র বিজয় সম্পর্কে মূল্যায়ন করেন যে "বিএনপি'র এই বিজয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। কথা ও কাজের সংগতি, স্বৈরতন্ত্র বিরোধী লড়াইয়ে আপোষহীনতা, তীব্র ব্যক্তিত্ব ঝাঝালো আকর্ষণের মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। দেশনেত্রী যেখানেই নির্বাচনী সভা করেছেন সকল স্থানে বিএনপি প্রার্থী ব্যতিক্রমহীনভাবে জয়ী হয়েছেন"।[১৩] একই নিবন্ধে আওয়ামী লীগের পরাজয় ও বিএনপি'র জয়লাভের কারণ প্রসঙ্গে ন্যাপের সৈয়দ আলতাফ হোসেন বলেছেন "অহমিকা বোধই আওয়ামী লীগকে ডুবিয়েছে।" জনগণকে ইতিবাচকভাবে উদ্বুদ্ধ করার চাইতে আওয়ামী লীগ আত্মপ্রচারণায় বেশি মশগুল ছিল। নির্বাচনে বিএনপি মাত্র ১০টি আসন পাবে। এ ধরনের আত্মম্ভরিকতাপূর্ণ উক্তির মাধ্যমে শেখ হাসিনা তার নির্বাচন প্রচারাভিযান শুরু করেছিলেন। সকল নির্বাচনী জনসভায় তিনি বলে ছিলেন, আমাকে ২০০টি আসন দিন আমি আপনাদের গণতন্ত্র দিব। শেখ হাসিনা এভাবে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে হাতের মুঠোয় নিয়েছিলেন।[১৪] সিপিবি নেতা সাইফুদ্দিন মানিক আওয়ামী লীগের পরাজয় সম্পর্কে বলেছিলেন, "২৫ ফেব্রুয়ারির রেডিও টিভিতে জাতির উদ্দেশ্য শেখ হাসিনার বক্তৃতা পরাজয়ের মূল কারণ।"[১৫] সাপ্তাহিক পূর্ণিমা ৩০ সংখ্যায় আহমেদ সিরাজ/ইরাজ আহমেদ এক প্রতিবেদনে বিএনপির জয়লাভ সম্পর্কে বিএনপির ৪জন শীর্ষ স্থানীয় নেতা ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী, ব্যারিষ্টার আব্দুস সালাম তালুকদার, ডঃ মোশাররফ হোসেন এবং সাদেক হোসেন খোকার অভিমত তুলে বলেছেন। উক্ত ৪জন নেতা প্রত্যেকে বিএনপির জয়লাভ সম্পর্কে ৫টি করে কারণ বর্ণনা করেছেন। সেগুলো হলো ঃ [১৬]

Dhaka University Institutional Repository

সাদেক হোসেন খোকার অভিমত ঃ

১. আমরা মনে করি গত সাড়ে আট বছর লড়াইয়ের ইতিহাস সারা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে বিএনপি'র জনপ্রিয়তা বেড়েছে। প্রেসিডেন্ট জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা, শাসন কাজে সততার স্বাক্ষর এবং সর্বোপরি বেগম খালেদা জিয়ার ইতিবাচক রাজনীতি মানুষের ওপর প্রভাব ফেলেছে। এছাড়া এরশাদের অর্থ কেলেঙ্কারি থেকে শুরু করে নারী কেলেঙ্কারি, আওয়ামী লীগের সময়কার দুঃশাসনের প্রেক্ষিতে আমরা ছিলাম এবারের নির্বাচনে পজেটিভ ফোর্স।

২. আমাদের এলাকায় আওয়ামী লীগের ধারণা ছিল যে, 'মাইনরিটি ভোট' তারা সহজেই পেয়ে যাবে এবং বিজয় তাদের সুনিশ্চিত হবে। দীর্ঘদিন ধরে তারা এখানে রাজনৈতিক কর্মকান্ড চালিয়েছে তাই ব্যক্তি খোকাকে তারা আন্ডার এস্টিমেট করেছিল। কিন্তু বিএনপি তাদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি করতে পেরেছিল।

৩. নির্বাচনে কৌশলগত দিক থেকে বিএনপি ছিল অগ্রগামী। এই এলাকায় ছাত্র এবং তরুণদের আগ্রহকে সাংগঠনিক রূপ দেয়া হয়। জাতীয়তাবাদী লোকদের একটি সাংগঠনিক রূপ দেয়া সম্ভব হবার ফলেই বিএনপি'র বিজয় সুনিশ্চিত হয়েছে।

৪. এই নির্বাচনী এলাকায় আওয়ামী লীগ মোঃ হানিফকে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়। এতে করে বিএনপি তথা আমার সুবিধা হয়ে যায়। জনাব হানিফ দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নন। জাতীয় পার্টি কানেশনও রয়েছে। এটা আমাদের পক্ষে একটি বাড়তি সুবিধা হিসেবে কাজ করে। তাদের দলীয় লোকেরা এ ব্যাপারে কিছুটা হতাশ হয়ে পড়ে।

আওয়ামী লীগের পরাজয় তথা বিএনপির বিজয় সম্পর্কে আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতা জনাব তোফায়েল আহম্মেদ বলেন, "আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ছিলো পরাজয়ের আর এক অন্যতম কারণ ভারতকে জড়িয়ে ধর্মহীনতার কথা বলে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অবিরাম প্রচারণা চালানো হয়েছে।"[১৭] উক্ত সাক্ষাৎকারে জনাব তোফায়েল আহম্মদ অবশ্য আওয়ামী লীগের পরাজয়ের কারণ হিসেবে দলীয় সাংগঠনিক দুর্বলতার কথাও স্বীকার করেছেন। একই প্রতিবেদনে আওয়ামী লীগের অপর এক প্রভাবশালী নেতা জনাব মোহাম্মদ নাসিম পরাজয় সম্পর্কে বলেন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে লাগামহীন মিথ্যাচার এবং সকল দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির নির্বাচনী গোপন আঁতাতের কারণে আমরা আশানুরূপ ফল লাভে ব্যর্থ হই।"[১৮]

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য কারণ সমূহ ঃ

১। বাকশাল ভীতি ঃ জনগণের ধারণা ছিল আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে বাকশাল পুনরায় চালু করা হবে। চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বাকশাল সৃষ্টি করে যে একদলীয় ব্যবস্থা কায়েম করেছিল। জনগণ সেই ব্যবস্থাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে নাই। তাই বাকশাল ভীতি ভোটারদের মধ্যে প্রবলভাবে কাজ করেছে।

২। আওয়ামী ভীতি ঃ আওয়ামী লীগের (১৯৭২-১৯৭৫) শাসনামলের স্মৃতি জনগণের কাছে খুব একটা সুখকর ছিল না। রক্ষী বাহিনীর অত্যাচার, গণবাহিনী, নকশাল বাহিনী, গোপন বাহিনী, প্রভৃতি বাহিনীর নেতিবাচক কার্যকলাপ, ১৯৭৪ সালের দূর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণহানি, গণতন্ত্রের পরিবর্তে পরিবারতন্ত্র কায়েম করার কারণে জনগণের মনে আওয়ামী ভীতি কাজ করেছে যার ফলে বিএনপির পক্ষে জয়লাভ সহজ হয়েছে।

৩ ।আওয়ামী লীগের প্রতি অবিশ্বাস ঃ ১৯৮৬ সালে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন আওয়ামী লীগ আন্দোলনের মাঠ থেকে ক্ষমতার লোভে এরশাদের অধীনে নিবার্চনে অংশগ্রহণ করে জাতির সঙ্গে যে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছিল তা জনগণ সহজে ভুলে নাই। তাই আওয়ামী লীগের প্রতি জনগণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন নাই। তারা পুনরায় জাতির সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করবেন কিনা।

৪। সংবিধানের পরিবর্তন আশংকায় ঃ নির্বাচনী প্রচারভিযানে আওয়ামী লীগ-'৭২ এর সংবিধানে পুনঃ প্রবর্তনের কথা বলেছে। কিন্তু ৫ম সংশোধনী থেকে ১০ম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের বেশ কিছু পরিবর্তন করা হয়েছিল। এর মধ্যে সংবিধানের মূলনীতিসহ সংবিধানের শুরুতে বিস্‌মিল্লাহির রহমানির র‍্যাহিম সংযোজন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্পর্কিত বিষয়, সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে গণ ভোটের বিধান, ইত্যাদি বিষয়সমূহ পরিবর্তনের আশংকায় জনগণ বিএনপি'র পক্ষে রায় দিয়েছে।

৫। জিয়াউর রহমানের আদর্শ ও সততা ঃ মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ব্যক্তিগত সততা ও আদর্শ স্বাভাবিকভাবে অধিকাংশ নাগরিকের মনের রেখাপাত করেছিল পূর্ব থেকেই। তাই জিয়াউর রহমানের মৃত্যুকে তারা স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করেন নাই। জিয়াউর রহমান এদেশের গ্রাম বাংলার আপামর মেহনতি মানুষের মনে একটি স্থায়ী আসন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন, যা এরশাদ তাঁর দীর্ঘ নয় বছরে কখনও করতে পারেন নাই। তাই ১৯৯১ সালে জিয়াউর রহমানের উত্তরসূরি বেগম জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি যখন জনগণের কাছে জিয়াউর রহমানের আদর্শ ও কর্মসূচি নিয়ে হাজির হয়েছেন। তখন জনগণ জিয়াউর রহমানের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার জন্য বেগম জিয়াকে দায়িত্ব দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৬। **সুসংগঠিত ছাত্র সংগঠন ঃ** এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে জাতীয়তাবাদী দলের অংগ সংগঠন "ছাত্র দল" এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। এরশাদের শাসনামলে তাই দেখা গেছে বিভিন্ন কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল বিপুল বিজয় অর্জন করেছে। এ কারণে ছাত্র দলের সাংগঠনিক ভিত ও বেশ মজুত ছিলো। ফলে ছাত্র সমাজ এবং তরুণদের মধ্যে বিএনপির ব্যাপক জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। এই ছাত্র এবং তরুণরাই '৯১ এর নির্বাচনে বিএনপির বিজয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

৭। **বিএনপির গণমুখী নির্বাচনী ইশতেহার ঃ** বিএনপি তাদের নির্বাচনী ইশতেহার বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা সহ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার কথা বলেছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বাধ্যতামুলক প্রাথমিক শিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন। মাদ্রাসা শিক্ষাকে মূল ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার কথা বলেছে। কৃষকদের সহজ শর্তে ঋণ দান সহ গরীব চাষীদের ৫০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ ও সুদ মওকুফ করা সহ সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্ট লাঘবের বিভিন্ন কর্মসূচি নির্বাচনী ইশতেহারে সংযুক্ত করেছে। ফলে জনগণ সহজেই বিএনপির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে।

৮। **ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ঃ** বাংলাদেশের জনসাধারনের মধ্যে শতকরা ৮৫ ভাগ মুসলমান। এই বিষয়টি লক্ষ্য রেখে বিএনপি ইতোপূর্বে সংবিধানের প্রস্তাবনায় বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম এবং জাতীয় চার মূলনীতির একটিতে আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস সংযুক্ত করেছে। বিএনপি তাই ইসলামী আদর্শ সমুন্নতরেখে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে। পক্ষান্তরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায় এদের অধিকাংশ অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত। এই শ্রেণি ধর্ম নিরপেক্ষতাকে ধর্মহীনতা মনে করে এবং বিএনপি' কে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অধিক নিরাপদ মনে করে বিএনপিকে জয়যুক্ত করেছে।

৯। **রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ঃ** আদর্শগত দিক থেকে বিএনপি এবং জাতীয় পার্টি একই মতাদর্শে গড়া অর্থাৎ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে। বিএনপির কাছ থেকে প্রেসিডেন্ট এরশাদ ক্ষমতা কেড়ে নিলেও রাষ্ট্রের তেমন কোন মৌলিক পরিবর্তন আনা হয় নাই অর্থাৎ বিএনপি সরকারের পর এরশাদের শাসনামলেও একই ধরণের রাজনৈতিক আদর্শ ও নীতি অব্যাহত থাকে। বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়েও কোন পরিবর্তন আনয়ন করা হয় নাই। ফলে এরশাদের পতনের পর রাজনৈতিক স্থিতিবস্থা বজায় থাকার আশায় জনগণ বিএনপিকে জয়যুক্ত করে।

১০। **বাম রাজনীতি পরিহার করার লক্ষ্যে ঃ** বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণের মধ্যে বাম রাজনীতি ও সমাজতন্ত্রের প্রতি অনীহা রয়েছে। ১৯৯১ সালে নির্বাচনের পূর্বে আওয়ামী লীগ কতিপয় বাম রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যে নির্বাচনী ঐক্য করেছিল তা সাধারণ ভোটারদের সুখী করতে পারেন নাই।

Dhaka University Institutional Repository

তাই সাধারণ ভোটারগণ বাম রাজনৈতিক দল সমূহকে ক্ষমতায় দেখতে আগ্রহী ছিলনা বলে বিএনপিকে বেছে নিয়েছে।

১১। দ্রব্যমুল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য ঃ আওয়ামী লীগের '৭২-'৭৫ শাসনামলে দেশের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। পরবর্তীতে সামরিক শাসনাধীনে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে চলে আসে যা এরশাদের পতন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তাই নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য জনগণ পুনরায় বিএনপিকে ভোট দান করে।

১২। ইসলামী দল সমুহের অনৈক্য ঃ বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণ ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। তাই সঙ্গতকারণে তারা ইসলামী আদর্শ ও আকীদার প্রতি দূর্বল। বাংলাদেশে যে সমস্ত ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল রয়েছে সেই সমস্ত দলগুলোর অনৈক্যের ফলে কোন দলই ধর্ম-বিশ্বাসীদের আস্থা অর্জন করতে পারে নাই। তাই তারা বিএনপিকেই ইসলামী আদর্শের বিকল্প মনে করে ভোট দিয়েছে।

১৩। আওয়ামী বিরোধী অপপ্রচার ঃ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ মনে করেন আওয়ামী লীগের পরাজয় এবং বিএনপির জয়লাভের পিছনে ব্যাপক আওয়ামী বিরোধী অপপ্রচার কাজ করেছে। বিএনপি'সহ দক্ষিণপন্থী দল সমূহ নির্বাচনী প্রচারাভিযানে আওয়ামী লীগকে ভারত পন্থী দল হিসেবে চিহ্নিত করে এবং জনগণকে বুঝাতে সক্ষম হয় যে, আওয়ামী লীগকে ভোট দিলে বাংলাদেশের সত্যিকারের স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি দেখা দিবে। বাংলাদেশ ভারতের করদ রাজ্যে পরিণত হবে। ফলে এই ভারত ভীতির কারণে জনগণ আওয়ামী লীগকে প্রত্যাখ্যান করে বিএনপিকে জয়যুক্ত করেন।

১৪। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের দূর্বলতা ঃ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা জনগণের কাছে পরিক্ষিত নেত্রী ছিলেন না। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে বিভিন্ন সময় জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা সহ সংকীর্ণ মনমানসিকতার পরিচয় দিয়েছে। তাছাড়া আওয়ামী লীগ নেত্রীর বক্তৃতা ছিল আক্রমনাত্মক। ২৫ ফেব্রুয়ারি (১৯৯১) জাতির উদ্দেশ্য দেয়া তার সর্বশেষ নির্বাচনী ভাষণে নিজ দলীয় আদর্শ ও কর্মসূচি ব্যাখ্যা করার চেয়ে প্রতিপক্ষের কুৎসা এবং প্রতিশোধ নেয়ার স্পীহা প্রবলভাবে প্রদর্শন করেছেন। জনগণ আওয়ামী লীগ নেত্রীর এই ধরণের বক্তব্য সহজভাবে গ্রহণ করেন নাই। সিপিবি নেতা জনাব সাইফুদ্দিন (মানিক) ও দাবি করেন যে ২৫ ফেব্রুয়ারি শেখ হাসিনার বক্তৃতাই ছিল আওয়ামী লীগের পরাজয়ের অন্যতম কারণ।

১৫। আওয়ামী লীগ ঠেকাও ঃ আওয়ামী লীগ নেতা জনাব মোহাম্মদ নাসিম দাবি করেন যে, দক্ষিণ পন্থী দল সমূহের গোপন আতাঁতের কারণে আওয়ামী লীগের পরাজয় হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে

Dhaka University Institutional Repository

দক্ষিণপন্থী দল সমূহের সাথে বিএনপির কোন আনুষ্ঠানিক বা গোপন নির্বাচনী মোর্চা গঠন করা হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে উল্লেখিত বিভিন্ন কারণে জনগণ আওয়ামী লীগের উপর নাখোশ ছিলেন। যে সমস্ত ভোটার আওয়ামী লীগকে ভোট দিবেন না কিংবা আওয়ামী লীগকে পছন্দ করেন না কিন্তু বিএনপির কোন শক্তিশালী প্রার্থী না থাকায় কোথাও জামায়াতকে, কোথাও জাতীয় পার্টিকে কোথাও বা স্বতন্ত্র প্রার্থীকে ভোট দিয়েছে। আবার যে সমস্ত আসনে জামায়াত কিংবা দক্ষিনপন্থী দল সমূহের কোন শক্তিশালী প্রার্থী ছিল না সেই সমস্ত স্থানে আওয়ামী লীগ ব্যতীত অন্যান্য দলের ভোট বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে চলে গেছে ফলে বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামীর অনেক আসন এইভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে যে সমস্ত আসনে বিএনপি এবং জামায়াত উভয়ই শক্তিশালী সেখানে কেউ কাউকে ছাড় দেয় নাই উদাহরণ হিসেবে দেখা যায় যে, ৯১ এর নির্বাচনে জাতীয় সংসদের ৩৪ জয়পুরহাট ১ আসনে ৪৮,১৬৭ ভোট পেয়ে বিএনপি'র মোঃ গোলাম রাব্বানী বিজয়ী হন। এর নিকটতম প্রার্থী অর্থাৎ দ্বিতীয় অবস্থানে থাকেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জনাব মোঃ আব্বাস আলী মন্ডলের প্রাপ্ত ভোট ৪৮,০৯১ ভোট পার্থক্য মাত্র ৭৬ ভোট। তৃতীয় অবস্থানে থাকেন জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান প্রাপ্ত ভোট ৪৩,৩০৮ ভোট।[১৯] বিজয়ী এবং বিজীত প্রার্থীর থেকে মাত্র ৫০০০ হাজারের ও কম ভোট। এখানে তিনজন প্রার্থীই প্রায় সমান ভোট পান। যদি নির্বাচনে গোপন আঁতাত হতো তাহলে জামায়াত প্রধান জনাব আব্বাস আলী খানকে ঐ আসনটিতে বিএনপির ছাড় দেয়ার কথা কিন্তু সেখানে স্বল্প ব্যবধানে বিএনপি প্রার্থী জয়যুক্ত হয়েছেন। কাজেই নির্বাচনে গোপন আতাঁতের পরিবর্তে আওয়ামী লীগ ঠেকাও শ্লোগানটি বেশী কার্যকরী হয়েছে। যা কিনা বিএনপি'র জয়লাভের একটি মুখ্য কারণ ছিল।

১৬। খালেদা জিয়ার আপোষহীন নেতৃত্ব ঃ বিএনপি'র জয়লাভে উল্লেখ্যযোগ্য এবং একমাত্র কারণ ছিল খালেদা জিয়ার আপোষহীন নেতৃত্ব। ১৯৮২ সালের সামরিক শাসনের পর থেকে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ যে ভাবে দলত্যাগ করে এরশাদের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছে তাতে বিএনপি'র ক্ষমতায় যাওয়াতো দূরের কথা অস্তিত্ব থাকাটাই দুস্কর ছিল। বেগম জিয়া দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করে ধ্বংস প্রায় বিএনপিকে একটি শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও আপন মহিমায় আপোষহীন নেত্রী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বেগম জিয়া জনগণের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পেয়েছিলেন ব্যাপকভাবে। বেগম জিয়ার এই জনপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায় ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এ নির্বাচনে ৫টি আসনে জয়লাভ। পক্ষান্তরে ৯১ এর ক্ষমতা প্রত্যাশী আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা তিনটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ঢাকার দুটি আসন থেকেই পরাজয়

Dhaka University Institutional Repository

বরণ করেন। কাজেই একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে খালেদা জিয়ার ব্যাপক জনপ্রিয়তাই বিএনপিকে দ্বিতীয় বারের মত ক্ষমতা গ্রহণে সহায়তা করেছিলো।

অতএব, উল্লেখিত কারণসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিএনপি'র ক্ষমতা গ্রহণের কোন একটি মাত্র কারণ নিহিত ছিল না। এর পশ্চাতে বহুবিধ কারণ নিহিত ছিল। তবে একথা বলা যায় যে বেগম জিয়া দলটিকে ক্ষমতা গ্রহণে সহায়তা করেছিল। শুধু বিএনপির ক্ষমতা লাভ নয়। গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রেও বেগম জিয়ার ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। দীর্ঘ আন্দোলনে অক্লান্ত সৈনিকের মত তিনি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলনের মাঠ ত্যাগ করেন নাই। তার একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, তিনি গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাই পরিশেষে একথা বলা যায় বাংলাদেশের গণতন্ত্রের উত্তরণে বেগম খালেদা জিয়া এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৫ নির্বাচনে বিদেশী পর্যবেক্ষকদের ভাষ্য ও পরাজিত দলের বক্তব্য ঃ

১৯৯১ সালের ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে প্রত্যক্ষ করার জন্য বেশ কিছু বিদেশী পর্যবেক্ষকদল বাংলাদেশে আসেন। যে সকল পর্যবেক্ষকদল নির্বাচনকে প্রত্যক্ষ করার জন্য বাংলাদেশে আসেন সেগুলো হলো ঃ

১. পিটার শেরের নেতৃত্বাধীন বৃটিশ পার্লামেন্টারী পর্যবেক্ষক দল।

২. হিরোমচি যাকুদার নেতৃত্বাধীন জাপানী পর্যবেক্ষক দল।

৩. কমনওয়েলথ পর্যবেক্ষক দল ও

৪. সার্ক পর্যবেক্ষক দল।

১. বৃটিশ পর্যবেক্ষক দল ঃ সর্বদলীয় বৃটিশ সংসদীয় পর্যবেক্ষক দল ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ এর ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ভোটারদের মুক্তভাবে ভোট দেয়ার দৃষ্টান্ত বলে অভিহিত করেছেন। ১ মার্চ/৯১ পর্যবেক্ষক দলের পিটার শের এবং অন্যান্য সদস্যরা বলেছেন যে, তারা ঢাকা ও সিলেটের বিভিন্ন ভোট কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন। মুক্ত এবং অবাধভাবে ভোট দানের ঘটনায় তারা সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে জানান।

২. জাপানী দল ঃ ১ মার্চ/৯১ সালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জাপানী সংসদীয় দলের নেতা হিরোমিট ফুফুকা বলেছেন এ নির্বাচন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তারা জানান যে নির্বাচনের দিনে তারা ঢাকা, ময়মনসিংহ এবং নারায়নগঞ্জের ৭টি নির্বাচনী এলাকার ২১টি ভোট কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং অনেক ভোটারদের সঙ্গে কথা বলেছেন। পর্যবেক্ষক দল দেখতে পান যে, নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব সকল কর্মকর্তা সুষ্ঠুভাবে পালন করেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এজেন্টদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব দেখতে পেয়ে আমরা অত্যন্ত খুশী হয়েছি। পর্যবেক্ষক দলের সদস্যরা বলেন, বাংলাদেশের জনগণ একটা অবাধ নির্বাচন চেয়েছিল। সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে তাদের আশা পূর্ণ হয়েছে।

৩. কমনওয়েলথ দল ঃ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য আগত কমনওয়েলথ পর্যবেক্ষকদল বৃহস্পতিবার, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ ঢাকায় বলেছিলেন যে, ২৭ ফেব্রুয়ারি, '৯১ ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের জনগণের একটি বড় সাফল্য। দলের চেয়ারম্যান দাতো প্রার্থ মানবেন সাংবাদিকদের

Dhaka University Institutional Repository

বলেন যে, নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও ভোটে দেখা গেছে যে, বাংলাদেশের জনগণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্যে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের সম্পাদিত দায়িত্বের তিনি প্রশংসা করেন।

৪. সার্ক পর্যবেক্ষক দল ঃ ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য আগত সার্ক পর্যবেক্ষকদলের ২জন সদস্য ঢাকা জেলার বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকার ১১টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ পর্যবেক্ষণ শেষে স্থানীয় সাংবাদিকদের বলেছেন যে, বাংলাদেশের এ নির্বাচন অন্যান্য সার্ক দেশের জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে থাকবে। এই দুই জনের একজন ভারতের মের্ডন পত্রিকার সম্পাদক নির্মর চক্রবর্তী বলেছেন, আমরা একটি নিরপেক্ষ, অবাধ ও সুষ্ঠু পরিবেশে ভোটারদের নির্ভয়ে ভোট দিতে দেখেছি। অপর সদস্য পাকিস্তানের প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব নিয়াজ লায়েক বলেছেন-বাংলাদেশের মত একটি ৯১ এর নির্বাচন একটি দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা। তিনি বলেন, এ ধরণের নির্বাচন অন্যান্য সার্ক দেশের জন্য একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। তিনি আরো বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার জনগণের আহবান ও দাবী পূরণ করার লক্ষ্যে সঠিকভাবে সাড়া দিতে পেরেছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৬ সংসদীয় কার্যক্রম (১৯৯১-১৯৯৬) ঃ

গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় বিশেষ করে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সংসদই হলো সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্র বিন্দু। জাতীয় সংসদের প্রধান কাজ হচ্ছে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে জনগণের আশা আকাঙ্খা অভাব অভিযোগ ও সমস্যার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা। একটি সরকার গঠন করা এবং সেই সরকারের কর্মকান্ড অনুমোদন সমর্থন এবং প্রয়োজনে সমালোচনা করা। রাষ্ট্র পরিচালনার দিক নির্দেশনা হিসেবে সংবিধানের নীতিও আদর্শ অনুযায়ী আইন প্রণয়ন, পুরাতন আইনের সংস্কার সাধন, নীতি নির্ধারণ, বাজেট ও সরকারি আয় ব্যয়ের নিয়ন্ত্রণ এবং সর্বোপরি সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। এছাড়াও সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভাগ ও আমলা শ্রেণিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য উত্থাপিত অভিযোগ, অনিয়ম, দায়িত্বহীনতা, দুর্নীতি ও কর্তব্যে অবহেলা সম্পর্কে অনুসন্ধান ও তদন্তের মাধ্যমে অভিযোগের সত্যতা সরকারের নিকট সুপারিশ সহ পেশ করে। সংসদ যে কোন বিষয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যেকোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করে। সরকার যদি তার কর্মকান্ডের মাধ্যমে জনগণের আস্থা হারান কিংবা বিতর্কিত হন তখন সংসদ সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করতে পারেন। অনাস্থা প্রস্তাবে সরকার হেরে গেলে সরকারের পতন ঘটে। সংসদগণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। এছাড়াও সংসদীয় রীতি অনুযায়ী আরও অনেক প্রক্রিয়া আছে যার মাধ্যমে সরকারের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যায়। জাতীয় সংসদ সম্পর্কে সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে '৬৫(১) - জাতীয় সংসদ নামে বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকিবে এবং এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়ন- ক্ষমতা সংসাদের উপর ন্যস্ত হইবে ঃ তবে শর্ত থাকে যে, সংসদের আইন-দ্বারা যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন বা আইনগত কার্যকর্তা সম্পন্ন অন্যান্য চুক্তিপত্র প্রণয়নের ক্ষমতার্পণ হইতে এই দফায় কোন কিছুই সংবিধানকে নিবৃত করিবে না।'[২০] আবার সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ৭(১) জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে। সুতরাং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে সংসদ সদস্যগণ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন সংবিধান অনুযায়ী উল্লেখিত দায়িত্ব প্রাপ্ত।

সংসদীয় গণতন্ত্রের একটি অপরিহার্য অংশ বিরোধী দল। সংসদীয় গণতন্ত্র সাফল্যের জন্য শক্তিশালী বিরোধী দল অপরিহার্য। ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) জয়লাভ করে সংবিধান অনুযায়ী

Dhaka University Institutional Repository

শপথ বাক্য পাঠ করে সংবিধান ও জনগণের রক্ষক হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। খালেদা জিয়ার সরকার প্রথমে রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থাধীনে সরকার গঠন করলেও ৬ মাসের মধ্যে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন করায় জাতীয় সংসদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সরকার গঠন করলেও বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ একটি শক্তিশালী বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এছাড়াও জাতীয় পার্টি এবং জামায়াতে ইসলামী ও বিরোধী দলের কার্যকরী ভূমিকা পালন করার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। খালেদা জিয়ার শাসনামলে দুইটি সংসদ কার্যকরী ছিল। পঞ্চম জাতীয় সংসদ এবং ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ। পঞ্চম জাতীয় সংসদকে কেন্দ্র করেই খালেদা জিয়ার শাসনকাল আবর্তিত ছিল। তাই পঞ্চম জাতীয় সংসদ বাংলাদেশের ইতিহাসে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ দীর্ঘদিন দেশ এক দলীয় ও সামরিক শাসনাধীনে শাসিত হওয়ার পর পঞ্চম সংসদকে ঘিরে বাংলাদেশের জনগণ গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের স্বপ্ন দেখে। বাংলাদেশের ইতিহাসে পঞ্চম জাতীয় সংসদের মেয়াদ ছিল দীর্ঘতম। ২২টি অধিবেশনে এই সংসদ ৪০০ কার্যদিবসে সংসদের কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বিল এই সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। এই সংসদ কর্তৃক সংবিধানের একাদশ ও ঐতিহাসিক দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাশ করা হয়েছে। পঞ্চম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের অধিকাংশ সময় অনুপস্থিতির কারণে সংসদীয় গণতন্ত্র পরিপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে এক বিরাট অন্তরায় ছিল। এছাড়াও ১৯৯৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর বিরোধী দলের ১৪৭ জন সংসদ সদস্য পদত্যাগ করেন। স্পিকার সাংবিধানিক ক্ষমতা বলে পদত্যাগ পত্র গ্রহণ না করলে ও একাদিক্রমে ৯০ দিন অনুপস্থিতির কারণে বিরোধী দলের ১৪৭ জন সংসদের আসন শূন্য হলে ৫ম জাতীয় সংসদ একদলীয় সংসদে পরিণত হয়। যা ছিল সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য হুমকি স্বরূপ। সংসদে উপস্থিত থেকে সরকারের ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেয়া এবং সমালোচনা করা বিরোধী দলের মুখ্য দায়িত্ব। কিন্তু পঞ্চম জাতীয় সংসদে বিরোধী দল অনুপস্থিত থেকে তাদের সেই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতায় পরিচয় দিয়েছেন।

খালেদা জিয়ার সরকারের পরিচালিত বিতর্কিত ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে কম সময় কার্যকরী ছিল। ১টি অধিবেশনে ৪টি কর্ম দিবসের মধ্যে এই সংসদের মেয়াদ সমাপ্ত হলে এই সংসদ কর্তৃক বহু প্রতীক্ষিত ও কাঙ্খিত সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাশ করা হয়। কাজেই ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ স্বল্প স্থায়ী হলেও রাজনৈতিক দিক দিয়ে কম গুরুত্ব বহন করে না।

Dhaka University Institutional Repository

স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন ঃ

৫ এপ্রিল (১৯৯১) পঞ্চম জাতীয় সংসদের উদ্বোধনী অধিবেশন ৪র্থ জতীয় সংসদের স্পিকার জনাব শামসুল হুদা চৌধুরীর সভাপতিত্বে শুরু হয়। প্রাক্তন স্পিকারের একমাত্র দায়িত্ব পরবর্তী স্পিকারের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর। স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পঞ্চম জাতীয় সংসদের কার্যক্রম শুরু হয়। পঞ্চম জাতীয় সংসদের বিজয়ী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল স্পিকার পদে এ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান বিশ্বাস এবং ডেপুটি স্পিকার পদে এ্যাডভোকেট শেখ রাজ্জাক আলীর নাম প্রস্তাব করেন। বাংলাদেশের সংসদীয় রীতি ও ঐতিহ্য অনুযায়ী স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার সর্ব সম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন। কিন্তু পূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশে বিরোধী দল তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে আওয়ামী লীগ স্পিকার পদে জনাব সালাহউদ্দিন ইউসুফ এবং ডেপুটি স্পিকার পদে এ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামানের নাম প্রস্তাব করেন। ফলে নির্বাচন অনিবার্য হয়ে পড়ে। এর ফলে স্পিকার পদে আব্দুর রহমান বিশ্বাস এবং ডেপুটি স্পিকার পদে এ্যাডভোকেট শেখ রাজ্জাক আলী নির্বাচিত হন। বিএনপির পক্ষে বিএনপি প্রার্থী ছাড়াও জামায়াতে ইসলামীর ২০ জন সদস্য, তিনজন স্বতন্ত্র সদস্য, ওয়ার্কাস পার্টির পক্ষে রাশদে খান মেনন, এনডিপির সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও জাসদের শাহজাহান সিরাজ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পক্ষে আওয়ামী লীগ এবং ৮ দল ভূক্ত অন্যান্য শরীক দল সমর্থন প্রদান করেন। তবে ৮ দল ভূক্ত সুরঞ্জিত সেন গুপ্তও জাতীয় পার্টি ভোট দানে বিরত থাকে। সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের পর স্পিকার আব্দুর রহমান বিশ্বাস রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে ডেপুটি স্পিকার শেখ রাজ্জাক আলী স্পিকার নির্বাচিত হন এবং ডেপুটি স্পিকার পদে সংসদ হুমায়ুন খান পন্নী নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় পর্যায়ে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন সংসদের সর্ব সম্মতিক্রমে সম্পন্ন হয়। যা ছিল গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও রীতি নীতির প্রতিশ্রদ্ধা প্রদর্শন।

জাতীয় সংসদের অধিবেশনের অন্যান্য পরিসংখ্যান ঃ

ইতোপূর্বে বলা হয়েছে পঞ্চম জাতীয় সংসদ বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘতম সংসদ। ১৯৯১ সালের ৫ এপ্রিল সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় এবং ৪ বছর ৭ মাস ২০ দিন পর ১৯৯৫ সালের ২৪ নভেম্বর বিলুপ্তি ঘোষণা পর্যন্ত উক্ত সময়ে ২২টি অধিবেশনের ৪০০টি কর্ম দিবস কার্যকরী ছিল। এরপর দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ ৩ বছরে ৮টি অধিবেশনে ২০৬টি কার্য দিবস এবং প্রথম জাতীয় সংসদ তার মেয়াদে ৭টি অধিবেশনে ১৬৮টি কার্যদিবস ও ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ ১টি অধিবেশনে ৪টি কর্ম

Dhaka University Institutional Repository

দিবসে মিলিত হয়েছে। বর্তমান সপ্তম জাতীয় সংসদ ১৯৯৯ পর্যন্ত সারে তিন বছরে ১৫টি অধিবেশনে ২৬৭টি কর্ম দিবস মিলিত হয়েছে। (সারণি ৪.৪ দ্রষ্টব্য)

সারণিঃ ৪.৪

প্রথম থেকে সপ্তম (১৯৯৯ পর্যন্ত) জাতীয় সংসদের কার্যাবলীর সারাংশ

জাতীয় সংসদ	সংসদ উদ্বোধন	সংসদ বাতিল	মোট অধিবেশন	মোট কার্যদিবস	মোট বিল পাশ
প্রথম	৭ এপ্রিল ১৯৭৩	৬ নভেম্বর ১৯৭৫	৮টি	১৩৪	১৫৪
দ্বিতীয়	২ এপ্রিল ১৯৭৯	২৪ মার্চ ১৯৮২	৮টি	২০৬	৬৫
তৃতীয়	১০ জুলাই ১৯৮৬	৬ ডিসেম্বর ১৯৮৭	৪টি	১৬৮	১৪২
চতুর্থ	২৫ এপ্রিল ১৯৮৮	৬ ডিসেম্বর ১৯৯০	৭টি	১৬৮	১৪২
পঞ্চম	৫ এপ্রিল ১৯৯১	২৪ নভেম্বর ১৯৯৪	২২টি	৪০০	১৭৩
ষষ্ঠ	১৯ মার্চ ১৯৯৬	৩০ মার্চ ১৯৯৬	১টি	৪	১
সপ্তম	১৪ জুলাই ১৯৯৬	১৩ জুলাই ২০০১	১৫*	২৬৭*	৯৩*

সূত্রঃ জাতীয় সংসদ সচিবালয় ও খালেদা হাবিব, বাংলাদেশ নির্বাচন, জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রিসভা, ১৯৭০-৯১, ঢাকা ঃ প্রকাশক এ আর মুরশেদ, ১৯৯১।

* সপ্তম জাতীয় সংসদের ১৯৯৯ পর্যন্ত প্রথম ১৫টি অধিবেশনের পরিসংখ্যান দেয়া হল।

Dhaka University Institutional Repository

সারণিঃ ৪.৫

পঞ্চম জাতীয় সংসদের অধিবেশন, সময়, উপস্থিতি, উত্থাপিত ও পাসকৃত বিলের সংখ্যা দেখান হলঃ

অধিবেশন	অধিবেশন কাল	অধিবেশন দিবস সংখ্যা	অধিবেশন মোট ঘন্টা	অধিবেশন গড় উপস্থিতি	সংসদে উত্থাপিত সরকারি বিল	সংসদে উত্থাপিত বেসরকারি বিল	সংসদ কর্তৃক পাসকৃত বিল
প্রথম	৫ এপ্রিল থেকে ১৫মে ১৯৯১	২২	১৪০.৪৮	২৫৭.৩	৩০টি	১২টি	১৮
দ্বিতীয়	১১ জুন থেকে ১৪ আগস্ট	৪৩	২৪৬.৫৮	২৫৯.২০	১১	০৭	১০
তৃতীয়	১২ অক্টোবর থেকে ৫ নভেম্বর, ১৯৯১	১৪	৭০.৩১	২৩৪.০২	১২	০৪	০৪
চতুর্থ	৪ জানুয়ারি খেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২	২৭	১৪৭.৩৬	২২২.২১	১৬	০৬	১৮
পঞ্চম	১২এপ্রিল থেকে ১৯ এপ্রিল ১৯৯২	৬	৩৩.০৭	২৩৫.৬৭	০১	০৩	-
ষষ্ঠ	১৮ জুন থেকে ১৩ আগস্ট, ১৯৯২	৪১	২৬৩.১৪	২২৯.৭৬	২৯	০৮	১৮
সপ্তম	১১ অক্টোবর থেকে ১৬ নভেম্বর ১৯৯২	২০	৮৯.৩২	১৯১.২	১৫	০৮	১৮
*অষ্টম	৩ জানুয়ারি থেকে ১১ মার্চ, ১৯৯৩	৩২	১৩৩.৩১	২০১.২৯	১০	০৯	১২*-
নবম	৯ মে থেকে ১৩মে ১৯৯৩	৫	২৫.৪৯	২৩২.০১	০৬	০৮	-
দশম	৬ জুন থেকে ১৫ জুলাই ১৯৯৩	৩১	১৯৮.২৯	২২১.১৭	০৭	০১	০৯
একাদশ	১২ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩	১২	৬৭.৫৭	২২০.৫	০৫	০৮	০৬
দ্বাদশ	২২ নভেম্বর থেকে ৮ ডিসেম্বর ১৯৯৩	১৪	৬৭.৪৭	২০১.৫	০৫	০৪	০৭

Dhaka University Institutional Repository

ত্রয়োদশ	৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ৭মার্চ ১৯৯৪	১৯	৬৩.০৮	১৭৩.৬৮	০৭	০২	০২
চতুর্থদশ	৪ মে থেকে ১২মে ১৯৯৪	৬	২০.৪৯	১৪২.৬৭	০৩	০১	০৬
পঞ্চদশ	৬ জুন থেকে ১১ জুলাই ১৯৯৪	২৫	৭১.১৩	১১৯.১২	০৯	-	০৭
ষষ্ঠদশ	৩০ আগষ্ট থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪	১০	১৮.০৩	১১১.১	০১	-	০৪
সপ্তদশ	১২ নভেম্বর থেকে ৮ ডিসেম্বর ১৯৯৪	২১	৩৯.২৭	১০৮	০৬		০৭
অষ্টাদশ	২৩ জানুয়ারি থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫	১৮	৩২.৩৭	১০৮	১২	-	০৯
উনিশতম	২৪এপ্রিল থেকে ২৭ এপ্রিল ১৯৯৫	৪	১২.০০	১২৯.৭৫	০২	-	০১
বিশ তম	১৫ জুন থেকে ১১ জুলাই ১৯৯৫	১৭	৬২.৪৬	১২৪.০৫	০৯	-	০৮
একুশ তম	৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫	১০	২৯.৫১	১০৯.৪০	০৫	-	০৮
বাইশ তম	১৫ নভেম্বর থেকে ১৮ নভেম্বর ১৯৯৫	৩	৫.২৭	১৩১.৬৬	০২	-	০১
২২টি	মোট	৪০০	১৮৩৬.০০	১৮০.১৫	২০৩	৮১	১৭৩

সূত্রঃ পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে বাইশতম অধিবেশনের (১৯৯১-১৯৯৫) কার্যবাহের সারাংশ, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

* অষ্টম অধিবেশনে পাসকৃত ১২টি বিলের মধ্যে সংসদ কর্তৃক গৃহীত একমাত্র বেসরকারি বিলটি ছিল।

সারণি ৪.৫ থেকে দেখা যায় যে, পঞ্চম জাতীয় সংসদে ২২টি অধিবেশনে ৪০০টি কর্ম দিবসে মোট ১৮৩৬ ঘন্টা অধিবেশনরত ছিল। উক্ত সংসদে সংসদদের গড় উপস্থিতি ছিল ১৮০.১৫জন। পঞ্চম জাতীয় সংসদে বিগত ৬টি সংসদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিল পাস করেছে। ১টি বেসরকারি বিল সহ মোট ১৭৩টি বিল পাস করা হয়েছে। এরপর প্রথম জাতীয় সংসদ কর্তৃক ১৫৪টি বিল চতুর্থ জাতীয়

Dhaka University Institutional Repository

সংসদ কর্তৃক ১৪২টি বিল, দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ ৬৫টি বিল, তৃতীয় জাতীয় সংসদ কর্তৃক ৩৯টি বিল গৃহীত হয়েছে। বর্তমান ৭ম জাতীয় সংসদ ১৫টি অধিবেশনে ৯৩টি বিল পাস করেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে পঞ্চম জাতীয় সংসদ ইতোপূর্বেকার সংসদ থেকে কার্যক্রমের দিক থেকে শীর্ষে ছিল। তবে বাংলাদেশের ইতিহাসে কোন সংসদই তার মেয়াদ পূর্ণ করতে পারে নাই। পঞ্চম জাতীয় সংসদ মেয়াদ পূর্ণ না করতে পারলেও মেয়াদের কাছাকাছি গিয়েছিল। মেয়াদ পূর্তির মাত্র ৪ মাস ১০ দিন পূর্বেই এই সংসদের অবসান ঘটে। তা সত্ত্বেও ৫ম জাতীয় সংসদই মেয়াদ পূর্তির কাছাকাছি গিয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে।

আইন প্রণয়ন ঃ

আইন প্রণয়নের দিক থেকে পঞ্চম জাতীয় সংসদ খুবই গুরুত্ব বহন করে। সংবিধানের ২টি সংশোধনী বিলসহ মোট ১৭৩ টি বিল পঞ্চম জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়। এর মধ্যে ১৭২টি সরকারি বিল এবং ১টি মাত্র বেসরকারি বিল। পঞ্চম জাতীয় সংসদে ২০৩টি সরকারি বিল এবং ৮১টি বেসরকারি বিল উত্থাপিত হয় (সারণি ৪.৬ দ্রষ্টব্য) একমাত্র সরকারি বিল " The Members of Parliament (Remuneration and Allowances) (Amendment) Bill, 1993টি সংসদের অষ্টম অধিবেশন কর্তৃক ৪ মার্চ (১৯৯৩) সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ১০ মার্চ (১৯৯৩) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতি লাভের পর ১৯৯৩ সালের ১১নং আইনে পরিণত হয়। সংবিধান সংশোধন বিল ব্যতীত অন্যান্য যে সমস্ত আইন প্রণয়ন করা হয় এর মধ্যে সন্ত্রাস মুলক অপরাধ দমন আইন উল্লেখযোগ্য।

১৯৯২ সালের ৪৫নং আইন হিসেবে উক্ত বিলটি ১ নভেম্বর (১৯৯২) জাতীয় সংসদ কর্তৃক বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে গৃহীত হয় এবং ৬ নভেম্বর রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে আইনে পরিণত হয়। এই আইনটি মাত্র ২ বছরের জন্য কার্যকরী করা হয়েছিল। এতে বলা হয়েছিল, সংসদ বিলটির মেয়াদ না বাড়ালে আগামী দুই বছর পর আইনের কার্যকারিতা থাকবে না এবং ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে ট্রাইবুনাল বা হাইকোর্ট ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিতে পারে।[২১] বিরোধী দল সন্ত্রাসমুলক অপরাধ দমন আইনের কঠোর সমালোচনা করেন এবং ব্যক্ত করেন দেশের প্রচলিত আইনেই সন্ত্রাস দমন সম্ভব। বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা সন্ত্রাস দমন প্রসঙ্গে বলেছিলেন, আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকতো এবং আমার হুকুম যদি পালিত হতো তা হলে ১ ঘণ্টার মধ্যে সন্ত্রাস দমন করতে পারতাম।[২২] অথচ তৎকালীন বিরোধী দল ক্ষমতা গ্রহণের পর সন্ত্রাস দমন আইনকে শুধু গ্রহণই করে নাই এই আইনকে

Dhaka University Institutional Repository

আরও কঠোর করে স্থায়ী প্রয়োগের ব্যবস্থা করেছে। বিএনপি সরকার সন্ত্রাসমুলক অপরাধ দমন আইনের মেয়াদ দুই বছর পর আর মেয়াদ বৃদ্ধি করে নাই। যদিও বাংলাদেশের সন্ত্রাস দমনের জন্য এই আইনের প্রয়োজনীয়তা ছিল। আজকের কাগজ ১৯ নভেম্বর ১৯৯২ সংখ্যায় সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমন আইনের দুই বছরের কার্যকারিতা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। উক্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, সন্ত্রাসমুলক অপরাধ দমন আইনে দু'বছরে দেশে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ১৪১৫টি, এর মধ্যে চার্জশীট হয়েছে ১১২৪টি, বিচার সম্পন্ন হয়েছে ৭০১টি এর মধ্যে সাজা পেয়েছে ৩০৯টি মামলায়, খালাস পায় ৩৯২টি মামলায়। এছাড়া ফাইনাল রিপোর্ট দাখিল করা হয় ২০০ টি মামলার এবং তদন্তাধীন থাকে ৯১ টি মামলা। রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয় যে, এ আইনের মামলায় তদন্ত শেষে চার্জশীটের হার ৮০% এর বেশি এবং সাজার হার ৪৪% এর বেশি যা প্রচলিত আইনের চেয়ে অনেক বেশি।[২৩] কাজেই উক্ত আইনটি কার্যকর থাকলে প্রচলিত আইনের চেয়ে অধিক হারে মামলা নিস্পত্তি করা যেত। উপকূলীয় এলাকার জলদস্যুদের তৎপড়তা নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯৯৪ সালে " কোষ্ট গার্ড বিল, ১৯৯৪" পাস করা হয়। এর ফলে উপকূলীয় এলাকায় নিরাপত্তা রক্ষাসহ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত হয়েছে। যদিও এই আইনটি বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে করা হয়েছে।

গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য নির্বাচন একটি অপরিহার্য মাধ্যম। নির্বাচন পরিচালনা করে থাকে নির্বাচন কমিশন। তাই নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী করার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্বাচন কমিশন শক্তিশালীকরণ সংক্রান্ত " The Representation of the people (Amendment) Bill 1994" (নির্বাচন কমিশন সংক্রান্ত গণপ্রতিনিধি সংশোধন বিল) পাস করা হয়। ৩০ নভেম্বর (১৯৯৪) বিলটি জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ১২ ডিসেম্বর (১৯৯৪) রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভের পর ১৯৯৪ সালের ২৩ নং আইন হিসেবে আইনে পরিণত হয়। এই বিলের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে আরো শক্তিশালী করে তার স্বতন্ত্র মর্যাদা দেয়া হয়েছে। উক্ত বিলে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার জন্য একজন করে রিটার্নিং অফিসার যা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক মনোনীত থাকবেন। বিলে বলা হয়েছে, সকল নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী সরাসরি নির্বাচন কমিশনের অধীনস্ত থাকবেন। নির্বাচন কমিশন যে কোনো নির্বাচন কর্মকর্তাকে বদলী সাসপেন্ড করতে পারবেন। বিলে ভোট দেয়ার জন্য ভোটারদের পরিচয়পত্রের কথা বলা হয়েছে, যা ভোটার তালিকা বিলের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। বিলে যে কোন পর্যায়ে নির্বাচন বাতিলের ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনকে দেয়া হয়েছে। তৎকালীন আইন মন্ত্রী এই বিল সম্পর্কে বলেন, "এই বিল গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ

Dhaka University Institutional Repository

দেবে। জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিত হবে। ভোট কারচুপি, জাল ভোটের আর কোনো সুযোগ এর ফলে আর হবে না।" বস্তুতঃ এই বিল পাসের ফলে কারচুপি মুক্ত নির্বাচনের পথ প্রশস্থ হয়। ৪ ডিসেম্বর (১৯৯৪) জাতীয় সংসদ আর একটি বিল "The Election Polls (Amendment) Bill, 1994" এর মাধ্যমে প্রত্যেক ভোটারের জন্য পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা করার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনকে অর্পণ করা হয়েছে। এই দুইটি বিল পাস করার ফলে বাংলাদেশের গণতন্ত্র উত্তরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। কিন্তু পরবর্তী ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের পূর্বে ভোটারদের পরিচয়পত্রের ব্যবস্থার রহিত করা হয়। পরিচয়পত্র বিহীন ভোট ব্যবস্থায় নির্বাচন কারচুপি মুক্ত করা কঠিন ব্যাপার। তবুও নির্বাচন কমিশন শক্তিশালীকরণ বিলটি বর্তমানে বলবৎ থাকায় নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন মহলের দাবি পূরণ হয়েছে। উল্লেখিত আইনসমূহ ছাড়াও জাতীয় সংসদ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বেশ কিছু আইনের সংশোধনী আনয়ন করেন। যেমন- রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার (সংশোধন) বিল, "The Local Government (Union Parishads) (Second Amendment Bill, The Pourashava (Second Amendment) Bill, The Local Government (Upzila Parished and Upazila Administration Reorgranisation) (Repeal) Bill, এছাড়াও ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন (সংশোধন) বিলসমূহ পাসের মাধ্যমে স্থানীয় সংস্থাসমূহকে অধিকতর গতিশীল করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদিও উপজেলা প্রশাসনিক পুর্নগঠন বিলের মাধ্যমে উপজেলা ব্যবস্থা রহিত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৭ খালেদা জিয়া সরকার শাসন কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যাসমূহ ঃ

স্বৈরাচার মুক্ত পরিবেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত খালেদা জিয়া সরকার ক্ষমতায় আরোহণের পর শাসন কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহবুদ্দিন আহমেদের অধীনে মন্ত্রী সভা গঠনের পর প্রথমেই সংকট দেখা দেয় সরকার পদ্ধতি প্রশ্নে। খালেদা জিয়া সময়ে দাবি ও গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে জনস্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা কায়েম করে গণতন্ত্রের নব যাত্রা শুরু করেছিলেন। এরপর যে সমস্যার সম্মুখীন হন, তা হল ঃ-

ক) সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব ঃ

খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে গঠিত সংসদীয় ব্যবস্থাধীনে গণতান্ত্রিক সরকার দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র এক বছরের মধ্যেই বিরোধী দল কর্তৃক এ সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। যদিও একটি সরকারের সাফল্য ব্যর্থতা মূল্যায়নের জন্য এক বছর কোন সময়ই নয়। তার উপর এ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এরশাদ সরকারের দীর্ঘ নয় বছরের স্বৈরশাসনের অবসানের পর। তবুও ১৯৯২ সালের ৫ আগস্টের জাতীয় সংসদ সচিবালয় সংসদের কার্য প্রণালী বিধির ১৫৯ ধারার উপ বিধি (৩) অনুসারে মন্ত্রী সভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা করে নোটিশ প্রদান করেন। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগ নেতা ও সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা জনাব আব্দুস সামাদ আজাদ, জাসদ (সিরাজ) এর জনাব শাহজাহান সিরাজ, ওয়ার্কার্স পার্টির জনাব রাশেদ খান মেনন, সিপিবির জনাব সামসুদ্দোহা, জাতীয় পার্টির জনাব মনিরুল হক চৌধুরী এবং গণতন্ত্রী পার্টির জনাব সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত নিজ নিজ দলের পক্ষ থেকে অনাস্থা প্রস্তাব দেন। ন্যাপের পক্ষ থেকে ও একটি অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেয়া হয়। অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশে বলা হয়েছে যে, দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। সরকার সে পরিস্থিতির যথোপযুক্ত মোকাবিলা করে জনগণের জান মালের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। সরকার শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস নিরোধ ও ছাত্র ছাত্রী এমন কি শিশু কিশোরদের নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে। দেশের ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প প্রতিষ্ঠান চাঁদাবাজ মাস্তানদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। সরকার অর্থনৈতিক জীবনে সৃষ্ট নৈরাজ্য দূর করতে ব্যর্থ হয়েছে। সরকারের দলীয়করণ নীতির পরিণতিতে শিল্পাঞ্চল ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন হাইজাক, টার্মিনাল দখল, কলোনী দখলের ফলে শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। সরকার শিল্পাঞ্চলে শান্তি রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। সরকার সাংবাদিক ও সংবাদপত্র কর্মচারীদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। সরকার স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী তৎপরতা প্রতিরোধে

Dhaka University Institutional Repository

ব্যর্থ হয়েছে। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে। সে অঞ্চলে মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে। সরকার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিজ দেশে ফিরিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়েছে। এ পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে সংগঠিত সশস্ত্র তৎপরতা ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপের ঘটনা প্রতিরোধেও সরকার ব্যর্থ হয়েছে। সরকার বিদেশী দূতাবাসেরও নিরাপত্তা বিধানে ও ব্যর্থ হয়েছে। সে কারণে বিদেশেও দেশের ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে।[২৪] সরকারের বিরুদ্ধে আনীত বিরোধী দলের এ অনাস্থা প্রস্তাব ৯ আগষ্ট (১৯৯২) জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয়। বিরোধী দল কর্তৃক ইতোপূর্বে দাখিলকৃত ৭টি নোটিশের বক্তব্য ও ভাষা এক ও অভিন্ন হওয়ায় মাননীয় স্পিকার জনাব শেখ রাজ্জাক আলী নোটিশ দাতাদের সঙ্গে আলোচনা করে একটি নোটিশ গ্রহণ করেন। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা জনাব আব্দুস সামাদ আজাদ কার্যপ্রণালী বিধির ১৫৯ (৪) অনুযায়ী এ অনাস্থা উত্থাপন করেন। সরকারের বিরুদ্ধে আনীত এ অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন সম্পর্কে মাননীয় স্পিকার জনাব শেখ রাজ্জাক আলী বলেছেন, "নব প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে একে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান এবং সুসংহত করার স্বার্থে এবং সর্বোপরি জনগণের মানসিকতাকে গণতান্ত্রিক চেতনা বোধে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে অনাস্থা প্রস্তাবটি গৃহীত হল" [২৫] ১২ আগষ্ট (১৯৯১) বিরোধী দলের উত্থাপিত অনাস্থা প্রস্তাবের উপর আলোচনা ও ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। অনাস্থা প্রস্তাবের উপর সরকারি দলের ৩০ জন এবং বিরোধী দলের ২৩ জন সংসদে বক্তব্য রাখেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "প্রতিটি ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য, গণতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে বাংলার মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য আমরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলাম। কিন্তু এক বছর যেতে না যেতেই রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারের অযোগ্যতা, অদক্ষতা, দলীয়করণ এবং সন্ত্রাস এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে গিয়ে যেন জনগণের কাছে আমরা আমাদের স্থান হারিয়ে ফেলেছি। জনগণ আমাদেরও দোষারোপ করতে শুরু করেছে।" অনাস্থা প্রস্তাবের উপর সমাপনী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিরোধী দলের অভিযোগের উত্তরে যে বক্তব্য রাখেন তার উল্লেখযোগ্য অংশ হল "গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য সর্বপ্রকার প্রক্রিয়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল শুরু করেছে এবং ভবিষ্যতেও তারা সেই প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবে।"

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পর বিভক্তি ভোটের মাধ্যমে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অনাস্থা প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। বিভক্তি ভোটে প্রস্তাবের পক্ষে গড়ে ১২২টি ভোট এবং বিপক্ষে পড়ে ১৬৮টি ভোট। জামায়াত ভোট দানে বিরত থাকে। "ভোট গ্রহণ কালে জাতীয় পার্টির ৪ জন, ইসলামী ঐক্য

Dhaka University Institutional Repository

জোটের ১ জন, এনডিপির ১ জন, আওয়ামী লীগের ৫ জন এবং ২ জন স্বতন্ত্র সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও আওয়ামী লীগের দু'জন সংসদ সদস্য ইন্তেকাল করায় তাদের আসন শূণ্য ছিল। বিএনপি ব্যারিস্টার জিয়াউর রহমান দেশের বাইরে থাকায় এবং শেখ রাজ্জাক আলী স্পিকার পদে থাকায় ভোট দেননি।" [২৬] সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় থাকায় বিরোধী দলের এ অনাস্থা প্রস্তাবের ফলে বিএনপি সরকারের পতন বা সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যহত হয়নি। গণতন্ত্র মানেই সংখ্যাগরিষ্টের শাসন। মূলত সরকারকে সতর্ক করার জন্যই বিরোধী দলের এ অনাস্থা প্রস্তাব। তবে সংসদীয় গণতন্ত্রের স্থিতিশীলতার জন্য সরকারের কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণের জন্য আরও কিছু বেশী সময় দেয়ার প্রয়োজন ছিল। তবুও সরকার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াই বিরোধী দলের অনাস্থা প্রস্তাব মোকাবেলা করেন যা গণতন্ত্রের ভিতকে শক্তিশালী করেছে। জয় হয়েছে গণতন্ত্রের।

খ) নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা বাস্তবায়নের আন্দোলন ঃ

খালেদা জিয়ার শাসনামলে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেও সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিপূর্ণ স্বাদ জনগণ ভোগ করতে পারেনি। কেননা জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের অনুপস্থিতি ও সংসদ বয়কটের কারণে সরকারের শেষের দুই বছরে এক দলীয় নিষ্প্রাণ সংসদীয় ব্যবস্থায় পরিণত হয়। সরকার বিরোধী ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলনের কারণে দেশে বিরাজ করে চরম রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা যা কেবলমাত্র সংসদীয় গণতন্ত্র নয়, গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের পথে ছিল ব্যাপক বাধা স্বরূপ। সংসদীয় গণতন্ত্রে সফলতার জন্য সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে যে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশের প্রয়োজন ছিল তা সম্পূর্ণই অনুপস্থিত ছিল। জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের অনুপস্থিতির কারণে জনগণের আশা আকাঙ্খা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। সরকার ও বিরোধী দলের অনৈক্যের কারণেই বিরোধী দল কর্তৃক ১ বছরের মধ্যেই অনাস্থা প্রস্তাব আহুত হয়েছিল। সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় থাকায় অনাস্থা প্রস্তাবে সরকার পতনের মত কোন ঘটনা ঘটেনি। তবে অনাস্থা প্রস্তাবের পর সরকার ও বিরোধী দলের ব্যবধান আরও বৃদ্ধি পায়।

১৯৯৪ সালের ১ মার্চ থেকে বিরোধী দল হেবরনে মুসলমানদের হত্যাযজ্ঞের ব্যাপারে বিএনপি'র তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে বিরোধী দল প্রথমে সংসদ থেকে ওয়াকআউট করে। পরে এ ওয়াকআউট লাগাতার সংসদ বর্জনে পরিণত হয়। মাগুরা উপনির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি ও ভোট ডাকাতির অভিযোগ এবং মাগুরা-২ আসনের ফলাফল বাতিল ও পুনঃনির্বাচনের দাবিতে বিরোধী দলের লাগাতার সংসদ বয়কট দীর্ঘস্থায়ী বয়কটে রূপ নেয়। মাগুরা নির্বাচনের পর বিরোধী দল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিটি জোরালোভাবে উত্থাপন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে বিপক্ষে ব্যাপক যুক্তি উত্থাপিত হয়। বিরোধী দল সংবিধান সংশোধন করে ভবিষ্যতে সকল জাতীয় নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারে অধীনে অনুষ্ঠানের দাবি জানান। তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে কেন্দ্র করে দেশে চরম রাজনৈতিক সংকট বিরাজ করে। সরকার ও বিরোধী দলের এ সংকট নিরসনের জন্য বেশ কয়েকটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সংসদ উপনেতা ও স্পিকারের উদ্যোগ ব্যর্থতার পর কমনওয়েলথ মহাসচিবের আগ্রহে কমনওয়েলথ বিশেষ দূত স্যার ষ্টিফেন নিনিয়ানের মধ্যস্থার সংকট নিরসনের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু নিনিয়ানের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। রাজনৈতিক সংকটের মুখে ১৯৯৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর বিরোধী দলের ১৪৭ জন সংসদ সদস্য পদত্যাগ করেন। যার ফলে সংসদীয় গণতন্ত্র গভীর সংকটে নিপতিত হয়। বিরোধী দল সংসদ বয়কট ও গণপদত্যাগের পাশাপাশি দেশে হরতাল এবং ধর্মঘটের মাধ্যমে রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনের ফলে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করতে থাকে। স্পিকার শেখ রাজ্জাক আলী বিরোধী দলের সংসদ থেকে 'গণপদত্যাগ' সংবিধান সম্মত না হওয়ায় পদত্যাগ পত্রসমূহ গ্রহণ করেনি। তবে বিরোধী দল রাজপথে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে অর্থনৈতিক অগ্রগতি দারুনভাবে ব্যহত হয়। ইতোমধ্যে সংবিধান অনুযায়ী বিরোধী দলের সংসদ বয়কট একাদিক্রমে ৯০ দিন অতিবাহিত হলে বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের সদস্যপদ বাতিল হবে কি না এ সাংবিধানিক প্রশ্নে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টে রেফারেন্সের জন্য পাঠান। সুপ্রিমকোর্ট রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সের জবাব দেন। সুপ্রীমকোর্টের উপদেশমূলক বক্তব্যের (জবাবের) পর স্পিকার সাংবিধানিকভাবে যাদের অনুপস্থিতিকাল একাদিক্রমে ৯০ দিন অতিবাহিত হয়েছে তাদের সদস্যপদ বাতিল ঘোষণা করেন। ফলে জাতীয় সংসদে একমাত্র সরকারি দল বিএনপি ছাড়া আর কোন দলের প্রতিনিধি ছিল না। বিরোধী দলের মধ্যে সমঝোতার প্রশ্নে কুটনৈতিক মহল সহ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের প্রচেষ্টা চলে, স্পিকারও উদ্যোগ গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রীর মধ্যে বেশকিছু পত্র বিনিময়ও হয় কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতির কোন উন্নতি ঘটেনি। বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের আসন শূন্য হওয়ার পর সংবিধান অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে উপনির্বাচনের প্রয়োজন দেখা দেয়। নির্বাচন কমিশন প্রথমে দৈবদূর্বিপাকের কারণে উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়সীমা আরও ৯০ দিন বর্ধিত করেন। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মধ্যেও সরকারের সময়সীমা শেষ পর্যায়ে চলে আসে। উপনির্বাচনের পরিবর্তে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সমঝোতার প্রশ্নে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা সত্ত্বেও কোন ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বিরোধী দল সংবিধান বহির্ভূত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে অনড় থাকে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বারবার তত্ত্বাবধায়ক সরকার অসাংবিধানিক বলে এ দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করেন। তবে সরকারি

Dhaka University Institutional Repository

দল সাংবিধানিক কাঠামোয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের ব্যাপারে বেশ কয়েকটি ফর্মুলা পেশ করেন। বিরোধী দলও তাদের ফর্মুলা পেশ করেন। সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে মতপার্থক্য খুব বেশি না থাকা সত্ত্বেও কোন সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। উপনির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক সংকট সমাধানের অনেক চেষ্টা নেয়া হয়নি। কিন্তু কোন প্রচেষ্টাই সফল হয়নি। এদিকে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতায় উপনির্বাচনের আয়োজন করা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতি ২৪ নভেম্বর (১৯৯৫) প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ অনুযায়ী পঞ্চম জাতীয় সংসদের মেয়াদ পূর্তির পূর্বেই অবসান ঘটান। এরপর সরকার অর্থবহ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে বিরোধী দলের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন কিন্তু বিরোধী দল নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তির তত্ত্বাবধায়নে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে অনড় থাকেন। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া পূর্বেই ঘোষণা করেছিলেন বিরোধী দল সমঝোতায় পৌঁছলে এবং নির্বাচনে রাজী হলে তিনি নির্বাচনের ১ মাস পূর্বে পদত্যাগ করবেন। রাজনৈতিক সমস্যা-সমাধানের প্রচেষ্টার সাথে সাথে সময় দ্রুত অতিবাহিত হতে থাকে। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতায় ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ এর মধ্যে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিরোধী দলের অংশগ্রহণের সকল উদ্যোগ ব্যহত হলে অবশেষে সরকার ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করেন ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬। বিরোধী দল এই নির্বাচন প্রতিহত করার চেষ্টা করে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া একটি অর্থবহ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। বিরোধী দল কর্তৃক ঘোষিত গণকার্ফুর মধ্যে সরকারর কিছু আসন বাকী রেখে বাকী আসনে নির্বাচন সম্পন্ন করেন। যদিও এই নির্বাচনকে ঘিরে আইন শৃংঙ্খলার ব্যাপক অবনতির আশংকায় জনগণের আশা আকাংখা ছিল খুবই কম। নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ৩ মার্চ (১৯৯৬) জাতির উদ্দেশ্য প্রদত্ত এক ভাষণে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদের একমাত্র কাজ সংবিধান সংশোধন এবং ভবিষ্যতে সুষ্ঠু নির্বাচনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার ইঙ্গিত দান করেন। এ প্রেক্ষিতে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ কর্তৃক সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাসের মধ্যে দিয়ে বিরোধী দলের দীর্ঘ দুই বছরের লাগাতার আন্দোলন ও রাজনৈতিক কর্মসূচির অবসান ঘটে।

গ) বিরোধী দলের সংসদ বয়কট ঃ

সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রর্বতনের পর ১৯৯৪ সালের ১ মার্চ পর্যন্ত সংসদীয় কার্যক্রম মোটামুটি ভালভাবেই চলছিলো। ইতোপূর্বে জাতীয় সংসদের ১২টি অধিবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশন সমূহে সরকার এবং বিরোধী দলের মধ্যে কেবলমাত্র একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাশের সময়ই সমঝোতা হয়েছিল। অন্যান্য সময় সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে যে সমস্ত মতানৈক্য সৃষ্ট হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

তা খুব বেশি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ইতোপূর্বে বিরোধী দল সংসদ থেকে অনেকবার ওয়াকআউট করেছে তবে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। অবশ্য সংসদে ৭ম অধিবেশনে সরকারি দল কর্তৃক সন্ত্রাস দমন আইন পাশের প্রতিবাদে বিরোধী দল সংসদ বর্জন করেছিল এবং সংসদের ৭ম অধিবেশনের বাকী দিনগুলিতে আর সংসদে ফিরে আসে নাই। ১৯৯৪ সালের ১ মার্চ জাতীয় সংসদের ত্রয়োদশতম অধিবেশনে ক্ষমতাসীন বিএনপি দলীয় সংসদ ও তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বিরোধী দল ওয়াকআউট করে। বিরোধী দলের এই ওয়াকআউট পরবর্তীতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য সংসদ বর্জনে রূপ নেয়। ঐ দিন জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের সাংসদ আবুল হাসান চৌধুরী বৈধতার প্রশ্নে আলোচনার সূত্রপাত করে বলেন, 'হেবরনে' নামাজরত অবস্থায় গুলি করে ৫২ জন ফিলিস্থিনী মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে অথচ সরকার কিংবা পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় কথা বলেছে না।"[২৭] এর উত্তরে সংসদ উপনেতা ডাঃ এ, কিউ, এম, বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন, "সংসদে শোক প্রস্তাব নেয়া হয়েছে। সরকারের সর্বোচ্চ মহল থেকে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, "ফিলিস্থিনীদের বর্বরোচিত হত্যাকান্ড নিয়ে আলোচনায় সরকারি দলের আপত্তি নেই।"[২৮] কিন্তু সংসদে সংসদীয় পরিবেশের বিঘ্ন ঘটে সরকার দলীয় সদস্য তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার বিরোধী দলের সদস্যদের উদ্দেশ্য ছুড়ে দেয়া একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে। ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা সংসদে বলেন, ফিলিস্থিনীদের দুঃখে বিরোধী দলের মায়াকান্না দেখে মনে হচ্ছে তারা হঠাৎ খুব বেশি মুসমলমান হয়ে যাচ্ছেন।[২৯] ব্যারিস্টার হুদার এ মন্তব্যে বিরোধী দলের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সকল বিরোধী দলের সদস্যরা এক যোগে দাড়িয়ে তথ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদ জানান। আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী, গণতন্ত্রী পার্টি, ওয়ার্কাস পার্টি, ইসলামী ঐক্যজোট ও গণফোরামের সংসদ সদস্যগণ বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তথ্যমন্ত্রীর বক্তব্য প্রত্যাহার ও নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনার দাবিতে ওয়াকআউট করেন। ওয়াকআউট শেষে সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা এক প্রেস ব্রিফিং এ বলেছেন, "ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত করে ও ধর্মকে কটাক্ষ করে সংসদে বক্তব্য রাখার জন্য তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদাকে সংসদে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে এবং সম্পূর্ণ বক্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে। ধর্ম সম্পর্কে ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তির জন্য তাকে সমগ্র জাতির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।" [৩০] একই দিন সংসদ মুলতবীর পর এক প্রেস ব্রিফিং এ সংসদ উপনেতা ডাঃ এ,কিউ,এম,বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন, "তথ্য মন্ত্রী ইতিমধ্যেই হাউজে তাঁর বক্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন আমি নিজেও দু'বার দাড়িয়ে তার দুঃখ প্রকাশের কথা উল্লেখ করেছি। সেই সঙ্গে আপত্তিকর অংশ কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেয়া হলেও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, জাতীয় দৈনিক সমূহ ও বিভিন্ন প্রকাশনায় প্রকাশিত হয়েছে তার থেকে বাদ দেয়া সম্ভব হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়টি নিয়ে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। ৬ মার্চ (১৯৯৪) তথ্যমন্ত্রী সংসদে এক বিবৃতিতে বলেন, "আবার ও দুঃখ প্রকাশ করছি, বক্তব্য প্রত্যাহার করেছি।"[৩১] পক্ষান্তরে বিরোধী দলের চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম সম্মিলিত বিরোধী দলের এক বৈঠক শেষে প্রেস ব্রিফিং এ জানিয়ে দেন, সংসদে দাঁড়িয়ে তথ্যমন্ত্রী নিঃশর্ত ক্ষমা না চাইলে তারা (বিরোধী দল) অধিবেশনে যোগদান করবেন না। এরপর বিরোধী দল সংসদের ত্রয়োদশতম অধিবেশনে আর ফিরে আসেনি।

ঘ) মাগুরা উপনির্বাচন ও রাজনৈতিক জটিলতা ঃ

২০ মার্চ (১৯৯৪) জাতীয় সংসদের মাগুরা ২ আসনের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ আসাদুজ্জামানের মৃত্যুতে উক্ত আসন শূন্য হয়। ২০ মার্চ অনুষ্ঠিত উক্ত নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী জনাব কাজী সলিমুল হক ৭৩ হাজার ২শ ৪৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। নিকটতম প্রার্থী আওয়ামী লীগের শরীফুজ্জামান বাচ্চু পেয়েছেন ৩৯ হাজার ৬শ ভোট। উক্ত নির্বাচনে মোট ১০২টি কেন্দ্রের মধ্যে ৯৯টি কেন্দ্রে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তিনটি কেন্দ্র নির্বাচনী সহিংসতায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। উক্ত তিনটি কেন্দ্রের মোট ভোটের চেয়ে বিএনপি প্রার্থীর ভোটের ব্যবধান বেশী হওয়ায় বিএনপি প্রার্থী জনাব কাজী সলিমুল হককে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ পরস্পরের বিরুদ্ধে হামলা, ভোট কেন্দ্র দখল, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, প্রহার, অগ্নিসংযোগ ভোট ডাকাতি প্রভৃতি অভিযোগ আনা হয়। নির্বাচনে যেহেতু বিএনপি জয়লাভ করেছে সেহেতু আওয়ামী লীগ সহ বিরোধী দলসমূহ বিএনপির বিরুদ্ধে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ উত্থাপন করেন। বিরোধী দল এ নির্বাচনী ফলাফল প্রত্যাখান করে। ২১ মার্চ (১৯৯৪) মাগুরা পূর্ণ দিবস এবং ২৩ মার্চ দেশব্যাপী অর্ধ দিবস হরতাল কর্মসূচি পালন করে। আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা ২০ মার্চ (১৯৯৪) এক সংবাদ সম্মেলনে ফলাফল বাতিলের দাবি জানিয়ে বলেন, "বিএনপি সরকার গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে। ভোটের অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। তাই আমরা সরকারের পদত্যাগ দাবি করেছি।" তিনি আরও বলেন " বিএনপি'র অধীনে কোন নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হতে পারে না, বিএনপি নিজেরাই তা প্রমাণ করেছে।"[৩২]

ঙ) সংসদ থেকে রাজপথে বিরোধী দলঃ

১ মার্চ ১৯৯৪ ইং থেকে বিএনপির তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বিরোধী দলের সংসদ বয়কট স্থায়ী রূপ নেয় মাগুরায় উপনির্বাচনে সরকারি দলের বিরুদ্ধে কারচুপির অভিযোগে। সংসদ উপনির্বাচনের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে বিরোধীদল সংসদ বয়কটের

Dhaka University Institutional Repository

পাশাপাশি হরতাল ধর্মঘট অবরোধ কর্মসূচি অব্যাহত রাখে। ৭ এপ্রিল (১৯৯৪) মাগুরা উপনির্বাচনের ফলাফল বাতিল, পুনর্নির্বাচন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আওয়ামী লীগের ডাকে সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালন শেষে সংবাদ সম্মেলনে শেখ হাসিনা বলেন, বিএনপি সরকার গণতন্ত্রের ভাষাকে বুলেটের মাধ্যমে কেড়ে নিতে চায়।"[৩৩]

বিরোধী দল ৫ম জাতীয় সংসদের ত্রয়োদশতম অধিবেশন থেকে বয়কট করেন। সংসদের চতুর্থতম অধিবেশনে যোগ দেয়ার প্রশ্নে ২০ এপ্রিল (১৯৯৪) বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলের বৈঠকে সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে যোগ দেয়ার মত পরিবেশ তৈরী হয়নি বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয় এবং সংসদ অধিবেশনে যোগ না দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩ মে (১৯৯৪) আওয়ামী লীগের বিশেষ বর্ধিত সভা ও সংসদীয় দলের বৈঠকেও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি না মানা পর্যন্ত সংসদে না যাওয়ার অভিমত ব্যক্ত করা হয়। ৪ মে ৯৪ জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশনের প্রথম দিবসে সংসদ নেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিরোধী দলের উদ্দেশ্য বলেন, " আন্দোলনের বন্ধুরা আসুন, সংসদেই সব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করি"। তিনি আরও বলেন, " সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রাণ কেন্দ্র জাতীয় সংসদ। রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রে মতভেদ থাকা স্বাভাবিক। জাতীয় ক্ষেত্রে সমস্যাও রয়েছে অনেক। এসব নিয়ে সংসদে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান বের করতে হবে।"[৩৪] কিন্তু বিরোধী দল তাদের দাবিতে অনড় থেকে চতুর্দশ অধিবেশনের কোন বৈঠকেই যোগ দেয়নি। এমনকি পরবর্তীতে ৫ম জাতীয় সংসদের কোন অধিবেশনেই যোগ দেয়নি। জাতীয় সংসদের পঞ্চদশ অধিবেশনেই ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরের বাজেট পেশ করা হয়। বিরোধী দল বাজেট অধিবেশনেও অনুপস্থিত ছিল।

বিরোধী দলের বাজেট অধিবেশনে যোগদান না করা প্রসঙ্গে গণযোগাযোগ সম্পর্কিত বেসরকারি সংস্থা সেন্টার ফর সাসটেইনেবল ডেভলপমেন্ট (সিএফএসডি) জাতীয় সংসদে পেশকৃত ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছরের বাজেট অধিবেশনে বিরোধী দলের উপস্থিতি সম্পর্কে জনগণের প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়ে ১১-১২ জুন (১৯৯৪) এক জনমত জরিপ চালায়। জরীপে দেখা যায়, " ঢাকা মহানগরীর শতকরা ৮৬.৫ ভাগ মানুষ মনে করেন জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে বিরোধী দলের উপস্থিত থাকা উচিত ছিল। বাকী শতকরা ১৩.৩ ভাগ মনে করেন সংসদে অনুপস্থিত থেকে বিরোধী দল সঠিক কাজ করেছেন।"[৩৫]

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী দলের লাগাতার সংসদ বয়কট সম্পর্কে প্রখ্যাত আইনজ্ঞ এবং রাজনীতিবিদ ডঃ কামাল হোসেন বলেন, " Prolonged boycott of parliament sessions could by no means help resolve the political crisis facing both part in power and opposition [৩৬] বিরোধী দলকে জাতীয় সংসদে ফিরিয়ে আনতে সরকারি তরফ থেকে প্রধানমন্ত্রীর আহবান ছাড়াও সংসদ উপনেতা, স্পিকার এবং কুটনৈতিক পর্যায়ে থেকেও ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বিরোধী দল শেষ পর্যন্ত পঞ্চম জাতীয় সংসদে আর ফিরে আসেনি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে তারা সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং রাজপথে সরকার বিরোধী আন্দোলনে অবতীর্ণ হন।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৮ খালেদা জিয়ার শাসনামলে হরতাল - একটি বিশ্লেষণ ঃ

খালেদা জিয়ার শাসনামলে অধিকাংশ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজমান ছিল। এ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার অন্যতম কারণ ছিল হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ ও অসহযোগ আন্দোলন। যা ছিল ঐ সময়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ। কারণ রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা বজায় থাকা একান্ত অপরিহার্য। কেননা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার উপর অর্থনৈতিক উন্নয়নও নির্ভর করে। হরতাল ধর্মঘটের ফলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড স্থবির হয়ে পড়ে এবং একই সাথে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটায়। যদিও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় হরতাল ধর্মঘট একটি মৌলিক অধিকার। কিন্তু বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে হরতাল ধর্মঘট ব্যাপক মাত্রায় পালিত হওয়ায় এ বিষয়টির উপর বিভিন্ন মহলে ব্যাপক আলোচ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। রাজনৈতিক বক্তৃতায় ও পত্র-পত্রিকায় বলা হয়ে থাকে যে বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে ১৭৩ দিন হরতাল পালিত হয়েছে।

১৯৯৬ সালে বিরোধী দল দাবি আদায়ে অসহযোগ কর্মসূচি পালন করেছিল। খালেদা জিয়ার শাসনামলের শেষ দিনগুলিতে ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে একটানা ২৪ দিন পর্যন্ত অসহযোগ কর্মসূচি পালন করেছিলো। উক্ত সময়ে বাংলাদেশে রেকর্ড পরিমাণ হরতাল অবরোধ, অসহযোগ কর্মসূচি ও ধর্মঘট পালন করা হয়েছে। খালেদা জিয়ার শাসনামলে হরতাল অবরোধ ও অসহযোগ আন্দেলন পালন করা হয়েছে ২০৬ দিন এবং অর্থনৈতিক কর্মসূচিতে বা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এমন ধর্মঘট পালিত হয়েছে ৪৯ দিন। উক্ত সময়ে ৮ (আট) ঘন্টার হরতাল থেকে শুরু করে ৯৬ ঘন্টার হরতাল পর্যন্ত পালিত হয়েছে। পরপর ৭দিন হরতাল পালিত হয়েছে। ৯৬ ঘন্টার হরতাল প্রসঙ্গে ডঃ কামাল হোসেন আজকের কাগজের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, "৯৬ ঘন্টা হরতালের বদলে ৯৬ ঘন্টা সংলাপ চাই। সমস্ত জাতি চায়।"[৩৭] তৎকালীন হরতাল প্রসঙ্গে ডঃ আহম্মদ শরীফ বলেছিলেন, " হরতাল এ জনসাধারণের স্বার্থের কোন বিষয় জড়িত নেই। ক্ষতির বিষয়টি জড়িত। তৎকালীন রাজনৈতিক সংকট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "দেশে রাজনৈতিক সংকট দেখছি না। একজন গদির কথা ভাবছেন অন্যজন ক্ষমতায় টিকে থাকার কথা ভাবছেন। এর মধ্যে জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন বিষয় নেই।" [৩৮] হরতাল ও ধর্মঘটের মধ্যে যে ব্যবহারিক পার্থক্য রয়েছে। তার ওপর ভিত্তি করে হরতালের পর্যায় ভূক্ত অন্যান্য কর্মসূচি অর্থাৎ অবরোধ এবং অসহযোগ আন্দোলনকে হরতাল এর অন্তর্ভূক্ত করে বিশ্লেষণ করা হল। ধর্মঘট যেহেতু বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণি দাবি আদায়ের লক্ষ্যে পালন করে থাকে তাই ধর্মঘট সম্পর্কে পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

সারণিঃ ৪.৬

১৯৯১-১৯৯৬ পর্যন্ত সময়ে পালিত হরতালঃ অবরোধ ও অসহযোগ আন্দোলনের পরিসংখ্যান।

সাল	হরতাল	অবরোধ	অসহযোগ আন্দোলন	মোট
১৯৯১	৬	৩	-	৯
১৯৯২	১১	-	-	১১
১৯৯৩	১৪	১	-	১৫
১৯৯৪	২৯	৩	-	৩২
১৯৯৫	৬৮	১৭	-	৮৫
১৯৯৬	২৬	১	২৭	৫৪
১৯৯১-১৯৯৬	১৫৪	২৫	২৭	২০৬

সারণিঃ ৪.৬ এর পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৯১-১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশে মোট হরতাল, অবরোধ ও অসহযোগ আন্দোলন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে ২০৬ দিন। এর মধ্যে হরতাল ১৫৪ দিন, অবরোধ ২৫দিন এবং অসহযোগ আন্দোলন পালন করা হয়েছে ২৭ দিন। উল্লেখ্য উল্লেখিত সময়ে পেশাজীবী সংগঠনের পক্ষ থেকে যে ধর্মঘট পালন করা হয়েছে সে হিসেব এক্ষেত্রে ধরা হয়নি। ধর্মঘট ব্যতীত বিরোধী দল কর্তৃক একটি গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে ২০৬ দিন হরতাল অবরোধ ও অসহযোগ আন্দোলন কর্মসূচি পালন বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রেকর্ড।

467413

সারণি ঃ (৪.৭) থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৯১-১৯৯৬ পর্যন্ত বিভিন্ন কারণে বিরোধী দল যে ২০৬ দিন হরতাল অবরোধ ও অসহযোগ আন্দোলন কর্মসূচি পালন করেছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণ সমূহ চিহ্নিত করে কি কারণে কত দিন হরতাল পালন করা হয়েছিল তা উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত সারণিতে হরতালের প্রধান ১০টি কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল, গোলাম আযমের বিচার, ছাত্র নেতা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের হত্যার প্রতিবাদে, রংপুর, বগুড়া ও সিলেট বিভাগ প্রতিষ্ঠার দাবিতে, এরশাদের মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহার, পাট বস্ত্র ও সুতাকল শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবি, মাগুরা ও মিরপুর উপনির্বাচনে কারচুপির প্রতিবাদে, সার সংকটের কারণে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে এবং সর্বশেষ অন্যান্য কারণ রাখা হয়েছে। অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে, পুলিশি হামলা, মিথ্যামামলা প্রত্যাহার, শেখ হাসিনার প্রাণনাশের চেষ্টার প্রতিবাদ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক ঘটনায় পালিত হরতাল সমূহ। ১৯৯১-১৯৯৬ পর্যন্ত সময়ে হরতাল, অবরোধ ও অসহযোগ আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ সহ একটি পরিসংখ্যান সম্মিলিতভাবে দেয়া হলঃ (সারণিঃ ৪.৭ দ্রষ্টব্য)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

সারণি ঃ ৪.৭

১৯৯১-১৯৯৬ পর্যন্ত হরতাল অবরোধ ও অসহযোগ আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য কারণ সমূহের পরিসংখ্যান।

হরতালের কারণ	ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিলের দাবিতে	গোলাম আযমের বিচারের দাবিতে	ছাত্র নেতা/ রাজনৈতিক নেতা হত্যার প্রতিবাদে	বিভাগ প্রতিষ্ঠার দাবিতে	এরশাদের মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে	পাট বস্ত্র ও সুতাকল শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবিতে	উপনির্বাচনে কারচুপির প্রতিবাদে	সার সংকটের কারণে	তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে	অন্যান্য কারণে	মোট	প্রতিমাসে গড়ে হরতাল
১৯৯১ মার্চ-ডিঃ	-	-	২দিন	-	-	৩দিন	-	-	-	৪দিন	৯দিন	.৯ দিন বা ১দিন প্রায়
১৯৯২	১দিন	৪দিন	১দিন	-	-	-	-	-	-	৫দিন	১১ দিন	.৯২ দিন বা ১দিন প্রায়
১৯৯৩	৩দিন	৩দিন	১দিন	-	-	১দিন	২দিন	-	-	৫দিন	১৫ দিন	১.২৫ দিন
১৯৯৪	১দিন	২দিন	৩দিন	৩দিন	-	-	৪দিন	-	১৩দিন	৬দিন	৩২ দিন	২.৬৭ দিন
১৯৯৫	১দিন	১দিন	১৬দিন	২দিন	২দিন	১০দিন	-	১১দিন	৩৪দিন	৮দিন	৮৫ দিন	৭.০৮ দিন
১৯৯৬ ৩০মার্চ পর্যন্ত	-	-	৫দিন	-	-	-	-	-	৪৫দিন	৪দিন	৫৪ দিন	১৮ দিন
মোট	৬দিন	১০দিন	২৮দিন	৫দিন	২দিন	১৪দিন	০৬দিন	১১দিন	৯২দিন	৩০দিন	২০৬দিন	৩.৪৩ গড়ে মাসে

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্লেষণে দেখা গেছে খালাদা জিয়ার শাসনামলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে কেন্দ্র করে সবচেয়ে বেশি ৯২ দিন হরতাল অবরোধ ও অসহযোগ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অন্যান্য কারণে ৩০ দিন হরতাল হয়েছে। এর কাছাকাছি ২৮ দিন হরতাল হয়েছে ছাত্র নেতাও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের হত্যার প্রতিবাদে। তালিকায় সবচেয়ে কম হরতাল হয়েছে এরশাদের মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে ২দিন। বছর অনুযায়ী বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ১৯৯৫ সালে সবচেয়ে বেশী হরতাল অবরোধ হয়েছে তবে আনুপাতিক হারে সবচেয়ে বেশি হয়েছে ১৯৯৬ সালের তিন মাসে (৩০ মার্চ পর্যন্ত) ৫৪ দিন। অর্থাৎ মাসে গড়ে ১৮ দিন হরতাল অবরোধ হয়েছে। বেগম খালেদা জিয়া সরকারের শেষ মাসে অর্থাৎ ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসের ৯ তারিখ থেকে ২৯ তারিখ পর্যন্ত ২৪দিন অসহযোগ আন্দোলনের ফলে দেশ কার্যতঃ অচল ছিল। সারণিতে দেখা যায় সবচেয়ে কম হরতাল ১৯৯১ সালে। ঐ বছর মার্চ থেকে হরতাল হয়েছে যা মাসে গড়ে প্রায় ১ দিন যা ১৯৯১ সালের থেকেও কম। এরপর হরতালের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৯৯৩ সালে মোট ১৫ দিন হরতাল হয়েছে যা গড়ে মাসে ৮৫ দিন হরতাল হয়েছে যা গড়ে মাসে ৭.০৮ দিন অর্থাৎ ৭ দিনের একটু বেশি। তবে রেকর্ড পরিমাণ হরতাল ও অসহযোগ আন্দোলন হয়েছে ১৯৯৬ সালে। ১৯৯৬ সালের তিন মাসে ৫৪ দিন হরতাল অসহযোগ আন্দোলন পালন করা হয়েছে। যা গড়ে মাসে ১৪৮ দিন। বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে ৫ বছরে অর্থাৎ ৬০ মাসে মোট ২০৬ দিন হরতাল, অবরোধ অসহযোগ আন্দোলন হয়েছে যা গড়ে ৩.৪৩ দিন। অর্থাৎ মাসে সাড়ে তিন দিন হরতাল হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এত বেশি হরতাল কোন সরকারের বিরুদ্ধে পালন করা হয় নাই।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৯ ধর্মঘট ঃ

খালেদা জিয়ার শাসনামলে হরতাল, অবরোধ ও অসহযোগ আন্দোলনের পাশাপাশি বিভিন্ন পেশাজীবী ও সংগঠনের পক্ষ থেকে ব্যাপকভাবে ধর্মঘট কর্মসূচিও পালন করা হয়েছে। হরতাল অবরোধের ন্যায় ধর্মঘটের ফলেও দেশের অর্থনীতির চাকা স্থবির হয়েছে অসংখ্যবার কেবলমাত্র পেশাজীবী ছাড়াও রাজনৈতিক দৃষ্টি কোন থেকেও কখনও কখনও ধর্মঘট পালন করা হয়েছে।

৫১ দিন ধর্মঘট ছাড়াও বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণি আরও অনেক ধর্মঘট পালন করেছে যেমন ৩ জানুয়ারি ১৯৯৪ তারিখে বাংলাদেশ কেমিষ্ট এন্ড ড্রাগ সমিতি তাদের পেশাগত বিভিন্ন দাবিতে ১ দিন দেশব্যাপী ধর্মঘট করেছে। বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন দু'দফায় ১ জানুয়ারি ১৯৯৪ থেকে ২০ জানুয়ারি ১৯৯৪ পর্যন্ত ১০ দিন এবং ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ থেকে ৫মে ১৯৯৪ পর্যন্ত ১৫ দিন সহ মোট ২৫ দিন দেশব্যাপী ধর্মঘট করেছে। বেসরকারি স্কুল কলেজের শিক্ষকরা তাদের বেতনের শতকরা ১০০% সরকার থেকে দেয়ার দাবিতে ২ দফায় ১৯৯২ ও ১৯৯৪ সালে ৯৬ দিন ধর্মঘট পালন করেছে। ১৯৯২ সালের ১৮ জানুয়ারি থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৩৪ দিন এবং ১৯৯৪ সালের ১৮ এপ্রিল থেকে ১৮ জুন পর্যন্ত দেশব্যাপী ৬২ দিন ধর্মঘট পালন করেছে। শুধু ধর্মঘট নয় বেসরকারি স্কুল কলেজের শিক্ষকরা মহা অবস্থান, হরতালসহ আমরণ অনশন কর্মসূচি পালন করেছে। ১৭ জুন ১৯৯৪ বিরোধী দলীয় নেতাদের আহবানে শিক্ষক কর্মচারীরা মহা অবস্থান ও অনশন কর্মসূচি স্থগিত করেন। তালিকা বহির্ভূত উল্লেখিত ধর্মঘটের ফলে সরকারের ওপর রাজনৈতিক চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। যা সরকারের প্রশাসনিক ভিতকে দূর্বল করেছে; আভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১০ ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯৬ ঃ

দেশের সাংবিধানিক ধারা বজায় থাকার লক্ষ্যে পঞ্চম জাতীয় সংসদ বিলুপ্তির পর সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতায় ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ এর মধ্যে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আবশ্যকতা দেখা যায়। ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সকল রাজনৈতিক দল সমূহকে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে সরকারি দলের তরফ থেকে উদ্যোগ নেয়া ছাড়াও কুটনৈতিক পর্যায় থেকেও উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। রাজনৈতিক সংকট সমাধানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ তিন বার পরিবর্তন করা হয়। নির্বাচন কমিশন সর্বপ্রথম ৩ ডিসেম্বর (১৯৯৫) ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন। ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী ১৮ জানুয়ারি ১৯৯৬ ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করেন। মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ নির্ধারণ করেন ১৭ ডিসেম্বর (১৯৯৫)। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পূর্বে নির্বাচন কমিশনের এক ঘোষণায় বলা হয়, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গত ২৪ নভেম্বর ১৯৯৫ দেশের জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার কারণে সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে অর্থাৎ আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ এর মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে এই সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং আগামী জানুয়ারি মাসের শেষার্ধ থেকে পবিত্র রমজান মাস শুরু বিষয়টি বিবেচনায় রেখে নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়সূচি ঘোষণা করেছে।"[৩৯] নির্বাচন কমিশন এই তফসিল ঘোষণা সত্ত্বেও বিরোধী দলসমূহ নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া কোন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না বলে জানান। পক্ষান্তরে তফসিল ঘোষণার পর প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এ,কে,এম সাদেক এবং বিএনপি মহাসচিব ব্যারিস্টার আব্দুস সালাম তালুকদার সকল রাজনৈতিক দলের নির্বাচনে অংশগ্রহণের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বিরোধী দল এই নির্বাচনকে সামনে রেখে ৯ ডিসেম্বর থেকে ৭২ ঘন্টার হরতাল কর্মসূচি পালন করেন। ১৪ ডিসেম্বর (১৯৯৫) বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "That she was ready to open a dialogue with Begum Khaleda only after her resignation from the position of Prime Ministers" [৪০] ১৫ ডিসেম্বর (১৯৯৫) নির্বাচন কমিশন চলমান রাজনৈতিক সংকট সমাধান ও ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর বৈঠক আহবান করেন। উক্ত বৈঠকে প্রধান প্রধান বিরোধী দলসমূহ অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে। বৈঠকে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামায়াত বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ও জাসদ (রব) এর অনুপস্থিতিতে বিএনপি সহ ৬০টি রাজনৈতিক দলের ৮৬ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে অংশগ্রহণকারী দল সমূহের অনুরোধের প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের তারিখ পুনঃনির্ধারণ করেন। সংশোধিত তফসিল অনুযায়ী ৭ ফেব্রুয়ারি (১৯৯৬) দ্বিতীয় বারের মত নির্বাচন অনুষ্ঠানের

Dhaka University Institutional Repository

তারিখ নির্ধারণ করেন। কিন্তু বিরোধী দল তাদের দাবিতে অটল থেকে নির্বাচন অংশগ্রহণের পরিবর্তে নির্বাচন প্রতিহত করার কথা বলেন। সেই লক্ষ্যে দ্বিতীয়বার নির্ধারিত নির্বাচনের তফসিল মোতাবেক নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় ৩ ও ৪ জানুয়ারি (১৯৯৬) ৪৮ ঘণ্টা হরতাল আহবান করেন। ফলে নির্বাচন কমিশন মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ সময় নির্ধারণ করেন ৮ জানুয়ারি (১৯৯৬) নির্বাচন কমিশন সর্বশেষ তৃতীয় বারের মত নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করে ১৫ ফেব্রুয়ারি (১৯৯৬) নির্ধারণ করেন। নির্বাচনের পরিবর্তিত তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ নির্ধারণ করা হয় ১৭ জানুয়ারি (১৯৯৬)। সরকারি দলের পক্ষ থেকে এই নির্বাচনকে কেবলমাত্র সংবিধান রক্ষার জন্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়। যেহেতু সংবিধান অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে যে কোন কারণে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলে একদিকে যেমন সরকারের বৈধতা হারাবে অপর দিকে দেশ এক মহা সাংবিধানিক বিপর্যয়ে পতিত হবে। বিরোধী দলসমূহ নির্বাচন প্রতিহত করার জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলের দিন (১৭ জানুয়ারি) সকাল সন্ধ্যা হরতাল আহবান করেন। নির্বাচন কমিশন সর্বশেষ তফসিল ঘোষণা করে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে নির্বাচন কমিশনকে অবশ্যই জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার ৯০ দিন (২১শে ফেব্রুয়ারি ৯৬) এর মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হবে। যেহেতু ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই শহীদ দিবস, ঈদুল-ফিতর, শবে-ই-কদর, এবং জমাতুলবিদা ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠান রয়েছে। সেহেতু ১৫ ফেব্রুয়ারির পর কোন অবস্থাতেই নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়, তাই ১৫ ফেব্রুয়ারি ৯৬ ভোট গ্রহণের চূড়ান্ত দিন ধার্য্য করে এই সংশোধিত সময়সূচি ঘোষণা করা হয়।" [৪১] কাজেই নির্বাচন কমিশনের এ বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক নির্বাচনের তারিখ আর পরিবর্তন করা সম্ভব নয় এবং ঘোষিত তারিখেই নির্বাচন হতে হবে।

নির্বাচনের তফসিলকে সামনে রেখে মনোনয়নপত্র দাখিলের ১ দিন পূর্বে ১৬ জানুয়ারি (১৯৯৬) সরকার এবং বিরোধী দলের সংকট সমাধানের সর্বশেষ প্রচেষ্টা হিসেবে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড এন মেকিল, যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার পিটার জে ফাউলার, জাপানের ইয়শিকাজু কেনিকো, কানাডার জন জেস্কট, অষ্ট্রেলিয়ার এম পিনাল ও ইটালির ডঃ রাফেন মিনিরো এই ৬ জন কূটনৈতিক সমঝোতার লক্ষ্যে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা এবং প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে বৈঠক করেন কিন্তু এতে বিরোধী দল প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ ব্যতীত নির্বাচনে যেতে অস্বীকার করেন। সরকারি দলের পক্ষ থেকে সংবিধানের আওতায় সর্বোচ্চ ছাড় দিতে প্রস্তুত ছিলো। বিরোধী দলের দাবি পূরণ বিএনপির পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিরোধী দলের দাবি পূরণ করতে হলে আনুষ্ঠানিকতা হলেও ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন করতে হবে। কারণ এত অল্প সময়ের মধ্যে সাংবিধানিকভাবে তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

সরকার গঠন কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে গণফোরাম নেতা পঙ্কজ ভট্টাচার্য বলেছেন, "জনগণকে আস্থায় না এনে আওয়ামী লীগের বর্তমান আন্দোলনে জনগণ ক্ষুব্ধ। সর্বস্তরের জনগণ তাদের কার্যকলাপে হতাশ এতে রাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি জনগণ আস্থা হারিয়ে ফেলছে। এই আস্থাহীনতা নেতৃত্ব ও গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর রাজনৈতিক দলের এই ভুলের জন্য ষড়যন্ত্রকারীরা সুযোগ পায়"। তিনি আরও বলেন, "সরকার পতনের বক্তব্য সংসদীয় পদ্ধতির ভাষ্য নয়।"[৪২]

মনোনয়নপত্র দাখিল ও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঃ

নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিলের দিন ১৭ জানুয়ারি (১৯৯৬) প্রধান প্রধান বিরোধী দল সমূহের নির্বাচন বয়কটের মুখে সরকারী দল বিএনপি সহ ৪১ টি রাজনৈতিক দল ও জোট এবং নির্দলীয় প্রার্থীর পক্ষ থেকে মোট ১৯৮৭ জন মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। এরমধ্য থেকে ১০৮ জনের মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষ দিনে ৩৬৫ জন মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের পর চূড়ান্তভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা দাড়ায় ১৫১৪ জন। এর মধ্যে ৪৭ টি আসনে একক প্রার্থী থাকায় ৪৭ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৪৭ জনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া একটি আসনসহ দলের শীর্ষ স্থানীয় অধিকাংশ নেতা রয়েছে। নির্বাচন কমিশন ২৭ জানুয়ারি (১৯৯৬) বিএনপির মোর্শেদ খান বারিস্টার নাজমুল হুদা ও বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী আব্দুল মান্নানকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করেন। এনিয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার নির্বাচিত সংসদদেও সংখ্যা দাড়ায় ৫০ জন। ফলে ২৫০ টি আসনে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রয়োজন দেখা দেয়। মনোনয়ন পত্র জমা দেয়ার শেষে ১৭ জানুয়ারি বাসসকে দেয়া এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান বলেন, "সরকার একক নির্বাচনের মাধ্যমে দেশকে আরও গভীর সংটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তারা জনমত উপেক্ষা করে নীল নকশা অনুযায়ী এক দলীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে কাজ করেছে। এই এক দলীয় নির্বাচনে অংশ নেয়ার জন্য জনগণ ভোট কেন্দ্রে যাবে না।" [৪৩]

২৩ জানুয়ারি (১৯৯৬) জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া এক রেডিও টিভি ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, "গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক ধারা অক্ষুন্ন রাখার জন্যই বিএনপি এ নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন।" প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে, দেশবাসী ও সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি দেশ, গণতন্ত্র ও জনগণের স্বার্থে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনুরোধ জানান। তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, "এ নির্বাচন গণতন্ত্র রক্ষার নির্বাচন।" [৪৪]

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী লীগ নেত্রী এক বিবৃতিতে বিরোধী দল সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে মিথ্যাচার বলে আখ্যায়িত করেন। শেখ হাসিনা তার বিবৃতিতে আরও বলেন, "সকল বিরোধী দলকে বাইরে রেখে সপরিবারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর স্বঘোষিত খুনী ও সংবিধান হত্যাকারীদের এবং বহু খুনের দাগি আসামীদের নিয়ে নির্বাচনের নামে প্রহসন করে প্রধানমন্ত্রী গণতন্ত্র হত্যার যে ষড়যন্ত্র করেছেন তাতে দেশবাসীর নিকট তাঁর স্বৈরাচারী চেহারা উন্মোচিত হয়েছে।"[৪৫]

২০ জানুয়ারি (১৯৯৬) আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী পৃথক পৃথক চিঠিতে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন স্থগিত বা বাতিলের দাবি জানিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে যে চিঠি দিয়েছিলেন, ২৮ জানুয়ারি প্রধান নির্বাচন কমিশনার তার উত্তরে বলেছেন, নির্বাচন বাতিল বা স্থগিত সম্ভব নয় বলে যে সমস্ত কারণ উল্লেখ করেছেন তা হল "একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা লংঘন করতে পারে না। ১৯৯৫ সালের ২৪ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি পঞ্চম জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়ায় সংবিধান অনুযায়ী আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ বেঁধে দেয়া সময় সীমার মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হচ্ছে। নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে নির্বাচন না হলে দেশের যেকোন নাগরিক কোন রাজনৈতিক দলের কর্মীও যদি কমিশনের বিরুদ্ধে সংবিধান লংঘনের দায়ে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে মামলা দায়ের করেন, তাহলে কমিশনের আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন আইনী সুযোগ থাকবে না। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলে দেশে সাংবিধানিক সংকট দেখা দেবে। সুতরাং বিষয়টি বিরোধী দলের কাছে যত অনভিপ্রেতই হোক না কেন কমিশন অপরিহার্যভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাধ্য। কমিশন কোনভাবেই দেশের সংবিধান এবং অন্যান্য আইন ও বিধি লংঘন করতে পারে না। যদি সব দল নির্বাচনে অংশ না নেয় সে জন্য নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করা বাঞ্ছনীয় নয়।"[৪৬] কাজেই সাংবিধানিক কারণেই বিরোধী দল সমূহের বাধাদান সত্ত্বেও ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন করতে হচ্ছে।

৬ ফেব্রুয়ারি (১৯৯৬) বিএনপি ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দলীয় মেনিফেস্টো ঘোষণা করেন। উক্ত মেনিফেস্টোর দলীয় কর্মসূচি ছাড়াও ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক কারণ উল্লেখ করে বলা হয়, "নিয়মতান্ত্রিকভাবে গঠিত গণতান্ত্রিক সরকার রাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী চলতে বাধ্য। যেকোন পরিস্থিতিতেই সংবিধান লংঘন করা কোন সরকার কিংবা নাগরিকের পক্ষে সম্ভব নয়, উচিতও নয়। সাংবিধানিক শাসন ও গণতন্ত্র পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব উভয়কেই ধ্বংস করে। কাজেই গণতন্ত্রের স্বার্থে সাংবিধানিক

Dhaka University Institutional Repository

শাসন অব্যাহত রাখতে হবে এবং সাংবিধানিক শাসন অব্যাহত রাখতে হলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করতেই হবে। নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত জাতীয় সংসদই শুধু প্রয়োজনে সংবিধানের সংশোধন করতে পারে। নির্বাচন বর্জন কিংবা নির্বাচনের বিরোধীতার মাধ্যমে সমস্যাকে জিইয়ে রাখা যায় জটিলতর করা যায়, কিন্তু যে সমস্যার সমাধানের জন্য সংবিধান প্রয়োজন তেমন কোন সমস্যার সমাধা করা যায় না।"[৪৭] উক্ত মেনিফেস্টোতে বিএনপি পরবর্তী সংবিধান সংশোধনীর পরোক্ষ ইঙ্গিত দিয়েছেন।

১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের পূর্বে ১২ ফেব্রুয়ারি (১৯৯৬) প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতির উদ্দেশ্যে রেডিও-টিভিতে দেয়া এক নির্বাচনী ভাষণে ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক সংকট সমাধানে তার আগ্রহের কথা পূনর্ব্যক্ত করে বলেন, "বিরোধী দল সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে নির্বাচনে রাজি হয়নি। ভবিষ্যতে নির্বাচনে সব দলের অংশগ্রহণ করার জন্য এই নির্বাচন।" তিনি উক্ত ভাষণে আরও বলেন, "সাংবিধানিক সংকট থেকে দেশকে রক্ষার জন্য এই নির্বাচন করতেই হবে। আলোচনা আগে সফল হয়নি, পরে হতে পারে। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে, যাতে সবাইকে নিয়েই নির্বাচন করা যায়। "প্রধানমন্ত্রী জনগণকে আশ্বস্ত করে বলেন, আপনারা ভোট দিন ধৈর্য্য ধরুন দেখুন আগামী সংসদে কি করতে পারি।" [৪৮] প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্যের মাধ্যমে একথা স্পষ্ট হয়েছে যে ক্ষমতাকে স্থায়ী করতে কিংবা বিরোধী দলকে সংসদের বাইরে রাখতে বিএনপি আগ্রহী নয় বরং ভবিষ্যতে সকল দলকে নিয়ে একটি অর্থবহ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যেই ১৫ ফেব্রুয়ারির এ নির্বাচন।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১১ প্রধানমন্ত্রীর ৩ মার্চের ভাষণ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাসে সম্মতি ঃ

৩ মার্চ (১৯৯৬) প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া এক রেডিও- টিভি ভাষণে বিরোধী দলের দীর্ঘ দিনের দাবি অনুযায়ী ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল উত্থাপন ও পাসের কথা বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের প্রেক্ষিত বর্ণনা করেন এবং ১২ ফেব্রুয়ারি তাঁর ভাষণে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদের মাধ্যমে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টির কথা বলেছিলেন যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে একটি অর্থবহ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা যায়। এ ব্যাপারে তার প্রয়াস ছিল আন্তরিক বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে ইতোপূর্বে রাজনৈতিক সংকট সমাধানের লক্ষ্যে তাঁর গৃহীত পদক্ষেপ সমূহও বর্ণনা করেন। প্রধানমন্ত্রী একটি অর্থবহ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ইচ্ছা ব্যক্ত করে বলেন, " আমি আগেও বলেছি এবং এখনও বলতে চাই যে, দেশের সকল রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিকে নিয়েই আমরা জাতীয় নির্বাচন করতে চেয়েছিলাম এবং আগামীতেও একসাথে নির্বাচন করতে চাই। কিন্তু সংবিধানের বিধান না থাকায় এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য না থাকায় সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য কোন সমাধানে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি। গত ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ গঠিত হওয়ার পর আল্লাহর মেহেরবানীতে আমাদের এই সমস্যা আর থাকবে না। এমতাবস্থায় আমরা এখন থেকেই বিদ্যমান সমস্যার সাংবিধানিক ও বাস্তব সমাধানের উদ্যেগ নিতে পারি। কারণ আমরা সকল সমস্যার দ্রুত ও কার্যকর সমাধানে আন্তরিকভাবেই আগ্রহী।"

প্রধানমন্ত্রী দেশ, জাতি, জনগণ এবং গণতন্ত্রের স্বার্থে ও জটিল সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার গঠনের জন্য দেশবাসী ও সকল রাজনৈতিক দলের কাছে ৩টি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবগুলো হলো ঃ [৪৯]

(১) দেশ ও জনগণের সামগ্রিক স্বার্থ বিবেচনা করে ভবিষ্যতে সকল জাতীয় নির্বাচনকালীন সময়ে নির্দলীয় সরকার গঠন করা হবে। প্রস্তাবিত এই সরকার দৈনন্দিন সরকারি কর্মকান্ড তত্ত্বাবধান করবেন। কোন নতুন নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করার পূর্ণ দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রাপ্ত থাকবেন।

(২) ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে আমরা এ বিষয়ে সংবিধানের প্রাসঙ্গিক সংশোধনী বিল আনবো যত শীঘ্র সম্ভব। এই সংশোধনী অনুযায়ী গণভোটের ব্যবস্থা করা হবে।

(৩) অতঃপর ন্যূনতম সময়ের মধ্যে ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে উক্ত তিনটি প্রস্তাবের ভিত্তিতে খোলামন নিয়ে আলোচনার জন্য সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি আহবান জানান। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সকল দল অংশগ্রহণ করবেন। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের দাবি মেনে নেয়ার মাধ্যমে একদিকে বিরোধী দলের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হওয়া এবং অন্যদিকে ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক ধারা নিরবিচ্ছিন্নভাবে বজায় থাকার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হলো।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১২ রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনোত্তর সমঝোতার উদ্যোগ ঃ

৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর ৩ মার্চ (১৯৯৬) প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ভাষণে নিরপেক্ষ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলসমূহকে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য উপায় খুঁজে বের করার যে প্রস্তাব দেন তাঁর প্রেক্ষিতে বিরোধী দল প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ প্রত্যাখ্যান করে। তারা রাষ্ট্রপতির উদ্যোগে সংলাপের প্রস্তাব করেন। ৪ মার্চ বিরোধী দলসমূহ যৌথ সমাবেশ শেষে এক প্রেস ব্রিফিং এ বলেন যে, এ সরকারের সাথে তারা কোন আলাপ আলোচনা করবেন না তবে রাষ্ট্রপতি যদি উদ্যোগ গ্রহণ করেন তবে আলাপ আলোচনায় বিরোধী দল রাজি আছেন। ৮ মার্চ সরকারি দলের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতিকে উদ্যোগ নেয়ার ইতিবাচক সাড়া দেন। এর প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি ৯ মার্চ রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনার উদ্যোগ নেন। রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে ১০ মার্চ (১৯৯৬) আলোচনার আহবান জানিয়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও তিন জোট নেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ, জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান চৌধুরী, জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, ওয়ার্কাস পার্টির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান মেনন ও এনডিপি নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে চিঠি দেয়া হয়। রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে আলোচনার উদ্যোগ নেয়ার পাশাপাশি বিরোধী দলসমূহ ৯ মার্চ থেকে সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি পালন শুরু করেন। ৯ মার্চ সন্ধ্যায় বিএনপি'র যুগ্ম মহাসচিব সাংবাদিকদের বলেন, আলোচনার মাধ্যমেই রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব। তাই তিনি জনগণের কষ্ট লাঘবের জন্য অসহযোগ কর্মসূচি প্রত্যাহারের জন্য বিরোধী দলের প্রতি আহবান জানান।

রাষ্ট্রপতি বঙ্গভবনে ১০ ও ১১ মার্চ যথাক্রমে বিরোধী দল এবং সরকারি দলের সঙ্গে বৈঠক করেন। ১০ মার্চ বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনাকালে আওয়ামী লীগ সহ তিন দল ইতোপূর্বের পেশকৃত তিনটি দফা পুনরায় রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করেন।

এগুলো হলোঃ-

১. ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাতিল,

২. প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ এবং

৩. নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন।

এছাড়াও ঐ দিন আওয়ামী লীগ নেত্রী দলীয় কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, সংবিধানের ৪৮ ধারায় রেসিডিউয়াল পাওয়ার প্রয়োগ করে ৯৩ ধারায় অর্ডিন্যান্স জারি করে ২৪ ঘন্টার মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করবেন এবং মে মাসের মধ্যে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার জন্য তিনি প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ জানিয়েছেন। রাষ্ট্রপতিকে দেয়া বিরোধী দলের এই সাংবিধানিক পরামর্শ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে ১০ মার্চ বিএনপি'র যুগ্ম মহাসচিব বলে, "অধ্যাদেশ জারি করে সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তন আনার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নেই। এ জন্য সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন দরকার।[৫০]

১১ মার্চ বিএনপি'র চেয়ারপার্সন ও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বৈঠক করেন। উক্ত বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে জানান যে, মে মাসের মধ্যে ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানে তাদের কোন আপত্তি নেই। এর ফলে বিরোধী দলের তিনটি দাবির মধ্যে প্রধান দু'টি দাবি পূরণ হলো। কেবলমাত্র ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ বাতিলের দাবিটি অবশিষ্ট রইলো। রাষ্ট্রপতির পাল্টা প্রশ্ন শেষে, ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ বাতিল করবেন কিনা? সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী পাল্টা প্রশ্ন করে বলেন, "সংসদ বাতিল করলে নির্দলীয় অন্তর্বর্তী সরকার গঠন হবে কি করে ও কিসের মাধ্যমে হবে? সংসদ থাকবে না, তা হলে বিল পাশ করবে কে?"[৫১]

মূলত ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত করে রাজনৈতিক সংকটের সমাধান কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কারণ ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদই একমাত্র রাজনৈতিক সংকটের সমাধান করতে পারে। ১২ মার্চ রাষ্ট্রপতি সমঝোতার প্রচেষ্টা হিসেবে বিএনপিসহ বিরোধী দলসমূহের কাছে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পদ্ধতি ও সম্ভাব্য পদক্ষেপ প্রভৃতি বিষয়ে মতামত দেয়ার জন্য চিঠি পাঠান। এর ১ দিন পর ১৩ মার্চ (১৯৯৬) আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামায়াত ইসলামী, ওয়ার্কাস পার্টি, গণফোরাম ও ইসলামী ঐক্যজোটের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতির চিঠির জবাব দেয়া হয়। তবে তাদের চিঠিতে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পদ্ধতি ও সম্ভাব্য পদক্ষেপ সম্পর্কে কোন রূপরেখা বা মতামত দেয়া হয়নি। রাষ্ট্রপতিকে লেখা আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি এবং জামায়াতে ইসলামীর তিনটি চিঠির ভাষ্য ও বক্তব্য প্রায় একই। উক্ত তিনটি চিঠিতে রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, "আশা করি আপনি ১৫ ফেব্রুয়ারির অবৈধ নির্বাচন বাতিল ও প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ নিশ্চিত করে সংকট সমাধানের দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে মে মাসের মধ্যেই ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করে দেশবাসীকে সংঘাত ও সন্ত্রাসের হাত থেকে রক্ষা করবেন।" [৫২] তিনটি বিরোধী দলের উক্ত চিঠিতে কিভাবে রাষ্ট্রপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করবেন সে সম্পর্কে কোন সুপারিশ দেয়া হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

তবে গণফোরাম নেতা ডঃ কামাল হোসেন তাঁর চিঠিতে তত্ত্বাবধায়ক প্রশ্নে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের পরামর্শ নেয়ার প্রস্তাব করে উল্লেখ করেন, "রেফারেন্সের বিষয় প্রাক্তন প্রধান বিচারপতিদের পরামর্শ সমৃদ্ধ হলে তা সুপ্রিম কোর্টের জন্য সহায়ক হতে পারে।" [৫৩] কিন্তু ডঃ কামাল হোসেনের এ মতামত সংকট সমাধানের সুস্পষ্ট কোন মতামত নয়।

সংকট সমাধানের রাষ্ট্রপতির উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি ১৫ মার্চ (১৯৯৬) একটি বিবৃতিতে বলেন, "সংবিধানের ব্যাপক পর্যালোচনা এবং বিভিন্ন আইন বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামতে দেখা যাচ্ছে যে, প্রেসিডেন্টের সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের বিধান সংযোজনের জন্য সংবিধান সংশোধন এবং পরবর্তীতে গণভোটের প্রয়োজন রয়েছে।"

রাষ্ট্রপতি উক্ত বিবৃতিতে আরও বলেন, "সংশ্লিষ্ট দল সমূহ তাদের নিজ নিজ অবস্থানে আরও নমনীয়তা না দেখালে জাতীয় ঐকমত্যে পৌছানো যাবে না।" [৫৪]

রাষ্ট্রপতির এ বিবৃতিতে তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, "প্রেসিডেন্টের বিবৃতি সংকট সমাধানের পরিবর্তে দেশকে নৈরাজ্য সংঘাত ও সংঘর্ষের দিকে ঠেলে দিচ্ছে প্রেসিডেন্টের বিবৃতি তারই ইঙ্গিত বহন করে।" [৫৫] কার্যতঃ রাজনৈতিক দলসমূহ রাষ্ট্রপতির উদ্যোগে সাড়া না দিয়ে দেশকে সংঘাত ও সংঘর্ষের দিকে ঠেলে দিয়েছে। ফলে রাজনৈতিক সংকট সমাধানে রাষ্ট্রপতির সর্বশেষ উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবাসিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১৩ অসহযোগ আন্দোলনঃ আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিনতি ঃ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট সমাধানের উপায় খুঁজে বের করার জন্য রাষ্ট্রপতির উদ্যোগের পাশাপাশি আন্দোলনরত বিরোধী দলসমূহ ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ বাতিল, বিএনপি সরকারের পদত্যাগ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে ৯ মার্চ (১৯৯৬) থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য অর্থাৎ বিএনপি সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়। ২৯ ফেব্রুয়ারি (১৯৯৬) তিন বিরোধী দল সমূহ এ অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে সকল প্রকার সরকারি বেসরকারি অফিস আদালত, ব্যাংক বীমা বন্ধ রাখা সহ সড়ক, নৌ ও রেলপথে সকল প্রকার যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। দেশের সকল বন্দরও বন্ধ রাখার ঘোষণা দেয়া হয়। অসহযোগ আন্দোলন কেবলমাত্র সকাল ১০টা থেকে রিক্সা চলাচলের কথা বলা হয়। ৯ মার্চ থেকে এ অসহযোগ আন্দোলন কর্মসূচি সফল করার জন্য ব্যাপক বোমাবাজি, গাড়ী ভাংচুর, জালাও পোড়াও সহ হিংসাত্মক তৎপরতার মাধ্যমে আতংক সৃষ্টি করা হয়।

৯ মার্চ থেকে দেশের আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপক অবনতি ঘটে। কার্যতঃ সারাদেশ অচল হয়ে থাকে। ১৭ মার্চ চট্টগ্রাম বন্দরে একটি তেল ভর্তি জাহাজে বোমা নিক্ষেপ করলে সরকার বন্দরের নিয়ন্ত্রনের ভার নৌবাহিনীর হাতে ছেড়ে দেয়। অসহযোগের ফলে পরিবহন ব্যবস্থা অচল থাকায় বন্দর সমূহে আমদানীকৃত পণ্যের স্তুপে পরিণত হয়। ফলে ১৮ মার্চ বেনাপোল স্থল বন্দরে এক অগ্নিকান্ডে ৫০০ কোটি টাকার আমদানি পণ্য পুড়ে যায়। শুধু পণ্য সামগ্রী নয়, "যানবাহন চলাচল সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অচলবস্থা সৃষ্টি করার ফলে গোটা দেশের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।" [৫৬]

২৩ মার্চ থেকে বিরোধী দলের অসহযোগ আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ হয়। ঐ দিন ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফের নেতৃত্বে প্রেস ক্লাবের সম্মুখে স্থাপন করা হয় জনতার মঞ্চ। সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত জনতার মঞ্চে বিরোধী দল অবস্থান ধর্মঘট করে। মেয়র হানিফ জনতার মঞ্চ থেকে ঘোষণা করেন খালেদা জিয়া সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত দিবা রাত্র জনতার মঞ্চে অবস্থান ধর্মঘট চলবে। মেয়র হানিফ নিজেকে ঢাকার একমাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে দাবি করে ঘোষণা করেন, "We do not obey the illegal Prime Minister Begum Khaleda," [৫৭] সিরাজুদ্দিন আহম্মেদ মেয়র হানিফের উদ্ধৃতি দিয়ে আরও উল্লেখ করেন "He urged the army, Bangladesh Rifles, and the Police to join them and the people instead of protecting the illegal Government of Begum Khaleda" [৫৮] ২৪ মার্চ প্রত্যুষে পুলিশ

Dhaka University Institutional Repository

'জনতার মঞ্চ' ভেঙ্গে দিলে জনগণ পুনরায় জনতার মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত করে। ২৪ মার্চ বাংলাদেশ সচিবালয় অফিসার কর্মচারী এক সমাবেশে মিলিত হন। উক্ত সমাবেশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিব ও প্লানিং কমিশনের সদস্য ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর সচিবদের পক্ষে বিরোধী দলের আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণও সমাবেশে যোগদান করেন ও বক্তব্য রাখেন। সমাবেশে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, তাঁরা (সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী) অবৈধ সরকারের অধীনে কোন কাজ করবে না এবং বিএনপি'র মন্ত্রী সভার পদত্যাগ দাবি করেন। ২৭ মার্চের মধ্যে উক্ত দাবি মানা না হলে তাঁরা সরাসরি জনগণের সাথে আন্দোলনে মিলিত হবে। ২৫ মার্চ ২৮ জন সচিব ও উর্ধ্বন আমলা এক যৌথ বিবৃতিতে বিএনপি সরকারের পদত্যাগ দাবি করেন এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবি করেন। ইতোমধ্যে ২৬ মার্চ প্রত্যুষে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদে বহু প্রতীক্ষিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাশ করা হয়।

৩০ মার্চ খালেদা জিয়ার পদত্যাগ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে ৯ মার্চ থেকে লাগাতার অসহযোগ আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১৪ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী ঃ

তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাশ ঃ

বিরোধী দলের অসহযোগ আন্দোলনের পাশাপাশি রাজনৈতিক সংকট সমাধানের উদ্যোগ অব্যাহত থাকে। প্রধানমন্ত্রীর ৩ মার্চের ভাষণের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতির নেয়া উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার পর বিএনপি এককভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাসের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯ মার্চ ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ ভবন ঘেরাও কর্মসূচি ঘোষণা করে। ১৪ মার্চ নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদের মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি মহিলা আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তফসিল ঘোষণা করেন। ১৬ মার্চ বিএনপি দলীয় ৩০জন মহিলা সংসদ সদস্য প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাশের ব্যাপারে বিরোধী দল সরকারকে কোনরূপ সহযোগিতা না করার ফলে এবং অসহযোগ কর্মসূচি অব্যাহত থাকায় সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলের আনুষ্ঠানিকতা দ্রুত সম্পন্ন করতে চাচ্ছে। ১৭ মার্চ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সাংবাদিকদের সঙ্গে বলেছেন "নির্দলীয় সরকারের বিল পাশ করার পর আমি পদত্যাগ করবো।" [৫৯] ১৮ মার্চের মধ্যে জাতীয় সংসদের ৩০২ জন সাংসদ শপথ গ্রহণ করেন। ১৯ মার্চ (১৯৯৬) রাষ্ট্রপতি বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী করে ২৭ সদস্যের মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরুর পূর্বেই নবগঠিত মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরুর পূর্বেই নবগঠিত মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করেন। নতুন মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রী ছাড়া ১৩ জন কেবিনেট মন্ত্রী ১৩জন প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ করে।

১৯ মার্চ ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদের উদ্বোধনী অধিবেশনে সর্বপ্রথমে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন সম্পন্ন হয়। সর্বসম্মতিক্রমে স্পিকার নির্বাচিত হন সাবেক স্পিকার শেখ রাজ্জাক আলী এবং ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন এল,কে সিদ্দিকী। এরপর সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান বিশ্বাস ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। রাষ্ট্রপতি তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, "সাংবিধানিক ধারাকে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে গত ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নির্দলীয় অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধনে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রত্যাশা নিয়ে ৬ষ্ঠ সংসদ তার কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে।" বর্তমান সংসদ নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দলগুলির অংশগ্রহণ না করাকে তিনি পরিতাপের বিষয় হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, "এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে না প্রতিকূলতারও সৃষ্টি হয়েছে। তিনি সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব অপরিসীম বলে উল্লেখ করেন এবং দায়িত্ব পালনে সফলতা কামনা করেন।" [৬০]

Dhaka University Institutional Repository

২০ মার্চ নবগঠিত মন্ত্রিসভা জাতীয় সংসদের সকল সাধারণ জাতীয় নির্বাচন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সংবিধানের কতিপয় সংশোধনীর প্রস্তাব সম্বলিত সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বিলের খসড়া অনুমোদন করেছে। ২১ মার্চ (১৯৯৬) বিতর্কিত ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদে একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ভবিষ্যতের সকল জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান করার জন্য সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী আইন ১৯৯৬ নামে একটি বিল উত্থাপন করা হয়। জাতীয় সংসদে এই বিল উত্থাপিত হলে ঐ দিনই আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীর লিয়াঁজো কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাবিদকদের সঙ্গে বিফ্রিংকালে আওয়ামী লীগ নেতা মোঃ নাসিম বলেন, "অবৈধ সংসদের কোন আইন বা বিধান দেশের জনগণ মানবে না এবং এর দ্বারা বিরাজমান রাজনৈতিক সংকটকে আরও জটিল ও ঘনীভূত করা হবে।" [৬১]

২৬ মার্চ (১৯৯৬) প্রত্যুষে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের দীর্ঘ দিনের দাবিকৃত নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন সম্পর্কিত বিল সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করা হয়। সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধন আইন ১৯৯৬ নামে এ বিলে সুপ্রীম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি কিংবা আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কোন বিচারপতি কিংবা সকল দলের কাছে গ্রহণযোগ্য কোন নির্দলীয় ব্যক্তি প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১৫ খালেদা জিয়ার পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন ঃ

৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাস ও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বিল অনুমোদন লাভের পর বিএনপি সরকারের পদত্যাগ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন সময়ের ব্যাপার হয়ে দাড়ায়। এই বিল পাসের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের সকল বাধা অপসারিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও ৩০ মার্চ (১৯৯৬) 'জনতার মঞ্চ' থেকে সরকারকে পদত্যাগের চূড়ান্ত আলটিমেটাম দেয়া হয়। অপরদিকে একই দিন 'গণতন্ত্র মঞ্চ" থেকে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া বিএনপিকে একমাত্র জাতীয়তাবাদী শক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করেন। বেগম জিয়া উক্ত সমাবেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটের সাংবিধানিক সমাধান করতে পারায় দেশবাসীকে অভিনন্দন জানান এবং উক্ত সমাবেশ থেকে তিনি পদত্যাগের ঘোষনা দেন। অবশ্য ইতোপূর্বে ২৯ মার্চ রাতে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের সাথে সাক্ষাৎ করে যথাশীঘ্র সম্ভব নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধক্রমে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের সর্বশেষে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্বভার গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। বিচারপতি হাবিবুর রহমান রাষ্ট্রপতির আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

এর ফলে ৩০ মার্চ (১৯৯৬) রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশক্রমে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নয়া পল্টনে গণতন্ত্র মঞ্চের জনসভা থেকে বঙ্গভবনে এসে পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। বেগম খালেদা জিয়ার পদত্যাগ পত্র গৃহীত হওয়ার পর পরই রাষ্ট্রপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে সাবেক প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমানকে শপথ পড়ান। বিচারপতি হাবিবুর রহমানের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের সাথে সাথে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম বারের মত সাংবিধানিকভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হল।

খালেদা জিয়ার পদত্যাগ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন প্রসঙ্গে জনতার মঞ্চের রুপকারও ঢাকার মেয়র মোঃ হানিফ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, "This victory is not a victory of any Party, nor of any individual, this victory is the victory of the people. This victory is the victory of democracy." [৬২] আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, "এ বিজয় জনতার বিজয়।"[৬৩]

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে পদত্যাগী প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি প্রধান বেগম খালেদা জিয়া প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন বলেন, "আন্দোলনে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় এসেছিলাম এখন জনতার দাবি মেনে নিয়েছি। গণতন্ত্র অব্যাহত রাখার স্বার্থে সরে দাড়িয়েছি।" প্রকৃত পক্ষে খালেদা জিয়ার এই পদত্যাগ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ক্ষমতা পরিবর্তনে গণতন্ত্র এবং সামাজিক ধারা বজায় থাকায় রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১৬ ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঃ

ত্রয়োদশ সংশোধনীর বিধানমতে রাষ্ট্রপতি ৩১ মার্চ ১৯৯৬ বাংলাদেশের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দান করেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯৬ সালের ১২ জুন ৭ম জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

সপ্তম সংসদ নির্বাচনে মোট ৮১টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল সাধারণভাবে অপরিচিত বা নামসর্বস্ব। ৮১টি তথাকথিত রাজনৈতিক দলের মধ্যে মাত্র ৬টি দল সংসদের আসন লাভে সমর্থ হয়। তবে আসল লড়াই হয় বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের মোট ৩৩০টি আসনের মধ্যে ১৭০টি আসন দখল করে। বস্তুত আওয়ামী লীগ জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ১৪৬টি, জাতীয়তাবাদী দল ১১৬টি ও জাতীয় পার্টি ৩২টি আসন লাভ করে এবং বাকী ৬টি আসন এর মধ্যে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ৩টি, জাসদ (রব) ১টি, ইসলামী ঐক্যজোট ১টি ও নির্দলীয় সদস্য ১টি আসন লাভ করে। নির্বাচনের পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ মহিলাদের জন্যে নির্ধারিত ৩০টি আসনের মধ্যে ২৪টি আসন লাভ করে মোট ১৭০টি আসনের অধিকারী হয়। নির্বাচনের ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ-

সারণি ঃ ৪.৮

সংগঠনের নাম	সাধারণ আসন	মহিলা আসন	মোট
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১৪৬	২৪	১৭০
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	১১৬	০	১১৬
জাতীয় পার্টি	৩২	৬	৩৮
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩	০	৩
ইসলামী ঐক্যজোট	১	০	১
জাসদ (রব)	১	০	১
নির্দলীয়	১	০	১
মোট	৩০০	৩০	৩৩০

উৎসঃ ইঞ্জিনিয়ার আবুল হোসেন, বাংলাদেশের রাজনীতি, ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ফেব্রুয়ারি ২০০৯।

Dhaka University Institutional Repository

নতুন সরকার গঠন ঃ

নির্বাচনের পর নির্দলীয় একমাত্র সদস্য আওয়ামী লীগে যোগদান করায় ৩০০ সদস্য বিশিষ্ট সংসদে আওয়ামী লীগের আসন দাঁড়ায় ১৪৭। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা ৩টি আসনে এবং আওয়ামী লীগের অপরদুই নেতা আব্দুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমদ ২টি করে আসনে বিজয়ী হন। সংবিধান অনুসারে একজন সংসদ সদস্য কেবল একটি আসনের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। এতে করে আওয়ামী লীগের প্রকৃত সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪৩ জন। অপরদিকে আওয়ামী লীগ ব্যতীত অন্যান্য সকল দলের সম্বিলিত সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪৩ জন। এমন পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগের সরকার গঠনের জন্য আর মাত্র একজন সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন ছিল। এমতাবস্থায় জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগকে সরকার গঠনের সমর্থন দান করে এবং ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১০ জন মন্ত্রী ও ৮ জন প্রতিমন্ত্রী নিয়ে ১৯ সদস্যের মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করে। ২৯ জুন তারিখে ২ জন মন্ত্রী ও ৪ জন প্রতিমন্ত্রী নিয়ে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত হয়।

সরকার গঠনের পর ১৯৯৬ সালের ২৪ জুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষনে বলে, "জাতীয় সংসদ হবে সকল সমস্যা সমাধানের ও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। বাংলাদেশকে যতদ্রুত সম্ভব উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে তিনি জাতীয় ঐকমত্যের সরকারের রূপরেখা দিয়ে তাতে বিরোধী দলকেও যোগদানের আহ্বান জানান। কিন্তু প্রধান বিরোধী দল তাতে সাড়া দেয়নি এর পরবর্তীতে তারা সংসদ বর্জন কার্যক্রম অব্যাহত রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা

১. নির্বাচনী কার্যক্রম প্রতিবেদন, জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১, *বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়*, ঢাকা : পৃ. ১৫

২. *ঐ* পৃ. ৫১।

৩. *ঐ* পৃ. ২৯০।

৪. এস আব্দুল হাকিম, *আন্দোলন ও দেশ পরিচালনায় বেগম খালেদা জিয়া*, ঢাকা ঃ একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৯৪ পৃ. ৯৯।

৫. এম.এ. ওয়াজেদ মিঞা, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ*, ঢাকা ঃ ইউপিএল, ১৯৯৩ পৃ. ৩৭২।

৬. *ঐ*।

৭. *ঐ* ।

৮. *ঐ*।

৯. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৮৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত। *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকার আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়*, ঢাকা ঃ ডেপুটি কন্ট্রোলার, গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস, তেজগাঁও, কর্তৃক পুনঃ মদ্রিত ১৯৮৭, পৃ. ১০৫।

১০. *দৈনিক সংগ্রাম*, ১২ মার্চ, ১৯৯১।

১১. *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ১৯ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা, ২৯ মার্চ ১৯৯১, পৃ. ২১।

১২. *রোববার*, একাদশ বর্ষ ২৬তম সংখ্যা, ২৪ মার্চ ১৯৯১, পৃ. ১২।

১৩. ইয়াসিফ আকবর, জাতীয়তাবাদী শক্তির বিপুল বিজয়, *সাপ্তাহিক পূর্ণিমা*, ৪র্থ বর্ষ ২৮ সংখ্যা, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১।

১৪. *ঐ*, পৃ. ১৪।

১৫. *সাপ্তাহিক পূর্ণিমা*, ৪র্থ বর্ষ ৩০ সংখ্যা, ১৩ মার্চ ১৯৯১ পৃ. ১৪।

১৬. *ঐ*, পৃ. ১৯-২১।

১৭. *ঐ*, পৃ. ২১।

১৮. *ঐ*।

১৯. নির্বাচনী কার্যক্রম প্রতিবেদন, *জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৩।

২০. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (১৯৯৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত সংশোধিত) *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকার আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়*, ১৯৯৪ পৃ. ৪৭।

২১. *আজকের কাগজ*, ২ নভেম্বর, ১৯৯২।

২২. এম. এ ওয়াজেদ মিয়া, *বাংলাদেশের রাজনীতি ও সরকারের চালচিত্র*, ঢাকা; ইউপিএল, ১৯৯৫, পৃ. ৯৭।

২৩. *আজকের কাগজ*, ১৯ নভেম্বর, ১৯৯৪।

২৪. *আজকের কাগজ*, ২৩ জুন, ১৯৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

২৫. *আজকের কাগজ*, ৬ আগস্ট, ১৯৯২।

২৬. *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৩ আগস্ট, ১৯৯২।

২৭. ঐ।

২৮. *আজকের কাগজ*, ২ মার্চ, ১৯৯৪।

২৯. ঐ ।

৩০. ঐ ।

৩১. ঐ।

৩২. *আজকের কাগজ*, ৭ মার্চ, ১৯৯৪।

৩৩. *আজকের কাগজ*, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩।

৩৪. *আজকের কাগজ*, ৮ এপ্রিল, ১৯৯৪।

৩৫. *আজকের কাগজ*, ৫ মে, ১৯৯৪।

৩৬. *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ২৩ বর্ষ ৬ সংখ্যা, ১লা জুলাই, ১৯৯৪।

৩৭. *আজকের কাগজ*, ১১ অক্টোবর ১৯৯৫।

৩৮. *আজকের কাগজ*, ১৬ অক্টোবর, ১৯৯৫।

৩৯. *আজকের কাগজ*, ৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৫।

৪০. Sirajuddin Ahmed, *Sheikh Hasina, Prime minister of Bangladesh*, Dhaka: Hakkani Publishers, 1998, P-156

৪১. *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ২৪ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা, ১২ জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃঃ-৭

৪২. মাহমুদ শফিক, নির্বাচনের পক্ষ - বিপক্ষ, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ঢাকা ঃ ২৪ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা, ২৬ জানুয়ারি, ১৯৯৬ পৃঃ-২৯।

৪৩. *ঐ*, পৃঃ-৩০।

৪৪. সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২৪ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা, ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬, পৃঃ-২৫।

৪৫. *ঐ*।

৪৬. মাহ্মুদ শফিক, নির্বাচন '৯৬, দেয়ালে পিঠ নয়, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, পৃঃ-২৫।

৪৭. মাহ্মুদ শফিক, নির্বাচন ১৯৯৬, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ২৪ বর্ষ ৪০ সংখ্যা, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬, পৃঃ-১১।

৪৮. মাহ্মুদ শফিক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ-১২।

৪৯. প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৩ মার্চ (১৯৯৬) এর রেডিও টিভি ভাষণ, ঢাকা ঃ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ মার্চ-১৯৯৬।

৫০. আহমেদ নূরে আলম, রাষ্ট্রপতির উদ্যোগে কি ফল হবে? ঢাকা ঃ *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ২৪ বর্ষ ৪৪ সংখ্যা, ১৫ মার্চ ১৯৯৬, পৃঃ-১৪।

৫১. *ঐ*, পৃঃ-১৫।

৫২. *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ২৪ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা, ২২ মার্চ, ১৯৯৬ পৃং-১৫।

৫৩. *ঐ*।

Dhaka University Institutional Repository

৫৪. ঐ।

৫৫. *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ২৪ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা, ২২ মার্চ, ১৯৯৬, পৃঃ-১৩।

৫৬. ঐ।

৫৭. Sirajuddin Ahamed, *Ibid*, P-168.

৫৮. *Ibid.*

৫৯. *সাপ্তাহিক বিচিত্রা, প্রাগুক্ত*, পৃঃ-১৩।

৬০. *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ২৪ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা, ২৯ মার্চ ১৯৯৬, পৃঃ-৮।

৬১. ঐ, পৃঃ-১১।

৬২. Sirajuddin Ahamed, *Ibid*, P-172.

৬৩. *আজকের কাগজ*, ৩১ মার্চ, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় ঃ অষ্টম জাতীয় সংসদ (২০০১ - ২০০৬)

একটি দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জাতীয় সংসদের ভূমিকা অপরিসীম। সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় আইন প্রণয়ন সংসদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলেও একমাত্র কাজ নয়। প্রতিনিধিত্ব এবং তদারকিও সংসদের অন্যতম প্রধান কাজ। আর এসবের পূর্বশর্ত হচ্ছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা। সরকারের প্রতিটি কাজে যদি স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহ থাকে তবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব। মূলত এসবের ভিত্তিতেই গণতন্ত্র সুদৃঢ় হয়। সংসদে বিভিন্নভাবে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীরা জবাবদিহিতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারেন। প্রশ্নোত্তর, মনোযোগ আকর্ষণ, জনগুরত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা, বিভিন্ন বিধিতে বক্তব্য প্রদান এবং সর্বোপরি শক্তিশালী কমিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে সংসদ নির্বাহী বিভাগের কাজের তদারকি, তত্ত্বাবধান এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে। মোট কথা নির্বাহী বিভাগ তার সকল কাজের জন্য সংসদে জবাবদিহি করবে এটাই কাম্য। সংসদের কাছে নির্বাহী বিভাগের এই জবাবদিহিতা অনেকাংশে নির্ভর করে প্রতিনিধিত্বের ওপর। সংসদে প্রতিনিধিত্বের এই বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে থাকে সংসদ সদস্যদের দ্বারা। সংসদ সদস্যরা যদি তাদের দলের প্রতিনিধি হিসেবে, নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধি হিসেবে, বিশেষ গোষ্ঠী, শ্রেণি বা পেশার প্রতিনিধি হিসেবে সংসদে ভূমিকা পালন করতে না পারেন, তাহলে জবাবদিহিতা নিশ্চিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

দেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠার মূল অন্তরায় দুর্নীতি। যেখানে দুর্নীতি থাকবে সেখানে সুশাসন থাকতে পারে না। সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য দুর্নীতি নির্মূল করতে হবে। এর প্রধান দায়িত্ব নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের। এ দায়িত্বভার সংসদের ভেতরে ও বাইরে উভয় ক্ষেত্রে বিদ্যমান। ১৯৯১ সালে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর আশা করা হয়েছিল জাতি গণতন্ত্রায়নের পথে এগিয়ে যাবে এবং গণতন্ত্র সুদৃঢ় ভিত্তি পাবে। কিন্তু ১৫ বছর পেরিয়ে গেলেও দেখা যাচ্ছে, জাতীয় সংসদ আমাদের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিশেষ কোনো প্রতিফলন দেখাতে পারেনি।

সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে। সরকার গঠনের পর বিধি মোতাবেক অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ দল বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কাজেই বিরোধী দলের কার্যক্রম অনেকাংশে সরকারের মতই গুরুত্বপূর্ণ। বিরোধী দল না থাকলে গণতন্ত্র কার্যকর হয় না। আবার সংসদীয় গণতন্ত্র কার্যকর হবে না যদি বিরোধী দল সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন মেনে না নেয়।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুতপক্ষে বিরোধী দল ও সকারি দলের আলোচনার ভিত্তিতে সরকার পরিচালিত হবে। সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল কথাই হলো সংসদে আলোচনা করে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষযে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দেশের স্বার্থে আইন প্রণয়ন এবং জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে ঐকমত্যে পৌছানো। এক্ষেত্রে সংসদীয় ব্যবস্থা বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করতে সক্ষম হয়নি, যা সুশাসন বাস্তবায়নকে দীর্ঘায়িত করছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.১ অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০১ ঃ

সপ্তম সংসদের মেয়াদ ছিল ১৩ জুলাই, ২০০১ পর্যন্ত। সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদে বিধান রয়েছে যে, মেয়াদ শেষে সংসদ ভেঙ্গে যাবার ৯০ দিনের মধ্যে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সে অনুসারে ১১ অক্টোবর ২০০১ তারিখের মধ্যে অষ্টম সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান বাধ্যতামূলক ছিল।

ইতোপূর্বে বাংলাদেশে সকল সংসদ ৫ বছর মেয়াদ পূর্ণ হবার পূর্বেই ভেঙ্গে যায় এবং কোন সরকারই স্বাভাবিক বা নিয়মতান্ত্রিক পথে বিদায় গ্রহণ করতে পারেনি। প্রথম সংসদের কার্যকাল ছিল প্রায় ৩২ মাস, দ্বিতীয় সংসদের ৩৬ মাস, তৃতীয় সংসদের ১৭ মাস, চতুর্থ সংসদের ৩১ মাস, পঞ্চম সংসদের ৫৬ মাস, ষষ্ঠ সংসদের কার্যকাল ছিল মাত্র ১১ দিন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ১৯৯৬ সালের ৩০ মার্চ গণআন্দোলোনের মুখে মাত্র ১১ দিনের মাথায় ষষ্ঠ সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চান স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ পথে ক্ষমতা হস্তান্তর হোক। তার আগাম নির্বাচনের ঘোষণা উদ্দেশ্য ছিল বিরোধী দলগুলোকে রাজপথের আন্দোলন হতে ফিরিয়ে আনা। কিন্তু নির্বাচন কখন হবে সে বিষয়ে বিরোধী দলের তেমন মাথা ব্যাথা ছিল না। কি পরিস্থিতিতে নির্বাচন হবে সেটাই ছিল বিরোধী দলের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। তারা চায় সরকারের বিদায় যেন সুখকর বা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে না হয়। তারা এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায় যাতে প্রতীয়মান হয় যে, আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা ত্যাগে বাধ্য হয়েছে। এ ধরনের পরিবেশে পরবর্তী নির্বাচনে বিরোধী দল লাভবান হবে বলে তারা মনে করে, যেমনটি হয়েছিল ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগের বেলায়। সে জন্য পরবর্তী নির্বাচনের দিনক্ষণ নির্ধারণ না করেই বি,এন,পি অবিলম্বে সরকারের পদত্যাগ দাবি করে।[১] অপরদিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ আশংকা করেন যে, শেখ হাসিনা ক্ষমতা ত্যাগ করলে বিরোধী দল নানা অজুহাতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে নির্বাচন পিছিয়ে দেয়ার দাবি তুলবে। সুতরাং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে নির্বাচন সম্পর্কে বিরোধী দলের সঙ্গে আগাম সমঝোতা সৃষ্টির প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

৫.১.১ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন

বিরোধী দলের সঙ্গে সমঝোতা না হওয়ায় সরকার "পদত্যগ নয়, ক্ষমতা হস্তান্তর" এ অবস্থান গ্রহণ করে এবং মেয়াদের শেষ দিন ১৩ জুলাই পর্যন্ত সংসদ অধিবেশন চালু রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। সংবিধান অনুসারে ১৪ জুলাই সংসদ ভেঙ্গে যায় এবং সেই দিনই রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের সর্বশেষ অবসর প্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। ১৫

Dhaka University Institutional Repository

জুলাই সন্ধ্যায় এক ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টার শপথ গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পন্ন হয়। এ অনুষ্ঠানে বেগম খালেদা জিয়ার অনুপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি ১৬ জুলাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ১০ জন উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। উপদেষ্টারা ছিলেন ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ (সুপ্রিম কোর্টের এ্যাডভোকেট), বিমল বিকাশ রায় চৌধুরী (সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি), এম. হাফিজউদ্দিন খান (অবসরপ্রাপ্ত মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক), আব্দুল মুইদ চৌধুরী (অবসরপ্রাপ্ত সচিব), এ. এস. এম শাহজাহান (অবসরপ্রাপ্ত সচিব), মইনুল ইসলাম চৌধুরী (অবসর প্রাপ্ত সামরিক আমলা), ডাঃ এম. এ মালেক (অবসর প্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার), মঞ্জুর এলাহী (শিল্পপতি), রোকেয়া আফজাল রহমান (ব্যবসায়ী)।

৫.১.২ নির্বাচনী তাফসিল

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। দেশের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীরা হামলার শিকার হন। আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও অবিলম্বে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার দাবি জানায়। আওয়ামী লীগের যুক্তি ছিল, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হলে হামলা সন্ত্রাস হ্রাস পাবে। কিন্তু বিএনপি নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার বিরোধিতা করেন। বিএনপির দাবি ছিল, আওয়ামী লীগ আমলের প্রশাসনে ব্যাপক রদ-বদলের মাধ্যমে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। যাহোক, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ১৯ আগস্ট তারিখে অষ্টম জাতীয় সংসদের নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করেন। ১৯ আগস্ট মনোনয়নপত্র দাখিল, ৩০-৩১ আগস্ট মনোনয়নপত্র বাছাই, ৬ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার এবং ১ অক্টোবর ভোট গ্রহণের তারিখ ধার্য করা হয়।

৫.১.৩ নির্বাচনী প্রতীক ও প্রার্থিতা

অষ্টম সংসদ নির্বাচনে ৫৫টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। নির্বাচন কমিশন দলগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন প্রতীক বরাদ্দ করে। নির্বাচনী প্রতীকসহ অংশগ্রহণকারী প্রধান দলগুলোর নাম নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১. বি.এন.পি	-ধানের শীষ
২. আওয়ামী লীগ	-নৌকা
৩. জাতীয় পার্টি (এরশাদ)	- লাঙ্গল
৪. জামায়াত-ই-ইসলামী	-দাঁড়িপাল্লা

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম সংসদ নির্বাচনে মোট ১৯৩৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তন্মোধ্যে ৪৮৬ জন ছিলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী এবং অবশিষ্ট ১৪৫৩ জন প্রার্থী বিভিন্ন দল কর্তৃক মনোনীত হন। একাধিক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এমন প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৩২ এবং আসন সংখ্যা ছিল ৪৮। বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা উভয়ই ৫টি করে আসনের প্রার্থী ছিলেন। উল্লেখ্য যে, বিধি মোতাবেক একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ ৫ টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। একমাত্র বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মোট ৩০০ আসনেই প্রার্থী দেয়। বিএনপি, জামায়াত-ই-ইসলামী, জাতীয় পার্টি (নাজিউর-ফিরোজ) ও ইসলামী ঐক্যজোট- এই চার দল জোটবদ্ধভাবে নির্বাচন করে। জামায়াত-ই-ইসলামী নিজস্ব প্রতীক দাঁড়িপাল্লা নিয়ে নির্বাচন করেন। এই চারদলীয় জোটের অন্য তিন দল বিএনপি'র ধানের শীষের প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এই জোটের কোন অভিন্ন নির্বাচনী ইশতেহার ছিল না। শরিক দলগুলো পৃথক পৃথক নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করে। এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের সঙ্গে মিলিত হয়ে 'ইসলামি জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট' নামে জোটবদ্ধভাবে নির্বাচন করেন। এই জোটের প্রতীক ছিল লাঙ্গল। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল, (খালেকুজ্জামান), বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল, (মাহাবুব), গণফোরাম, গণতন্ত্রী পার্টি, কমিউনিস্ট কেন্দ্র, বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল, গণ আজাদী লীগ, ও শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল- এই দশটি বাম গণতান্ত্রিক সংগঠন ১১ দলীয় জোটের ব্যানারে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এই জোটের অভিন্ন নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করলেও পৃথক পৃথক দলীয় প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করে।

৫৫ টি দলের মধ্যে ২১ টি দল মাত্র একজন করে প্রার্থী মনোনয়ন দেয়। ২ হতে ১০ জন প্রার্থী দেয় এমন দলের সংখ্যা ছিলো ১৭, ১১ হতে ৩০ জন প্রার্থী দেয় এমন দলের সংখ্যা ছিল ৬ এবং ৩০ এর অধিক প্রার্থী দেয় এমন দলের সংখ্যা ছিল মাত্র ১০।

উল্লেখ্য যে, অষ্টম জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন ছিল না। তবে এ নির্বাচনে সর্বোচ্চ সংখ্যক মহিলা প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এ সংখ্যা ছিল ২৭ এবং তাদের অনেকেই একাধিক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বিধায় মহিলা প্রার্থীদের আসন সংখ্যা ছিল ৩৭। আওয়ামী লীগ সর্বোচ্চ ১০ জন মহিলা প্রার্থী মনোনয়ন দেয় (১৪ আসনে)। অন্যান্য দলের মধ্যে বিএনপি'র মহিলা প্রার্থীদের আসন সংখ্যা ছিল ৪ জন (৮ আসনে), জাতীয় পার্টি (এরশাদ) - এর মহিলা প্রার্থীর আসন সংখ্যা ছিল ৪

Dhaka University Institutional Repository

জন (৫ আসনে), জাতীয় পার্টি (মঞ্জু) এর মহিলা প্রার্থীর আসন সংখ্যা ছিল ৫ জন (৫ আসনে), ১১ দলীয় জোটের মহিলা প্রার্থীর আসন সংখ্যা ছিল ৩ জন এবং মুসলিম লীগের ১ জন।

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তালিকাভুক্ত ভোটার সংখ্যা ছিল ৭,৫০,০০,৬৫৬। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ছিল ৩,৮৬,৮৪,৯৭২ এবং মহিলা ভোটার ৩,৬৩,১৫,৬৮৪। প্রদত্ত ভোটের হার ছিল প্রায় ৭৪ শতাংশ।

৫.১.৪ নির্বাচনের ফলাফল

নির্বাচন কমিশন ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৪০.১৩% ভোট পায়, কিন্তু আসন পায় মাত্র ৬২ টি। অপর পক্ষে বি,এন,পি ৪০.৯৭% ভোট পেয়ে আসন পায় ১৯৩ টি। জামায়াত-ই-ইসলামী ভোট পায় ৪.২৮ %, আসন পায় ১৭ টি। জাতীয় পার্টি (না-ফি) ভোট পায় ১.১২ %, আসন পায় ৪টি এবং ইসলামী ঐক্যজোট ভোট পায় ০.৬৮ %, আসন পায় ২ টি। যেহেতু বিএনপি, জামায়াত-ই-ইসলামী, জাতীয় পার্টি (না-ফি), ইসলামী ঐক্যজোট ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচন করে সেহেতু এই দলগুলো এককভাবে প্রকৃতপক্ষে কত শতাংশ ভোট পায় তা সুনির্দিষ্ট করে বলা যায় না। তবে ৪ দলীয় জোট মোট ৪৭.৫০% ভোট ও ২১৬ টি আসন লাভ করে।

সারণি ঃ ৫.১

২০০১ অষ্টম সংসদ নির্বাচনের ফলাফল (দলীয় অবস্থান)

দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোট (%)
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি,এন,পি)	২৫২	১৯৩	৪০.৯৭
জামায়াত-ই-ইসলামী	৩১	১৭	৪.১৮
জাতীয় পার্টি (না-ফি)	১১	০৪	১.১২
ইসলামী ঐক্যজোট	০৬	০২	০.৬৮
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩০০	৬২	৪০.১৩
ইসলামী জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট (জাতীয় পার্টি)	২৮১	১৪	৭.২৫
কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	৩৯	০১	০.৪৭
জাতীয় পার্টি মঞ্জু	১৪০	০১	০.৪৪
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	৭৬	-	০.২১
বাম-গণতান্ত্রিক জোট (১১দল)	১৭৫	-	০.২৫
অন্যান্য দল	১৪২	-	০.১৪
স্বতন্ত্র	৪৮৬	০৬	৪.০৬
মোট	১৯৩৯	৩০০	১০০

Dhaka University Institutional Repository

৫.১.৫ নির্বাচন পরবর্তী প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশে প্রতিটি নির্বাচনে কিছু না কিছু অনিয়ম বা কারচুপি হয়েছে। নির্বাচনে বিজয়ী দল ভোটারদের অভিনন্দন জানিয়েছে। আর পরাজিত দল অনিয়ম কারচুপির অভিযোগ তুলে ফলাফল মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। এটাই হচ্ছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি। অষ্টম সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রেও এ ঐতিহ্য বহাল থাকে। তবে ইতোপূর্বে নির্বাচন পরিচালনার পদ্ধতি ও তার ফলাফল সম্পর্কে গণমাধ্যমগুলোতে এত ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী তর্ক-বিতর্ক হয়নি, কিংবা পরাজিত দল এ অভিযোগে সংসদ বর্জন করেনি।

চার দলীয় জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তার দল ও জোটের বিপুল বিজয়ের জন্য দেশবাসীকে অভিনন্দন জানান এবং একটি "অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ" নির্বাচন অনুষ্ঠান করার জন্য রাষ্ট্রপতি, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি ভোটের ফলাফলকে সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সঠিক রায় বলে আখ্যায়িত করেন। অপরদিকে, আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা অভিযোগ করেন, এবারের নির্বাচন সূক্ষ নয়, স্থুল কারচুপি হয়েছে। তিনি বলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার, প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নীলনক্শা প্রণয়ন করে আওয়ামী লীগকে পরাজিত করেছে। নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহণ থাকলেও তাদের রায় ফলাফলে প্রতিফলিত হয়নি। এ রায় মেনে নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না।[২] তিনি ১০ অক্টোবরের মধ্যে নির্বাচন বাতিল করে পুনঃনির্বাচন দাবি জানান এবং বিক্ষোভ ও অবরোধের কর্মসূচি দেন।

তবে অন্যান্য রাজনৈতিক দল নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেন। দেশী-বিদেশী প্রায় সকল পর্যবেক্ষক দল তাৎক্ষনিকভাবে নির্বাচন সম্পর্কে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। জাতিসংঘ নির্বাচন সহায়ক সচিবালয়, 'এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ফ্রি ইলেকশন', জাপানী পর্যবেক্ষক গ্রুপ প্রভৃতি বিদেশী পর্যবেক্ষণ মিশন এবং 'ভোট অবজারভেশন ফর ট্রান্সপারেন্সি এন্ড এমপাওয়ারমেন্ট' (VOTE) 'অধিকার', 'আশা', খান ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন প্রভৃতি স্থানীয় পর্যবেক্ষক দল সুনির্দিষ্টভাবে কোন কিছু না বলে ঢালাওভাবে নির্বাচনকে " সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ" বলে উল্লেখ করে। কয়েকটি পর্যবেক্ষক দল কিছু ভোটকেন্দ্র সহিংসতা ও সন্ত্রাসের কথা উল্লেখ করলেও সেগুলো উদ্বেগজনক মাত্রায় ছিলনা বলে মন্তব্য করে। তবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন পর্যবেক্ষক টিম একটি তথ্যভিত্তিক রিপোর্ট প্রদান করে। এ রিপোর্টে বেশ কিছু ত্রুটি বা অনিয়মের উল্লেখ করা হয়।[৩]

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ছিল অনেকটা অপ্রত্যাশিত। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মধ্যে একটা ধারণা ছিল যে, আওয়ামী লীগ, ও বিএনপি জোটের মধ্যে তীব্র লড়াই হবে। কেউ কেউ ভবিষ্যৎ বাণী করেন, কোন দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না; সংসদ হবে ঝুলন্ত। কারণ আওয়ামী লীগ ও তার ৫ বছরের শাসনামলে আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার অল্প সময়ের মধ্যে ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি ও পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের সঙ্গে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করে দীর্ঘদিনের বিরোধ মীমাংসায় সক্ষম হয়। আওয়ামী লীগ আমলে একুশে ফেব্রুয়ারি "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" হিসেবে মর্যাদা লাভ করে এবং বাংলাদেশ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অংশগ্রহণ ও টেস্ট ম্যাচ খেলার যোগ্যতা লাভ করে। আওয়ামী লীগ ১৯৯৮ সালে শতাব্দীর দীর্ঘতম বন্যা সাফল্যের সঙ্গে মোকাবেলা করে। প্রায় ৬ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়; নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য স্থিতিশীল ও জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকে; প্রথম বারের মত দীর্ঘদিনের খাদ্য ঘাটতির দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে; ভিজি এফ-ভিজিডি কার্ডের মাধ্যমে গরিব ও দুস্থ মানুষের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তোলা হয়; দুস্থ্য ও বয়স্ক ভাতা এবং গৃহহীনদের জন্য আশ্রয়ণ প্রকল্প চালু করা হয়; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সহিংস কার্যকলাপ হ্রাস পায় এবং অনির্ধারিত বন্ধ না থাকার কারণে সেশন জট কমতে থাকে। এসব কারণে আওয়ামী লীগ গত নির্বাচনের তুলনায় ৩% বেশি ভোট পায়। এতদসত্ত্বেও আওয়ামী লীগের পরাজয় অনেককে বিস্মিত করে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.২ অষ্টম জাতীয় সংসদ কার্যক্রম (২০০১ - ২০০৬) ঃ

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি অনুযায়ী প্রত্যেক নতুন সংসদের প্রথম বৈঠক বিদায়ী স্পিকারের সভাপতিত্বে শুরু হয় এবং তিনি পরবর্তী স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচনের পর তাঁর আসন ত্যাগ করেন। মূলত এ বিধানটি দ্বারা এক সংসদের সাথে পরবর্তী সংসদের একটি ধারাবাহিকতা তৈরি হয়। অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের কার্যক্রম ২০০১ সালের ২৮ অক্টোবর, রবিবার, সকাল ১০.০০ টায় বিদায়ী স্পিকার মোঃ আব্দুল হামিদ, এ্যাডভোকেটের সভাপতিত্বে শুরু হয়। সংবিধান অনুযায়ী যেকোনো সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার ৩০ দিনের মধ্যে নতুন সংসদ আহবান করতে হয়। সংবিধানের এই নিয়ম অনুযায়ী বিদায়ী স্পিকার অপ্রতিদ্বন্দ্বীভাবে ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকারকে স্পিকার এবং আকতার হামিদ সিদ্দিকীকে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন করেন। নিয়ম অনুযায়ী সংসদের নেতা হন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। প্রধানমন্ত্রী সংসদের উপনেতা নির্বাচন করেন অষ্টম সংসদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে। তিনি পঞ্চম এবং ষষ্ঠ জাতীয় সংসদেও ভারপ্রাপ্ত নেতা ছিলেন এবং সপ্তম জাতীয় সংসদে তিনি বিরোধী দলীয় উপনেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে তিনি সংসদ সদস্য পদ থেকে সরে যান। পরবর্তীতে অবশ্য রাষ্ট্রপতির পদ থেকে তিনি সরে দাঁড়ালে প্রফেসর ইয়াজ উদ্দিন আহম্মেদ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

সংবিধান অনুযায়ী সরকারি এবং বিরোধী দলের একজন করে সংসদ উপনেতা থাকেন। সংসদ উপনেতা সংসদ নেতার অনুপস্থিতিতে তার হয়ে কাজ করেন। জাতীয় ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে কোন প্রস্তাব রাখলে সে বিষয়ে তিনি সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন। অনেক সময় উপনেতার মাধ্যমে সংসদে সংসদ নেতা, সরকারি দল ও সরকারি অবস্থানের প্রতিফলন ঘটে। সংসদে সরকার এবং বিরোধী দলের মধ্যে কোনো মতানৈক্য দেখা দিলে প্রথমে দুই উপনেতা বসে সমাধানের চেষ্টা করেন। অথচ এ গুরত্বপূর্ণ সংসদ উপনেতা পদটি ২০০২ সালের জানুয়ারি থেকে অষ্টম সংসদ সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত শূন্য ছিল। বিদায়ী স্পিকার বিরোধী দলীয় সংসদদের মতামতের ভিত্তিতে শেখ হাসিনাকে সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা হিসেবে নির্বাচন করেন। নতুন নির্বাচিত স্পিকারের নির্দেশনা অনুযায়ী বিদায়ী স্পিকার মোঃ আব্দুল হামিদ সংসদের বিরোধী দলীয় উপনেতা নির্বাচিত হন। বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুযায়ী চীফ হুইপ তার অধীনস্থ ছয়জন হুইপ নির্বাচন করে। অষ্টম সংসদে বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ ছিলেন উপাধ্যক্ষ আব্দুস শহীদ।

Dhaka University Institutional Repository

৫.২.১ অষ্টম সংসদে কার্যদিবস ও কার্যসময়

অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের কার্যক্রম বিদায়ী স্পিকার মোঃ আব্দুস হামিদ এ্যাডভোকেটের সভাপতিত্বে শুরু হয় ২০০১ সালের ২৮ অক্টোবর। মাঝে বিভিন্ন মেয়াদে ১৪ দিনের বিরতি দিয়ে অধিবেশন শেষ হয় ২ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে । ২০০১ সালে ১টি অধিবেশনের ১৯টি কার্যদিবসে প্রায় ৫৮ ঘণ্টা সংসদ কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

২০০২ সালে মোট চারটি অধিবেশনের ৭৫ কার্যদিবসে প্রায় ২৪৪ ঘণ্টা সংসদ অধিবেশন চলে। ৩১ জানুয়ারি অষ্টম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়। মাঝে বিভিন্ন মেয়াদে মোট ৩৩ দিনের বিরতি দিয়ে ১০ এপ্রিল ২০০২ অধিবেশন শেষ হয়। ১৯টি কার্যদিবসে দ্বিতীয় অধিবেশনে মোট ব্যয়িত সময় প্রায় ১২৪ ঘণ্টা। অন্যদিকে তৃতীয় তথা বাজেট অধিবেশন শুরু হয় ৪ জুন ২০০২ তারিখে। মাঝে বিভিন্ন মেয়াদে ১৮ দিনের বিরতি দিয়ে অধিবেশন শেষ হয় ১৫ জুলাই ২০০২ তারিখে। ২৪টি কার্যদিবসের এই অধিবেশনে মোট ব্যয়িত সময় প্রায় ৭৯ ঘন্টা। অধিবেশন শুরু হয় ১২ সেপ্টেম্বর ২০০২ তারিখে এবং শেষ হয় ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০২ তারিখে। এই অধিবেশনের কার্যদিবস ছিল মাত্র চার দিন এবং অধিবেশন চলে প্রায় ১৯ ঘন্টা। পঞ্চম অধিবেশন শুরুর তারিখ ছিল ১৪ নভেম্বর ২০০২ এবং সমাপ্তির দিনটি ছিল ঐ মাসের ২৭ তারিখ। মোট ১০টি কার্যদিবসে ১৯ ঘন্টা ১০ মিনিট ৪৯ সেকেন্ড এই অধিবেশনের কার্যক্রম চলে।[৪]

২০০৩ সালে পাঁচটি অধিবেশনে ৬৩ কার্যদিবসে প্রায় ২৩২ ঘণ্টা সংসদ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। অষ্টম সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশন বা ২০০৩ সালের প্রথম অধিবেশন ২৬ জানুয়ারি শুরু হয়ে ১১ মার্চ তারিখে শেষ হয়। মোট ২৪টি কার্যদিবসে প্রায় ৯১ ঘণ্টা অধিবেশন চলে। সপ্তম অধিবেশন ৮মে তারিখে শুরু হয়ে মাঝে দুই দিন বিরতি দিয়ে ১৩মে শেষ হয়। এ অধিবেশন কার্যদিবস ছিল মাত্র ৪টি। এই চারটি কার্যদিবসে মূল অধিবেশন চলে প্রায় ১৪ ঘণ্টা। অষ্টম অধিবেশন শুরু হয় ১০জুন এবং বিভিন্ন মেয়াদের ১১ দিনের বিরতি দিয়ে শেষ হয় ২৫ জুলাই। এ অধিবেশনে কার্যদিবস ছিল ২৫টি এবং অধিবেশনের কার্যকাল ছিল মোটি প্রায় ৯২ ঘণ্টা। নবম অধিবেশন ১১ সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে ঐ মাসের ১৮ তারিখে শেষ হয়। এ অধিবেশনে কার্যদিবস ছিল ৬টি এবং ব্যয়িত সময়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ২৩ ঘণ্টা। অন্যদিকে দশম অধিবেশন ১৬ নভেম্বর শুরু হয়ে ১৯ নভেম্বর শেষ হয়। এ অধিবেশনে কার্যদিবস ছিল মাত্র চারটি এবং ব্যয়িত সময় ছিল প্রায় ১১ ঘণ্টা।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

২০০৪ সালে চারটি অধিবেশনের ৮৩ কার্যদিবসে প্রায় ২৬৮ ঘণ্টা সংসদ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। একাদশ অধিবেশন শুরু হয় ১৮ জানুয়ারি। এ অধিবেশনে কার্যদিবস ছিল ৪৩টি। ২০০৪ সালের বাজেট অধিবেশন অর্থাৎ দ্বাদশ অধিবেশন শুরু হয় ৯ জুন। সাপ্তাহিক ছুটি ছাড়া মাত্র একদিনের বিরতি দিয়ে এ অধিবেশন শেষ হয় ১৪ জুলাই। এ অধিবেশনে কার্যদিবস ছিল ২৫টি। সংসদের ত্রয়োদশ অধিবেশন ১২ সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে ঐ মাসের ১৬ তারিখে শেষ হয়। এ অধিবেশনে কার্যদিবস ছিল মাত্র চারটি। এ অধিবেশনটি ছিল প্রকৃতপক্ষে নিয়ম রক্ষার অধিবেশন। চতুর্দশ অধিবেশন ২৮ অক্টোবর শুরু হয়। সাপ্তাহিক বিরতি ছাড়াও মাঝে ২২ দিনের বিরতি দিয়ে ২ ডিসেম্বর এ অধিবেশন শেষ হয়। এ অধিবেশনে কার্যদিবস ছিল ১১টি। অর্থাৎ ২০০৪ সালে অধিবেশন চলে ৮৩ দিন এবং এতে মোট সময় ব্যয় হয় প্রায় ২৬৮ ঘণ্টা।

পঞ্চদশ অধিবেশন ২০০৫ সালের ৩১ জানুয়ারি বিকাল পাঁচটায় শুরু হয় এবং ১৫ মার্চ রাত ৯টা ০৪ মিনিটে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে। এ অধিবেশনে কার্যদিবস ছিল ২২টি, যার মধ্যে ১৮ দিন সরকারি কার্যাবলী সম্পর্কিত দিবস এবং চার দিন বেসরকারি সদস্যদের কার্যাবলী সম্পর্কিত দিবস।

সারণিঃ ৫.২ ঃ অষ্টম জাতীয় সংসদে কার্যদিবস সংক্রান্ত তথ্য

সাল	অধিবেশনের সংখ্যা	মোট ব্যয়িত সময়	মোট কার্যদিবস	প্রতি কার্যদিবসে গড়ে বৈঠককাল (প্রায় ঘ./মি.)
অক্টোবর ২০০১ থেকে	১	৫৮:১২:০৪	১৯	৩ ঘণ্টা ৩ মিনিট
২০০২	৪	২৪৪:৩৪:০০	৭৫	৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট
২০০৩	৫	২৩২:১৮:০০	৬৩	৩ ঘণ্টা ৪১ মিনিট
২০০৪	৪	২৬৭:৪৬:০০	৮৩	২ ঘণ্টা ১৩ মিনিট
২০০৫	৫	১৮৪:১৮:০০	৬২	২ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট
অক্টোবর ২০০৬ পর্যন্ত	৪	২০২:২১:১৬	৭১	২ ঘণ্টা ৫১ মিনিট
মোট	২৩	১১৮৯: ২৯:২০	৩৭৩	৩ ঘণ্টা ১১ মিনিট

উৎস ঃ গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অষ্টম জাতীয় সংসদ ২০০১ - ২০০৬, টিআইবি

ষোড়শ অধিবেশন আরম্ভ হয় ২০০৫ সালের ১২ মে এবং ১৭ মে রাত ৯-৪৫ মিনিটে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে। এ অধিবেশনে কার্যদিবস ছিল চারটি, যার মধ্যে তিন দিন সরকারি কার্যাবলী সম্পর্কিত দিবস এবং এক দিন বেসরকারি সদস্যদের কার্যাবলী সম্পর্কিত দিবস। ২০০৫ সালের বাজেট অধিবেশন (সপ্তদশ অধিবেশন) শুরু হয় ৭ জুন এবং শেষ হয় ১০ জুলাই। এ অধিবেশনে কার্যদিবস

Dhaka University Institutional Repository

ছিল ২২টি। বাজেটের ওপর আলোচনার সুবিধার্থে বেসরকারি দিবস বাতিল করা হয়। ফলে এ অধিবেশনের সব কার্যদিবসই ছিল সরকারি কার্যদিবস। সংসদের অষ্টাদশ অধিবেশন ৮ সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে ২১ সেপ্টেম্বর শেষ হয়। এ অধিবেশনে কার্যদিবস ছিল নয়টি। ২০০৫ সালের শেষ অধিবেশন অর্থাৎ ঊনবিংশতিতম অধিবেশন শুরু হয় ২০ নভেম্বর এবং শেষ হয় ২৪ নভেম্বর। এ অধিবেশনে কার্যদিবস ছিল পাঁচটি। ২০০৫ সালের পাঁচটি অধিবেশনে ৬২টি কার্যদিবসে মোট সময় ব্যয় হয় প্রায় ১৮৪ ঘণ্টা। বস্তুত ২০০৫ সালে যে পাঁচটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় তার মধ্যে পঞ্চদশ ও সপ্তদশ অধিবেশন ছাড়া বাকি অধিবেশনগুলো ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত।

২০০৬ সালের প্রথম অধিবেশন অর্থাৎ অষ্টম সংসদের বিংশতিতম অধিবেশন শুরু হয় ২০০৬ সালের ২৩ জানুয়ারি এবং শেষ হয় ২৮ ফেব্রুয়ারি। এ অধিবেশনে কার্যদিবস ছিল ২০ এবং ব্যয়িত সময় ছিল প্রায় ৪২ ঘণ্টা। একবিংশতিতম অধিবেশন শুরু হয় ২০০৬ সালের ২৭ এপ্রিল এবং শেষ হয় ৯ মে। এ অধিবেশনে সাত কার্যদিবসে মোট ব্যয়িত সময় প্রায় ১৮ ঘণ্টা। দ্বাবিংশতিতম অধিবেশন ২৬ কার্যদিবসে মোট ব্যয়িত সময় প্রায় ৮০ ঘণ্টা। এ অধিবেশনটি শুরু হয় ৭ জুন এবং শেষ হয় ১২ জুলাই। অষ্টম জাতীয় সংসদের শেষ অধিবেশন অর্থাৎ ত্রয়োবিংশতিতম অধিবেশনের মোট ১৮৫ কার্যদিবসে ব্যয়িত সময় প্রায় ৫৪ ঘণ্টা। এ অধিবেশন শুরু হয় ১০ সেপ্টেম্বর এবং শেষ হয় ৪ অক্টোবর। ২০০৬ সালে ৪টি অধিবেশনের মোট ৭১টি কার্যদিবসে ব্যয়িত সময় প্রায় ১৯৫ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট।

৫.২.২ বাজেট উপস্থাপন ও এর ওপর আলোচনা

সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় যেকোন সরকারের একটি অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রমের বহিঃপ্রকাশ ঘটে বাজেটের মাধ্যমে। সংবিধানের ৮৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রত্যেক অর্থবছরের বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি বা প্রত্যেক অর্থবছর সম্পর্কে উক্ত বছরের জন্য অনুমিত আয় ও ব্যয় সংবলিত একটি বিবৃতি উপস্থাপন করা হয় যা বাজেট নামে পরিচিত। প্রতি বছর সংসদের একটি অধিবেশনে সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের বাজেট পেশ ও এ সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়। তাই এই অধিবেশন বাজেট অধিবেশন নামেও পরিচিত।

অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম বাজেট উপস্থাপিত হয় তৃতীয় অধিবেশনে। ২০০২ সালের ৬ জুন ২০০১-২০০২ সালের সম্পূরক বাজেট এবং ২০০২-২০০৩ সালের সাধারণ বাজেট সংসদে উত্থাপিত

Dhaka University Institutional Repository

হয়। অষ্টম সংসদে দ্বিতীয় বাজেট উপস্থাপিত হয় অষ্টম অধিবেশনে। ২০০৩ সালের ৩০ জুন অধিবেশন শুরু হয়ে ১২ জুন ২০০২-২০০৩ সালের সম্পূরক বাজেট এবং ২০০৩-২০০৪ সালের সাধারণ বাজেট সংসদে উপস্থাপিত হয়। অষ্টম সংসদের তৃতীয় বাজেট উপস্থাপিত হয় দ্বাদশ অধিবেশনে যা শুরু হয় ২০০৪ সালের ৯ জুন। ২০০৩-২০০৪ সালের সম্পূরক বাজেটসহ ২০০৪-২০০৫ সালের সাধারণ বাজেট উত্থাপিত হয় ২০০৪ সালে ১০ জুন। অষ্টম সংসদে চতুর্থ বাজেট উপস্থাপিত হয় সপ্তদশ অধিবেশনে। ২০০৫ সালের ৭ জুন শুরু হওয়া সপ্তদশ অধিবেশনে ২০০৪-২০০৫ সালের সম্পূরক বাজেট ও ২০০৫-২০০৬ সালের সাধারণ বাজেট সংসদে উত্থাপিত হয়। অষ্টম সংসদের পঞ্চম ও শেষ বাজেট উত্থাপিত হয় দ্বাবিংশতিতম অধিবেশনে যা শুরু হয় ২০০৬ সালের ৭জুন। ২০০৫-২০০৬ সালের সম্পূরক বাজেট সহ ২০০৬-২০০৭ সালের সাধারণ বাজেট উত্থাপিত হয় ২০০৬ সালের ৯ জুন।

অর্থমন্ত্রী তার চতুর্থ বাজেট বক্তব্যে দারিদ্র্য দূরীকরণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে পূর্ণাঙ্গ দারিদ্র্য নিরসন পরিকল্পনার চারটি কৌশলগত নীতি এবং চারটি সহায়ক কৌশলের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।[৬] কৌশলগত চারটি নীতি হচ্ছে: ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস; উন্নয়ন সহায়ক গ্রামীণ কৃষি ও অকৃষি খাত, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাত, যোগাযোগ খাত এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন খাতে অগ্রাধিকার; দরিদ্র জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে দরিদ্র মহিলাদের জন্য লক্ষ্যভিত্তিক দারিদ্র্য হ্রাস কর্মসূচি এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম বাস্তবায়ন; মানব-দারিদ্র্য নিরসনের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি খাতে ক্রমান্বয়ে বিনিয়োগ বৃদ্ধি। উপরোক্ত চারটি নীতি বাস্তবায়নেরর জন্য সরকার যে চারটি সহায়ক কৌশল অবলম্বন করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন, তা হলো ঃ-

(১) দুর্দশাগ্রস্থ, প্রান্তিক, সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়, প্রতিবন্ধী গরিব জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে যারা নারী তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশীদারিত্ব এবং ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা;

(২) স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা;

(৩) জনগণ, বিশেষত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য সকল প্রকারের সেবার মানোন্নয়ন;

(৪) টেকসই উন্নয়ন এবং পরিবেশের ভারসাম্য নিশ্চিত করা।

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচ বছরের বাজেট বিশ্লেষণে দেখা যায়, শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ছিল সর্বোচ্চ। ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে বাজেটে ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের বরাদ্দের তুলনায় প্রায় ১৩.৬% বেশি বরাদ্দ রাখা হয়। ২০০৪-২০০৫ এর বাজেটে পূর্বের চেয়ে বরাদ্দের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৬%। এই বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা শেষ দুটি বাজেটেও ছিল। বাজেটে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতি বছর বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়। এভাবে প্রতি বছর বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হলেও বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের অবস্থা ছিল সবচেয়ে নাজুক। ২০০৬ সালে কোনো কোনো দিন পিক আওয়ারে লোডশোডিং করতে হয় ১৮০০ মেগাওয়াট।[৭]

সারণি ৫.৩ ঃ উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট (খাত-ওয়ারি বরাদ্দ)

অর্থ বছর	শিক্ষা ও প্রযুক্তি	পরিবহন ও যোগাযোগ	স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	জ্বালানি ও বিদ্যুৎ	কৃষি	জন প্রশাসন	সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ	স্বাস্থ্য	বাজেটে মোট অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)
২০০২-০৩[৮]	১৫%	১৩%	৯%	৬%	৭%	৬%	৪%	৭%	৪৪,৮৫৪
২০০৩-০৪[৯]	১৪%	১১%	৯%	৮%	৫%	৮%	৪%	৬%	৫১,৯৮০
২০০৪-০৫[১০]	১৩%	১০%	৯%	৮%	৬%	৫%	৫%	৭%	৫৭,২৪৮
২০০৫-০৬[১১]	১৫%	১০%	৯.৯%	৬.৭%	৬.৪%	৪.৬%	৪.৮%	৬.৬%	৬৪,৩৮৩
২০০৬-০৭[১২]	১৫.৯%	১০.৩%	৯.৭%	৬.১%	৭.৫%	৩.৪%	৪.৭%	৬.৮%	৬৯,৭৪০

২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে নতুন একটি খাত , স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন খাত হিসেবে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। ২০০৬-২০০৭ অর্থবছরের বাজেটে এই বরাদ্দ বৃদ্ধি করে রাখা হয় ১৫ কোটি টাকা। অষ্টম সংসদের শেষ বাজেটে ৭.৫% হারে কর দিয়ে কালো টাকা সাদা করার বিধান রাখা হয়নি, তবে কর হার কিছু বাড়িয়ে গাড়ি, বাড়ি ও জমি কিনলে কালো টাকা সাদা করার যে বিধান ছিল তা রেখে দেওয়া হয়। রাজস্ব আয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অর্থ পরোক্ষ কর থেকে আসবে বলে বাজেট করা হয়, যার বেশির ভাগই দিতে হয় সাধারণ মানুষকে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ৫.৪ ঃ বাজেটে অর্থায়নের উৎস

অর্থ বছর	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত কর	বৈদেশিক অনুদান/ বৈদেশিক অর্থায়ন/ বৈদেশিক ঋণ	অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	কর ব্যতীত প্রাপ্তি	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর
২০০২-২০০৩[১৩]	৫৩%	১৪%	১২%	১৭%	৪%
২০০৩-২০০৪[১৪]	৫৩%	১৮%	১৩%	১৪%	২%
২০০৪-২০০৫[১৫]	৫৭%	১৫%	১২%	১৩%	৩%
২০০৫-২০০৬[১৬]	৫৫.৪%	১৬%	১২.৯%	১৩.১%	৩%
২০০৬-২০০৭[১৭]	৫৮.৯%	১২%	১২.৬%	১৩.৮%	২.৭%

প্রতি বছরে বাজেট দেশের আয় ব্যয়ের একটি অগ্রিম হিসাব প্রকাশ করা হয় জাতীয় সংসদে। প্রতিটি বাজেটেই থাকে খাতওয়ারি অর্থের উৎস এবং এর ব্যয়ের খাতওয়ারি বিবরণ। বাজেটে অর্থের উৎস এবং ব্যয়ের বিবরণ প্রকাশ করা হয় জনগণকে জানানোর উদ্দেশ্যে। কিন্তু প্রতিটি বাজেটে 'থোক বরাদ্দ' নামে যে বরাদ্দ থাকে তার সঠিক ব্যবহার অপ্রকাশিতই থেকে যায়। বাজেট 'থোক বরাদ্দ' উপজেলা উন্নয়ন, ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা, গ্রাম সরকারের মাধ্যমে উন্নয়ন, পৌরসভা উন্নয়ন, জেলা পরিষদ, সিটি করপোরেশন, দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বিশেষ থোক, অপ্রত্যাশিত ব্যয় ও খাতওয়ারি থোক হিসেবে প্রতি বছরের বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়। স্থানীয় পর্যায়ের হিসেবে উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ হয় বলে সবসময় তা স্থানীয় দলীয় ভিত্তিতেই ব্যয় হয়ে থাকে। খাতওয়ারি বরাদ্দ ছাড়াও ছিল খাতহীন বরাদ্দ।

২০০১-২০০২ অর্থবছর থেকে ২০০৬-২০০৭ অর্থবছরে অর্থাৎ অষ্টম জাতীয় সংসদ মেয়াদকালীন সময়ে বাজেটে শুধুমাত্র খাতহীন বরাদ্দই দেওয়া হয় ৫১৬০১ কোটি টাকা । ২০০২-০৩, ২০০৩-০৪ ও ২০০৪-০৫ অর্থবছরে বাজেটে খাতহীন থোক বরাদ্দ ছিল যথাক্রমে ৬৬১ কোটি ৭৪ লাখ, ৬৩১ কোটি ৭৪ লাখ, ৯৫৯ কোটি ৭৩ লাখ টাকা। আর ২০০৫-০৬ অর্থবছরে বাজেটে খাতহীন ও খাতওয়ারি থোক বরাদ্দ ছিল ৩,৬৩৬ কোটি এবং ২০০৬-০৭ অর্থবছরে বাজেটে খাতহীন ও খাতওয়ারি থোক বরাদ্দ ছিল ৪,১৩২ কোটি টাকা।[১৮] এই বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় থোক বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে প্রতি বছর। এই বৃদ্ধির মাত্রা সবচেয়ে বেশি ছিল ২০০৫-২০০৬ এবং ২০০৬-২০০৭ অর্থবছরে। অষ্টম সংসদের শেষ বাজেট এবং পরবর্তী নির্বাচনের পূর্বের বাজেট হিসেবে এখানে বরাদ্দের পরিমাণ বেশি ।

Dhaka University Institutional Repository

৫.২.৩ আইন প্রণয়ন

আইনের শাসন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় মুল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। যেকোনো দেশের আইনি কাঠামো ও দক্ষ আদালত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্থিতিশীল সরকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংসদের বহুবিধ কাজের মধ্যে আইন প্রণয়ন একটি অন্যতম প্রধান কাজ। সংসদীয় গণতান্ত্রিক দেশে যেকোনো আইনের চূড়ান্ত বৈধতার জন্য সংসদের অনুমোদনের প্রয়োজন। সংসদে আলোচনার পর কোনো বিল গৃহীত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতি দানের জন্য পাঠানো হয়। রাষ্ট্রপতির সম্মতি দানের পরেই তা অতিরিক্ত গেজেট আকারে প্রকাশিত হয় এবং আইনে পরিণত হয়।

বাংলাদেশ সংসদে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া ঃ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ এক কক্ষ বিশিষ্ট। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া অনেকটাই যুক্তরাজ্য ও ভারতীয় সংসদের আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ার মতো। আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনিত প্রস্তাবকে 'বিল' বলে। বিল সংসদ কর্তৃক গৃহীত হবার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের জন্য প্রেরণ করা হয়। রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের পর তা আইনে পরিণত হয়। বাংলাদেশে উত্থাপনের দিক দিয়ে বিলগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১. সরকারি বিল ঃ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী দ্বারা উত্থাপিত বিলকে সরকারি বিল বলে। সরকারি বিল উত্থাপনের বিষয়ে কার্যপ্রণালী বিধির ৭৫ বিধিতে বিস্তারিত উল্লেখ থাকে।

২. বেসরকারি বিল ঃ বেসরকারি সদস্য দ্বারা উত্থাপিত বিলকে বেসরকারি বিল বলে। বেসরকারি সদস্য বলতে সরকারি ও বিরোধী উভয় দলের পেছনের সারির সদস্য অর্থাৎ যেসব সদস্য মন্ত্রিসভা কিংবা বিরোধী দলের ছায়া মন্ত্রিসভার সদস্য নন তাদেরকে বোঝায়। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কার্যপ্রণালী- বিধির ৭২-৭৪ ধারায় উল্লেখ আছে।

অষ্টম সংসদে পাসকৃত বিল ঃ

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা যা জনগণের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করে। কিন্তু বাংলাদেশের আদালতগুলোতে বিপুলসংখ্যক মামলা জটের কারণে ন্যায়বিচার ও প্রচলিত আইনে পদ্ধতিগত জটিলতা দূরীকরণে অষ্টম জাতীয় সংসদের পাঁচ বছরের ২৩ টি অধিবেশনে প্রচলিত আইন সংশোধণ ও নতুন আইনসহ মোট ১৮৫টি আইন প্রণীত হয়। এর মধ্যে ৫৫ টি আইন মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব উদ্যোগে এবং অবশিষ্ট ১৩০ টি আইন সংশ্লিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রক্রিয়াকরণ করে জাতীয় সংসদের মাধ্যমে পাস করা হয়।[১৯] ২০০১ সালের অক্টোবর মাসে একটি অধিবেশনে পাচঁটি আইন পাস হয়, ২০০২ সালে চারটি অধিবেশনে ২৯টি, ২০০৫ সালে পাঁচটি অধিবেশনে ২৭ টি এবং ২০০৬ সালে চারটি অধিবেশনে ৪৭টি আইন পাশ হয়। এর মধ্যে একটি মাত্র বিল বেসরকারি বিল।[২০] অষ্টম জাতীয় সংসদের মধ্যবর্তী বছর এবং শেষ বছরে অর্থাৎ ২০০৩ ও ২০০৬ সালে সর্বাধিক আইন পাস হয়েছে । এই আইন বৃদ্ধির প্রবণতা ২০০৩ সালে বৃদ্ধি পেলেও ২০০৪ ও ২০০৫ সালে হ্রাস পায় এবং অষ্টম জাতীয় সংসদের শেষ বছরে অর্থাৎ ২০০৬ সালে পাসকৃত আইনের সংখ্যা ছিল ২০০৫ সালের প্রায় দ্বিগুণ।

অষ্টম জাতীয় সংসদে পাস হওয়া ১৮৫ টি আইনের মধ্যে জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শন (রহিতকরণ) বিল , ২০০২ ছিল একমাত্র বেসরকারি বিল। সরকারি দলের সংসদ সদস্য সামসুল আলম প্রামাণিক ২০০২ সালের ৭ মার্চ বিলটি উথাপন করেন যা ২১ মার্চ বেসরকারি হিসেবে সংসদে গৃহীত ও পাস হয়। পরবর্তীতে বেসরকারি বিল উথাপন সর্ম্পকে সংসদ নেতার পূর্বানুমতির প্রয়োজন হবে বলে আইনমন্ত্রীর চিঠি ও স্পিকার কর্তৃক তা সদস্যদের মধ্যে সরবরাহের মাধ্যমে সংসদ সদস্যদের অধিকার খর্ব করা হয়।

অষ্টম জাতীয় সংসদে যে ১৮৫ টি আইন পাস হয় তা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ১০৮ টি (প্রায় ৫৮%) আইন ছিল সংশোধনীমূলক আর ৭৭ টি (প্রায় ৪২) আইন ছিল নতুন আইন । ১০৮ টি সংশোধনীমূলক আইনের মধ্যে ভিআইপিদের বেতন ভাতাদি বৃদ্ধি সংক্রান্ত আইন ছিল ১৩টি।

অষ্টম জাতীয় সংসদের মেয়াদকালে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে কয়টি আইনের সংশোধন ও নতুন আইন পাস করা হয় তার মধ্যে 'The code of criminal procedure (amendment) Act, 2003' ' নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩', " আইন- শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাপ (দ্রুতবিচার) আইন, ২০০২, দ্রুতবিচার ট্রাইব্যুনালআইন, ২০০২ ছিল উল্লেখযোগ্য। ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডের অপরাধ ব্যতীত অন্য কোনো অপরাধে অভিযুক্ত কোন আসামিকে দন্ডাদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে উক্ত দন্ডাদেশ প্রদানের অব্যাবহিতপূর্ব ধারাবাহিক হাজতকালীন প্রদেয় দন্ড থেকে বাদ দেওয়ার বিধান থাকা সত্ত্বেও এ ক্ষমতাটি আদালতে স্বেচ্ছাধীন বিষয় ছিল বাধ্যতামূলক ছিল না। সংশেধিত এ কার্যবিধি আইনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছেঃ (১) দন্ডাদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে হাজতকালীন সম্পূর্ণ সময় প্রদেয় দন্ড হতে বাধ্যতামুলক বাদ

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়ার বিধান ও (২) হাজতকালীন প্রদেয় দন্ড হতে বেশি হলে হাজতকালীন সম্পূর্ণ সময়কে প্রদেয় দন্ড হিসেবে গণ্যক্রমে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাৎক্ষনিকভাবে মুক্তির আদেশ প্রদান। এছাড়াও পাস হওয়া অন্যান্য বিলের মধ্যে সংবিধান সংশোধন (চতুর্দশ সংশোধনী) বিল, দুর্নীতি দমন কমিশন বিল, গ্রাম আদালত বিল, ধূমপান নিয়ন্ত্রণ বিল, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (সংশোধন) বিল ইত্যাদি। আবার কয়েকটি বিল যেমন যৌথ দায়মুক্তি বিল, জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শন (রহিতকরণ) বিল, ২০০২ ইত্যাদি নিয়ে বেশ আলোচনা-সমালোচনা হয়।

অষ্টম জাতীয় সংসদের শেষ অধিবেশনের শেষ কার্যদিবসের এক দিন পূর্বে কোরাম ছাড়া চারটি বিল প্রধান বিরোধী দলসহ অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্যদের বিরোধীতার মুখে পাস হয়। বিলগুলোতে আপত্তি জানিয়ে বিরোধী দলের সদস্যরা বলেন, কোরাম ছাড়া বিল পাস সংবিধান বিরোধী। সকালের অধিবেশন শেষ হলে আধ ঘন্টার বিরতির পর ২টা ৫৫ মিনিটে বিকেলের অধিবেশন শুরু হয়। ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকারের সভাপতিত্বে পরিচালিত এ অধিবেশন বিকেল ৫টা ২৫ মিনিটে শেষ হয়। এ সময়ের মধ্যে 'শহীদ জিয়াউর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় বরিশাল বিল ২০০৬', 'রংপুর কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় বিল ২০০৫', 'সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বিল ২০০৬', এবং 'কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের বিশেষ সুবিধা বিল-২০০৬'। 'শহীদ জিয়াউর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় বরিশাল বিল ২০০৬' উপস্থাপনের জন্য অনুমতি দেওয়ার পরপরই প্রধান বিরোধী দলের কয়েকজনসহ কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সংসদ সদস্যরা কোরাম না থাকার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বিলগুলোতে আপত্তি জানিয়ে জনমত যাচাই বাছাইয়ের প্রস্তাব জানান। তবে তা কন্ঠভোটে নাকচ হয়ে যায়। কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সংসদ সদস্য কাদের সিদ্দিকী বলেন, "কোরাম ছাড়াই আইন কার্যক্রম চালিয়ে স্পিকার আপনি শেষ মুহূর্তে নজিরবিহীন ঘটনার সৃষ্টি করলেন। এই আইন পাস করলেও তা শুদ্ধ হবে না।"[২১] এছাড়া পঞ্চদশ অধিবেশনে ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ তারিখে 'পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গ নিরোধ বিল ২০০৪' পাস হয় কোরাম ছাড়াই।[২২] সংসদীয় আইন অনুযায়ী ৬০ জন সংসদ সদস্য ব্যতীত সংসদে কোরাম হয় না। কিন্তু ২২ ফেব্রুয়ারি সংসদে মাত্র ৪৮ জন সংসদ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় সংসদের অধিবেশনগুলোতে কোরাম সংকট এতই প্রকট যে, কোরামবিহীন সংসদে আইন পাস করতে হয়।

অষ্টম সংসদে ১৮৫টি আইন পাস হলেও বহুল আলোচিত 'নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ' ও ন্যায়পালের অফিস প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত 'ন্যায়পাল' আইন প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি। তবে

Dhaka University Institutional Repository

শুধুমাত্র কর প্রশাসনের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং করদাতাদের অভিযোগগুলো সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিকরণের লক্ষ্যে ২০০৫ সালের ১০ জুলাই জাতীয় সংসদে 'কর ন্যায়পাল আইন' পাস হয়। কর বিভাগের অপশাসন রোধ এবং দুর্নীতিসহ সংশ্লিষ্ট অভিযোগের তদন্ত করে প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাস হয় এই বিধান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদে [২৩] উল্লেখ আছে রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের লক্ষ্যে এবং ১১৫ [২৪] অনুচ্ছেদে বিচার বিভাগীয় পদে বা বিচারবিভাগীয় দায়িত্বপালনকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উক্ত উদ্দেশ্যে প্রণিত বিধিসমূহ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করবেন। সুপ্রীম কোর্টের সিভিল আপীল নম্বর ৭৯/১৯৯৯ এর রায়ে মহামান্য সুপ্রীমকোর্ট (আপীল বিভাগ)[২৫] কর্তৃক রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ বিষয়ে নির্দেশনা সত্ত্বেও তা বাস্তবে রূপদান দেওয়া সম্ভব করতে পারেনি অষ্টম জাতীয় সংসদ। ম্যাজিস্ট্রেটগণের নির্বাহী ও বিচার সংক্রান্ত কার্যাবলী পৃথকীকরণের লক্ষ্যে 'The Code of Criminal Procedure (Amendement) Act, 2006' শীর্ষক একটি বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপনের পর আইন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির বিবেচনাধীন ছিল।[২৬]

১৮০৯ সালে সুইডেনে সাংবিধানিক ও বাস্তবিকভাবে ন্যায়পালের অফিস স্থাপন ও এর কার্যকারিতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সাংবিধানিকভাবে ন্যায়পালের অফিস স্থাপন করে সুফল পেলেও বাংলাদেশে এখন পর্যন্ততা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ সংবিধানের ৭৭(১) অনুচ্ছেদে বলা আছে " সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালের পদ-প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান করিতে পারিবেন"। এ লক্ষ্যে ১৯৮০ সালে এ সংক্রান্ত একটি আইন পাস করা হয়। ২০০২ সালের ৬ জানুয়ারি সরকারি গেজেটের মাধ্যমে 'Ombudsman Act, 1980' কার্যকর করা হয়। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতির আলোকে ১৯৮০ সালে প্রণীত ন্যায়পাল আইনটিকে বর্তমান সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ করার লক্ষ্যে উক্ত আইনের পরিধি ও ন্যায়পাল নিয়োগ সংক্রান্ত পদ্ধতির ক্ষেত্রে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কিছু সংশোধনের প্রস্তাব এনে তা মন্ত্রিসভার নীতিগত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করে এবং ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০২ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে খসড়া বিলটি উপস্থাপন করা হলে বিলটি আরও পরীক্ষা ও পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশ প্রদানের জন্য একটি মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করা হয় তবে অষ্টম সংসদের সময় এই প্রতিবেদন পেশ করা হয়নি।[২৭]

Dhaka University Institutional Repository

দেশে ন্যায়পালের অফিস স্থাপন বিগত সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার থাকলেও এটি অবাস্তবায়নাধীনই থেকে যায়। তবে সপ্তদশ অধিবেশনে 'কর ন্যায়পাল বিল ২০০৫' পাস হয়। মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী 'কর ন্যায়পাল বিল ২০০৫' স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আকারে অবিলম্বে বিবেচনার জন্য গ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপনের পর বিলটির ওপর জনমত যাচাই ও বাছাই সম্পর্কিত সংশোধনী নোটিশের ওপর বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী, গোলাম হাবিব দুলাল এবং মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী সংসদে একটি বিবৃতি প্রদান করেন এবং বিলটি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের আনীত জনমত যাচাই ও বাছাইয়ের প্রস্তাব কণ্ঠভোটে নাকচ হয়। পরে বিলটি পাশ হয়। বাংলাদেশের দুর্নীতি বন্ধে কর ন্যায়পাল একটি বড় ভূমিকা পালন করে। কর বিভাগের অপশাসন রোধ এবং দুর্নীতিসহ সংশ্লিষ্ট অভিযোগের তদন্ত করে প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এই বিধান পাস হয়। কর ন্যায়পাল কর প্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত, যাচাই, বাছাই করে সরকার ও সংশ্লিষ্টদের কাছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করবেন। এক্ষেত্রে কর ন্যায়পাল যেকোনো সময় যেকোনো স্থানে তল্লাশি এবং যেকোনো তলব করতে পারবেন।

অষ্টম জাতীয় সংসদের মোট মেয়াদকালে আইন সংক্রান্ত কাজে মোট ১০৫ ঘণ্টা ৪২ মিনিট ২৭ সেকেন্ড সময় ব্যয় হয় বা মোট ব্যয়িত সময়ের প্রায় ৯%। এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ৩৩.৩৮%, সরকারি দলের সদস্যরা ৩.০৭% প্রধান বিরোধী ১৪.২%, অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্যরা ২০.৭৪% এবং অবশিষ্ট ২৮.৬১% সময় স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট উপস্থাপন, কণ্ঠ ভোট, যাচাই ও বাছাই প্রস্তাবকারীদের নাম পাঠ এবং ফ্লোর আদান-প্রদানে ব্যয় হয়। উল্লেখ্য, ২০০৫ সালের সংসদ অধিবেশনগুলো প্রধান বিরোধী দল বর্জন করায় বিল পাস সংক্রান্ত কাজে তারা কোনো সময় নেননি।

বিল পাসে জনমত যাচাই, বাছাই, আপত্তি ও সংশোধনী ঃ

১৮৫টি পাসকৃত আইনগুলোর মধ্যে ১৭১টি ওপর জনমত যাচাই ও বাছাইয়ের ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, শতকরা প্রায় ৯৩ ভাগ জনমত যাচাই ও বাছাইয়ের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য কর্তৃক আলোচনা ও মন্ত্রী কর্তৃক সংক্ষিপ্ত বিবৃতির পর সবগুলো প্রস্তাবই সংসদে কণ্ঠভোটে নাকচ হয়ে যায়। শতকরা ৫ ভাগ জনমত যাচাই ও বাছাইয়ের প্রস্তাব প্রদানকারী সংসদ সদস্য উত্থাপন করেননি অথবা অনুপস্থিত ছিলেন, আর শতকরা ২ ভাগ প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য প্রত্যাহার করেন।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম জাতীয় সংসদে পাস হওয়া ১৮৫টি বিলের মধ্যে যেসব বিলে বিরোধী দল সংশোধনী দেয় তার অধিকাংশ কণ্ঠভোটে নাকচ হয়ে যায়; গৃহীত বা আংশিক গৃহীত হয় কিছু সংখ্যক বিল। যে সংশোধনীগুলো গৃহীত হয় সেগুলোর পায় সবগুলোই ছিল বানান সংশোধনী সম্পর্কিত। অন্যদিকে সরকারি দল কর্তৃক প্রদত্ত ১০০ ভাগ সংশোধনই সংসদে গৃহীত হয়। বিরোধী দল কর্তৃক কয়েকটি আইনের ওপর আনীত সংশোধনী সংসদে উত্থাপিত হয়নি। এর কারণ হতে পারে তখন তারা তা উত্থাপন করতে আগ্রহ পান না। আবার অষ্টম সংসদে আইন প্রণয়নে জনগণের অংশগ্রহণ দেখা যায়নি।

কার্যপ্রণালী বিধির ১০০ বিধি অনুসারে সাধারণ জনগণ পিটিশন প্রদানের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় মতামত প্রদান করতে পারেন। কিন্তু এ প্রক্রিয়া সময় সাপেক্ষ বিধায় জনগণ এগিয়ে আসে না। জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সরকার সংবাদসহ ওয়েবসাইটে খসড়া আইন প্রকাশ করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মতামত চাইতে পারেন। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে খসড়া বিলের ওপর জনগণের মতামত গ্রহণের নিমিত্তে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় যা বাংলাদেশে অষ্টম সংসদে দেখা যায়নি।

৫.২.৪ রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় সংসদ নেতার ভাষণ

প্রত্যেক জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর প্রথম অধিবেশন এবং প্রত্যেক বছরের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় রাষ্ট্রপতি সংসদে লিখিত ভাষণ পাঠ করে শোনান। সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ সম্পর্কে আলোচনা করার বিধান রয়েছে।[২৮]

রাষ্ট্রপতির ভাষণ ঃ

অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী ভাষণ দেন ২০০১ এর ২৮ অক্টোবর। মোট ৪০ মিনিট স্থায়ী এ ভাষণের মুল বিষয় ছিল সুশাসন। এ সরকারকে তিনি দ্রুততার সাথে আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনীতিতে প্রাণসঞ্চারের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহবান জানান। তিনি আইনের শাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিচার বিভাগকে একটি সুপরিকল্পিত কর্মসূচির ভিত্তিতে নির্বাহী বিভাগ থেকে আলাদা করে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার আহবান জানান। সাম্প্রতিক অতীতে বাংলাদেশের দুর্নীতির ভয়াবহ বিস্তার ঘটেছে উল্লেখ করে তিনি সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের ১০০ দিনের কর্মসূচিতে বিগত সরকারের আমলে দুর্নীতি ও অনিয়ম সম্পর্কে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বিরোধী দলকে

Dhaka University Institutional Repository

সংসদে যোগদানের আহবান জানিয়ে তাদেরকে সাংবিধানিক দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার আহবান জানান।[২৯]

অনুরূপভাবে ২০০২ সালের ৩১ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দেন। মোট ৪৯ মিনিট স্থায়ী তার ভাষণেও মূল বিষয় ছিল সুশাসন। সন্ত্রাস, দুর্নীতি, মানবাধিকার, অর্থনীতি, সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সৃষ্টি, দারিদ্র্য দূরীকরণ ইত্যাদি বিষয় তার গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পায়। বিদ্যুৎ, গ্যাস, রাস্তাঘাটসহ নানারকম অবকাঠামো উন্নয়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, পরিবেশ সংরক্ষণ, কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াবলী ও রাষ্ট্রপতির ভাষণে স্থান পায়।[৩০]

২০০৩ সালের ২৬ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি সংসদে পুনরায় ভাষণ দেন। সন্ধ্যা ৬-৪৪ মিনিটে শুরু হওয়া ৫৬ মিনিট স্থায়ী ভাষণের মূল বিয়বস্তু ছিল সুশাসন। মোট ২৪টি কার্যদিবসের মধ্যে ১৮ কার্যদিবসে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা হয়। মোট ১৩ জন সদস্য এ আলোচনায় অংশ নেন। রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও এর ওপর আলোচনায় মোট ব্যয় হয় ২৭ ঘণ্টা ৫৩ মিনিট যা ষষ্ঠ অধিবেশনে ব্যয়িত মোট সময়ের ৩০.৯%।[৩১]

২০০৪ সালের ১৮ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৬-১২ মিনিট গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির সংসদে ভাষণ দান করেন।[৩২]

২০০৫ সালে ৩১ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৭:০৬ মিনিটে রাষ্ট্রপতি প্রায় ৫৫ মিনিট সংসদে ভাষণ দান করেন। অষ্টম জাতীয় সংসদের পঞ্চদশ অধিবেশন এবং ২০০৫ সালের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় বিরোধী দলের অধিবেশন বর্জন, কালো পতাকা মিছিল সহকারে স্পিকারের কার্যালয় অবরোধ ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের মাধ্যমে। সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়ার মর্মান্তিক হত্যাকে নিন্দা জানিয়ে শোক প্রস্তাবের ওপর আলোচনার পর রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা স্থগিত করা হয়। অধিবেশন মুলতুবি করতে প্রধান বিরোধী দলের প্রস্তাবে সরকারি দল রাজি না হওয়ায় তারা বিকেলে কার্য-উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক থেকে ওয়াক আউট করে রাষ্ট্রপতির ভাষণসহ অধিবেশন বর্জন করে। এছাড়া জাতীয় পার্টিসহ অন্যান্য বিরোধী দল সংসদের শুরুতে যোগদান করলেও শোক প্রস্তাবের পর রাষ্ট্রপতির ভাষণ বর্জন করে।[৩৩]

Dhaka University Institutional Repository

২০০৬ সালে ২৩ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৬.১৩ মিনিটে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি প্রায় ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট সংসদে ভাষণ দান করেন।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা ঃ

২০০১ সালে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সরকারি দলের সদস্য সংখ্যা অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্য সংখ্যার প্রায় পাঁচ গুণ। প্রাপ্ত সময়ের প্রেক্ষিতে তুলনা করলে দেখা যায় সরকারি দলের প্রাপ্ত সময় অন্যান্য বিরোধী দলের প্রায় চার গুণ।

২০০২ সালে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর সরকারি দলের সদস্য এবং অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্যদের প্রাপ্ত সময়ের অনুপাত প্রায় ১১ঃ ১।

২০০৩ সালে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও এর ওপর আলোচনায় ব্যয়িত সময় মোট সময়ের ৩০.৯%। আর সরকারি, প্রধান বিরোধী ও অন্যান্য বিরোধী দলের ক্ষেত্রে ব্যয়িত এই সময়ের অনুপাত ৮.১ ঃ ৬.৩ ঃ ১।

২০০৪ সালে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর যারা আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন তাদের ৯১.৭% সদস্য সরকারি দলের। অন্যদিকে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সরকারি (মন্ত্রীসহ), প্রধান বিরোধী ও অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্যদের অনুপাত ১৫.৭ ঃ ০ ঃ ১।

২০০৫ সালে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীগণসহ মোট ৫৮ জন সংসদ সদস্য অংশগ্রহণ করেন, যাদের মধ্যে ছিলেন ৮৬.২% সরকারি দলের সদস্য এবং ১৩.৮% অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্য। রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় মোট ব্যয় হয় ১৮ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট ৫ সেকেন্ড যার মধ্যে সরকারি দলের সদস্যরা নেন ১৫ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ১৬ সেকেন্ড এবং অন্যান্য বিরোধী দলের সদ্যরা নেন ২ ঘণ্টা ১ মিনিট ৪৩ সেকেন্ড। অবশিষ্ট ৫৫ মিনিট ৬ সেকেন্ড স্পিকার ও ফ্লোর আদান-প্রদানে ব্যয় হয়। প্রধান বিরোধী দল সংসদ বর্জন করায় তাঁরা এই আলোচনাতেও অংশগ্রহণ করেনি।[৩৪] স্পিকার যখন কোনো সদস্যকে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার আহবান জানান, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে সময় বেঁধে দেন। কিন্তু অধিকাংশ সদস্যই নির্ধারিত সময় অপেক্ষা বেশি সময় নিয়ে কথা বলেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ ঃ

অষ্টম জাতীয় সংসদে সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিভিন্ন সময় ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণে তিনি যেসব বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন সেগুলো হচ্ছে সংসদ সদস্যদের ঐচ্ছিক তহবিল বৃদ্ধি, বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের সমালোচনা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, ছাত্র রাজনীতি, আইনের শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, লোকসানি প্রতিষ্ঠান যেমন আদমজী জুট মিল বন্ধ ঘোষণা করার প্রেক্ষাপট, সংসদ কার্যকর করতে বিরোধী দলের ভূমিকা, অর্থনীতি, স্থানীয় সরকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ টেলিযোগাযোগ, তথ্য প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি ও সাফল্য, মুক্তিযোদ্ধা, কৃষক-শ্রমিক, পেশাজীবীদের উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম, স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন, দেশব্যাপী বোমা হামলা, নির্বাচনী সংস্কার প্রস্তাব ইত্যাদি। ভাষণে তিনি স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, মন্ত্রিসভার সদস্য এবং চীফ হুইপ, অন্যান্য হুইপ, সংসদ সদস্য, বিরোধী দল ও বিভিন্ন জোটের নেতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।[৩৫]

বিরোধী দলের সদস্যদের সহযোগিতা কামনা করে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে দেশকে এগিয়ে নেয়ার দঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। আত্মমর্যাদাশীল ও গর্বিত দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের এক সঙ্গে কাজ করার আহবান জানান। বিশেষ করে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরও উন্নতি করার জন্য তাদের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে বিশ্বাস করে না। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হলে দেশে শান্তি ফিরে আসবে এবং বিনিয়োগ বাড়বে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতি ও ছাত্রদের ব্যবহার করে শিক্ষকদের রাজনীতির বিষয় উল্লেখ করে তিনি, ছাত্র রাজনীতি সর্বদলীয় সিদ্ধান্ত মতে বন্ধ করা প্রয়োজন। শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করতে সবার সহযোগিতা প্রয়োজন বলে তিনি ভাষণে উল্লেখ করেন। বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের সমালোচনা করে বলেন, একজন সংসদ সদস্যকে জামিন না দেওয়ার ঘটনাকে ইস্যু করা এবং তা নিয়ে সরকারের সঙ্গে দর কষাকষি ঠিক নয়। তিনি বলেন, সরকার আইনের শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে।[৩৬]

২০০২-২০০৩ অর্থবছরের বাজেটের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অর্থমন্ত্রী একটি সাহসী বাজেট উপহার দিয়েছেন। জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিকভাবে দেশ এক কঠিন সময় পার করছে। এছাড়া একটি বিধ্বস্থ অর্থনীতি নিয়ে আট মাসের মাথায় বাজেট দেয়া দুরুহ কাজ। আত্মনির্ভরশীলতা

Dhaka University Institutional Repository

অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে এ বাজেট দেয়া হয়েছে এর সুফল যাতে সবাই পায় তার জন্য সবার সহযোগিতা চান তিনি।[৩৭]

অষ্টম জাতীয় সংসদের একাদশ অধিবেশনের সমাপ্তি লগ্নে সংসদ নেতা সংসদে সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণে তিনি রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর সরকার ও বিরোধী দলের যে সদস্যরা অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানান। বিরোধী দলকে সংসদে কথা বলতে দেয়া হয় না এ অভিযোগ সম্পর্কে তিনি বলেন, এই অভিযোগ সঠিক নয়। তিনি বিরোধী দলের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর সংসদে বক্তব্য না দিয়ে রাস্তায় হুমকি-ধমকি দিয়ে গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগ করেন।[৩৮]

সংসদে নারী আসন বৃদ্ধি প্রসঙ্গে সংসদ নেতা বলেন, সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে বিএনপি নারী-আসন সংখ্যা বাড়ানোর নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণ করেছে। অথচ বিরোধী দল এগিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। তিনি বলেন, সরাসরি নির্বাচনে নারীদের কোনো বাধা নেই। তিনিও সরাসরি নির্বাচনে জিতে এসেছেন। তিনি মনে করেন এখনো নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের প্রয়োজন রয়েছে। সকল দলকে সম্পৃক্ত করতে আনুপাতিক হারে নারী আসন বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি তাঁর সরকারের আড়াই বছরের শাসনামলে অর্থনীতি, স্থানীয় সরকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, টেলিযোগাযোগ, তথ্য-প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি ও সাফল্য এবং মুক্তিযোদ্ধা, কৃষক শ্রমিক-পেশাজীবীদের উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রসঙ্গে তিনি দুটি জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত বিগত সরকারের আমলের বাজারদরের প্রতিবেদনের তথ্যের সঙ্গে বর্তমান বাজারদর তুলে ধরে বলেন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয়নি। তিনি দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ড ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনায় নেতিবাচক ভূমিকার জন্য পত্র-পত্রিকার সমালোচনা করেন। তিনি অভিযোগ করেন অনেক পত্রপত্রিকা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করে না। তিনি আরও বলেন, উত্তরবঙ্গে মঙ্গা পরিস্থিতি মোকাবেলায় ও নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ টর্নেডোয় সরকার মানুষকে ব্যাপক সাহায্য দিয়েছে। তিনি প্রধান বিরোধী দলকে দেশের উন্নয়নের জন্য এক সঙ্গে কাজ করে যাওয়ার আহবান জানান।[৩৯]

২০০৪ সালের বাজেট সম্পর্কে বিরোধী দলীয় নেতার বক্তব্যের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, চলতি অধিবেশনে ৫৮ হাজার কোটি টাকার যে বাজেট পাস করা হয়েছে তা গরিব মারার নয়, গরিবি দূর করার বাজেট; উন্নয়ন ও জনকল্যাণের বাজেট । তিনি বলেন, কিভাবে দারিদ্র্য দূর করা যায় এ

Dhaka University Institutional Repository

বাজেটে সেই পথ দেখানো হয়েছে। দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকার মানব সম্পদ উন্নয়নের পদক্ষেপ নিয়েছে। মানবসম্পদ উন্নয়নে সবাইকে শিক্ষিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, সন্ত্রাস-দুর্নীতি বিগত সরকারের আমলে বিস্তার লাভ করে। তারা যেভাবে সন্ত্রাস মদদ ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছিল, তা নজিরবিহীন। সারাদেশে প্রতিটি এলাকায় গডফাদার সৃষ্টি করে তাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছে। কিন্তু তাদের সরকার বলেছে, সন্ত্রাস যেই করবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিরোধী দলীয় নেতা বলেছিলেন আর হরতাল করবেন না, এখন ইস্যু ছাড়াই একের পর এক হরতাল করছেন। বাসে আগুন দিয়ে মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করা হচ্ছে।[৪০]

দুর্নীতি দমন ও দারিদ্র্য প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করা হয়েছে। তাদের কার্যক্রম শুরু হচ্ছে। তিনি বলেন, দুর্নীতি যেই করবে আশ্রয় না দিয়ে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলেন, বিরোধী দল হতাশা, বেদনা এবং মনোকষ্টে ভুগছে। এ জন্য মিথ্যা ও বিভ্রান্তি দিয়ে মানুষকে ভারাক্রান্ত করতে চায়। কিন্তু দেশের মানুষ জানে বলে তাদের কথায় কোন গুরুত্ব দিচ্ছে না। বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষ খেয়ে-পরে ভালভাবে বেঁচে আছে। মানুষ চাকুরি করছে। ছেলে মেয়ে স্কুলে যাচ্ছে। কেউ না খেয়ে নেই। দেশের একের পর এক উন্নতি হচ্ছে, প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। তিনি বলেন, দেশের উন্নয়নে আজ ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। তা না হলে দেশকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। তাই তারা সমস্যা চিহ্নিত করেছেন। তিনি দারিদ্র্য ও জনসংখ্যাকে দেশের অন্যতম সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেন। তিনি বলেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঠেকাতে না পারলে উন্নয়ন করা যাবে না; কল্যাণ সম্ভব হবে না। তিনি সংসদ-সদস্যদের বন্যাকবলিত এলাকায় গিয়ে অসহায় মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ানোর আহবান জানান।[৪১]

প্রধান বিরোধী দলের সংসদ বর্জন ও সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রসঙ্গে বলেন, প্রধান বিরোধী দল সংসদে এসে তাদের দায়িত্ব পালন না করে আন্দোলনের নামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টায় তৎপর রয়েছে। প্রধান বিরোধী দল হরতাল, ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে জনগণের জীবন বিপন্ন, রাষ্ট্রীয় ও জনগণের সম্পদ ধ্বংস করে চলছে। তাদের এ আচরণ গণতন্ত্র সম্মত হয়। তিনি সংসদকে কার্যকর ও গতিশীল করে তোলার জন্য প্রধান বিরোধী দলকে সংসদে আসার আহবান জানান।[৪২]

অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, চারদলীয় জোট সরকার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাফল্য লাভ করেছে। অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। উন্নয়নে নতুন গতি সঞ্চার হয়েছে। জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের সাফল্য তুলে ধরা হয়েছে। তিনি বলেন, গত তিন বছরে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক দুর এগিয়ে গেছে। দেশের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান সরকারের দূরদর্শিতার কারণে বিভিন্ন দেশ বিপুল পরিমাণ বিনোয়োগে এগিয়ে এসেছে। এই বিনিয়োগের পরিমাণ হবে ৮ বিলিয়ন ডলার। এসব বিনিয়োগের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি আর এক ধাপ এগিয়ে যাবে। দ্রুত কর্মসংস্থান বাড়বে, উৎপাদন ও রপ্তানি বাড়বে। ফলে দারিদ্র্য কমে আসবে। তাই উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত রাখতে হলে সরকারের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।[৪৩]

হবিগঞ্জের বৈদ্যের বাজারে গ্রেনেড হামলা ও পবরর্তীতে দেশব্যাপি বোমা বিস্ফোরণ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে দোষী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিঠি গঠনসহ তদন্তে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাও চাওয়া হয়েছে। তিনি দেশকে গড়ে তোলা ও সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সকল সংসদ-সদস্যকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান।[৪৪]

১৭ আগস্ট রাজধানী ঢাকাসহ দেশের ৬৩টি জেলায় কাছাকাছি সময়ে চার'শরও বেশি বোমা বিস্ফোরণের বিষয়ে তিনি বলেন, বোমা বিস্ফোরণ বাংলাদেশে নতুন নয়। এ সমস্যা বিগত সরকারের আমল থেকে শুরু হয়েছে। তবে সেসব ঘটনায় খুবই দুঃখজনক দিকটি হচ্ছে-এ অপকর্মটি যারা করেছে তারা ব্যবহার করেছে পবিত্র ধর্ম, শান্তির ধর্ম, সম্প্রীতির ধর্ম ইসলামের নাম। তিনি আরও বলেন, তাদের সরকার কখনও কোনো চাপের কাছে নত কিংবা সন্ত্রাসের কাছে পরাভূত হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, ১৭ আগস্টের বোমাবাজদের গ্রেফতার ও চিহ্নিত করার কাজকে সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। বিষয়টির সঙ্গে দেশের উন্নয়ন, অগ্রগতি, নাগরিক জীবনের শান্তি-স্থিতি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রশ্নও যুক্ত। তিনি বলেন হামলায় জড়িতদের একটি অংশ ধরা পড়ছে। তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী মূল সংগঠন ধরার চেষ্টা চলছে। তিনি বোমা হামলার জন্য বোমা মজুদ, বোমা প্রস্তুত, বোমা তৈরির রসদ সংগ্রহের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করেন। এমন ব্যবস্থা সমর্থন দেওয়ার জন্য তিনি সকল রাজনৈতিক দল, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংগঠনের প্রতি আহবান জানান। এই পটভূমিতে তিনি জাতীয় সংসদের প্রধান বিরোধী দলকে অধিবেশনে যোগদানের আহবান জানান।[৪৫]

গণতন্ত্র ও বিরোধী দলের সংস্কার প্রস্তাব প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এদেশের বার বার গণতন্ত্রের ওপর আঘাত এসেছে। ১৯৭৫ সালে এক দলীয় শাসন চালু করে গণতন্ত্র হত্যা করা হয়েছিল। শহীদ

Dhaka University Institutional Repository

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। সংস্কার প্রস্তাব সম্পর্কে তিনি বিরোধী দলকে নিঃশর্তভাবে আলোচনায় বসার আহবান জানান। তিনি আওয়ামী লীগ সরকারের আমলের বর্ণনা দিয়ে বলেন যে, এ সময়গুলোতে দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ড বাধাগ্রস্থ হয়। বিএনপি যখনই সরকার গঠন করে তখনই উন্নয়ন হয়। বাংলাদেশ এখন সব দিক থেকেই অনেক দূর এগিয়ে গেছে। দেশ-বিদেশে তা প্রশংসিত হচ্ছে। পরিশেষে তিনি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তাসহ সকল খাতে ব্যাপক উন্নয়নের কথা উল্লেখ করেন।[৪৮]

বিরোধী দলীয় সংসদ নেতার ভাষণ ঃ

অষ্টম সংসদে বিরোধী দলীয় সংসদ নেতা শেখ হাসিনা বিভিন্ন সময় বিশেষ করে বিভিন্ন অধিবেশনের সমাপ্তি লগ্নে ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রাম, গণতান্ত্রিক আন্দোলন, অষ্টম সংসদে বিরোধী দলের অধিকার ক্ষুণ্ন, মুক্তিযুদ্ধ দায়মুক্তি, জোট সরকারের অনিয়ম, অত্যাচার, দলীয়করণ, দুর্নীতি, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে সংস্কার প্রস্তাবসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেন। ভাষণে তিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম, গণতান্ত্রিক আন্দোলন, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন এবং ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যারা নিহত হয়েছেন তাদের সকলকে শ্রদ্ধা জানান। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, সকল সংসদ-সদস্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ধন্যবাদ জানান।

বিরোধী দলের অধিকার ক্ষুণ্ন প্রসঙ্গে বিরোধী দলীয় নেতা বলেন, সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির ভাষণে ধন্যবাদ প্রস্তাবের ওপর সংশোধনী আনা হয়। কিন্তু সংশোধনী প্রস্তাবগুলো উত্থাপন না করতে দিয়ে বিরোধী দলের যে অধিকার, সেটা ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। ১৯৭২ সালে রক্ষীবাহিনীকে দায়মুক্তি দেওয়া হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী যে কথা বলেছেন তা সঠিক নয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। মুক্তিযুদ্ধে দায়মুক্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সেনাবাহিনীসহ সারা বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ সেদিন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। সুতরাং যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের জন্যই তখন দায়মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। যেকোনো দেশেই প্যারা-মিলিশিয়া বাহিনী থাকে। সেই লক্ষ্যেই রক্ষীবাহিনী করা হয়েছিল। রক্ষীবাহিনীকে সেনাবাহিনীর সাথে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। তিনি বলেন, রক্ষীবাহিনী যদি খারাপই হয়ে থাকে তাহলে

Dhaka University Institutional Repository

তাদের এখন পদোন্নতি দেয়া হচ্ছে কেন? প্রধানমন্ত্রী তার বক্তৃতায় বিরোধী দলীয় নেতাকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করেছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।[৪৭]

২০০৪ সালের বাজেট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এবারের জাতীয় বাজেট গরিব মারার বাজেট। সর্বস্তরের মানুষের ওপর করের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার এ বাজেট জনগণকে শোষণের হাতিয়ার ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল ভিত্তি হচ্ছে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। এই ঘোষণাপত্রের ভিত্তি হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা। আর এই ঘোষণাপত্রের ভিত্তিতেই আমাদের স্বাধীনতা, পবিত্র সংবিধান। যদি কেউ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রকে অস্বীকার করে তাহলে জাতীয় সংসদ থাকে না, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার থাকেন না, অর্থাৎ স্বাধীনতাই থাকে না। দুর্নীতি, দ্রব্যমুল্যের উর্ধ্বগতি ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জোট সরকার দুর্নীতিকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে। চাল, ডাল, তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উর্ধ্বমুল্যে জনজীবনে নাভিশ্বাস উঠেছে। ঘরে বাইরে মানুষ চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে বাস করছে। তিনি বলেন, জোট সরকার ব্যর্থতার দায় মেনে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি ক্ষমতা ছেড়ে দেবে দেশবাসীর ততই মঙ্গল হবে। বাংলাদেশের জনগণ বিএনপি-জামায়াত জোটের দুঃশাসন থেকে মুক্তি চায়।[৪৮] অষ্টম জাতীয় সংসদের একবিংশতিতম অর্থাৎ ২০০৬ সালের দ্বিতীয় অধিবেশনের সমাপ্তি লগ্নে বিরোধী দলীয় নেতা সমাপনী ভাষণে বিদ্যুৎ ও পানি সম্পদ, জোট সরকারে অনিয়ম, অত্যাচার, দলীয়করণসহ অন্যান্য বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন।[৪৯]

অষ্টম সংসদের শেষ অধিবেশনের (ত্রয়োবিংশতিতম অধিবেশন) সমাপ্তি লগ্নে বিরোধীদলীয় নেতা সংসদে সমাপনী ভাষণে সুষ্ঠু ও নিরাপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে সংস্কার প্রস্তাব মেনে নেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে আহবান জানান। তিনি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, তাঁরা (অষ্টম সংসদে প্রধান বিরোধী দল) ভবিষ্যতে ক্ষমতায় আসার সুযোগ পেলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম হ্রাস, বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধান এবং বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবেন। [৫০]

৫.২.৫ অনির্ধারিত ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয় উত্থাপন

জাতীয় সংসদে বৈঠক চলাকালীন সদস্যদের আচরণ সম্পর্কে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে বিস্তারিত বলা থাকলেও দেখা যায়, অনির্ধারিত বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে সংসদ সদস্যরা নিজ দলের নেতা বা নেত্রীর অতিরিক্ত প্রশংসা করেন, বিরোধী দলীয় নেতা বা নেত্রীর সমালোচনা করেন,

Dhaka University Institutional Repository

আবার কখনও বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন বিষয়ের অবতারণা করেন বা প্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে যান, যা অনেক সময় উক্ত বিধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে না। সদস্যরা পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন এবং এর ফলে অনেক সময় অনির্ধারিত বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

অষ্টম সংসদে পয়েন্ট অব অর্ডার বা অনির্ধারিত আলোচনা ঃ

অষ্টম জাতীয় সংসদে পয়েন্ট অব অর্ডার বা অনির্ধারিত আলোচনায় প্রায় ৯১ ঘণ্টা সময় ব্যয় হয়, যা মোট ব্যয়িত সময়ের শতকরা প্রায় ৮ ভাগ। বছরওয়ারি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০০৬ সালে সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ প্রায় ৩৪ ঘণ্টা সময় অনির্ধারিত আলোচনায় ব্যয় হয়। অক্টোবর ২০০১ থেকে ২০০২ পর্যন্ত প্রায় ১৭ ঘণ্টা ১৫ মিনিট, ২০০৩ সালে প্রায় ১০ ঘণ্টা ১৯ মিনিট, ২০০৪ সালে প্রায় ২১ ঘণ্টা ও ২০০৫ সালে ৮ ঘণ্টা ৫ মিনিট সময় অনির্ধারিত বিষয়ে সংসদে আলোচিত হয়।

দলীয় প্রশংসা ঃ

প্রশ্নোত্তর পর্ব, জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে নোটিশের ওপর আলোচনায়, রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় ও বাজেট আলোচনার ওপর সংসদ সদস্যরা কথা বলতে গিয়ে নিজ দলের নেতা বা নেত্রীর প্রশংসা করে থাকেন যা প্রাসঙ্গিক বিষয়ের সাথে সম্পর্কহীন। ২০০৩ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত অধিবেশনে সদস্যরা নিজ নিজ দলের নেতা বা নেত্রীর প্রশংসা করেছেন ১০৫৮ বার। প্রশংসার ঘটনা সবচেয়ে বেশি হয়েছে সরকারি দলের সদস্যদের দ্বারা, যা মোট ঘটনার ৭৪%। দলীয় প্রশংসা সবচেয়ে বেশি ঘটে বাজেট এবং রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা ।

সারণি ৫.৫ ঃ জাতীয় সংসদ দলীয় প্রশংসা

দলের নাম	বছর ভিত্তিক (সংখ্যা)				
	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬	মোট
সরকারি দল	১০১	৪০৪	১৮৮	৯০	৭৮৩
প্রধান বিরোধী	৫	১৫৩	সংসদ বর্জন	২০	১৭৮
দল অন্যান্য	৯	৬৯	১৪	৫	৯৭
বিরোধী দল মোট	১১৫	৬২৬	২০২	১১৫	১০৫৮

উৎস ঃ গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকরণে অষ্টম জাতীয় সংসদ (২০০১ - ২০০৬) টিআইবি, ২০১১।

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধীদের সমালোচনা ঃ

জাতীয় সংসদে বিরোধী ও সরকারি দল একে অপরের গঠনমুলক সমালোচনা করবে এটাই সংসদীয় গণতন্ত্রের সংস্কৃতি। কিন্তু দেখা যায়, সদস্যরা বিভিন্ন ইস্যুতে কথা বলতে গিয়ে বিরোধী দলীয় নেতা বা নেত্রীর সমালোচনা করে থাকেন যা প্রাসঙ্গিক বিষয়ের সাথে সম্পর্কহীন। ২০০৩ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত সংসদ সদস্যরা বিরোধী পক্ষের নেতা বা নেত্রী অর্থাৎ সরকারি দলের সদস্যরা বিরোধী দলের সদস্যদের আর বিরোধী দলের সদস্যরা সরকারি দলের সদস্যদের সমালোচনা করেছেন ৯৯০ বার। সমালোচনার ঘটনা সবচেয়ে বেশি হয়েছে সরকারি দলের সদস্যদের দ্বারা, যা মোট ঘটনার ৭১.০১%।

সারণি ৫.৬ ঃ জাতীয় সংসদে সমালোচনা

দলের নাম	বছর ভিত্তিক (সংখ্যা)				
	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬	মোট
সরকারি দল	১৭২	৩৩৭	১০৭	৮৭	৭০৩
প্রধান বিরোধী দল	৩৮	৯৯	সংসদ বর্জন	৬২	১৯৯
অন্যান্য বিরোধী দল	৫	৫৫	২১	৭	৮৮
মোট	২১৫	৪৯১	১২৮	১৫৬	৯৯০

উৎস ঃ গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকরণে অষ্টম জাতীয় সংসদ (২০০১ - ২০০৬) টিআইবি, ২০১১।

অপ্রাসঙ্গিক বিষয় ঃ

সংসদ অধিবেশনে মাঝে মাঝে সংসদ সদস্যরা একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর বক্তব্য দিতে গিয়ে দলীয় প্রশংসা এবং বিরোধীদের সমালোচনা ছাড়াও এমন বিষয়ের অবতারণা করেন যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কার্যপ্রণালী-বিধির ২৭৩ বিধি অনুযায়ী কোনো সদস্য অপ্রাসঙ্গিক কথা বলতে থাকলে বা নিজ যুক্তি বা বিতর্কে ব্যবহৃত অন্য সদস্যদের যুক্তিগুলির পুনরাবৃত্তি করতে থাকলে, স্পিকার উক্ত সদস্যের আচরণের প্রতি সংসদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর তাঁকে বক্তব্য প্রদান বন্ধ করার নির্দেশ দিতে পারেন এবং এরূপ অবস্থায় উক্ত সদস্য তাঁর আসনে বসে পড়বেন। স্পিকারের নির্দেশের পরও অনেক সময় সংসদ সদস্যরা আসনে না বসে বক্তব্য দিতে থাকেন। ২০০৩ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত অষ্টম সংসদের সময়কালে সদস্যগণ অপ্রসাঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করেছেন ৯৬২ বার। এ ধরনের ঘটনা সবচেয়ে বেশি হয়েছে সরকারি দলের সদস্যদের দ্বারা, যা মোট ঘটনার ৭০.৭৯%। উল্লেখ্য, অপ্রাসঙ্গিক বিষয় উত্থাপনের ঘটনা সাধারণত বেশি ঘটে বাজেট আলোচনায়।

Dhaka University Institutional Repository

সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সরকারি দলের পাশাপাশি বিরোধী দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে বিরোধী দল জাতীয় সংসদে সরকারি দলের বিভিন্ন কার্যক্রমের গঠনমূলক সমালোচনা, প্রশংসা ও বিরোধিতার মাধ্যমে একদিকে সরকারি দলের স্বেচ্ছাচারিতা রোধ করে, অন্যদিকে প্রাণবন্ত ও কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শুধু সমালোচনাই নয়, জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ক্ষমতাসীন দলকে সহযোগিতা করা বিরোধী দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ ভূমিকা পালন করতে কোনো কোনো সময় বিরোধী দল প্রতিবাদের অংশ হিসাবে সংসদ অধিবেশন থেকে ওয়াকআউট বা বয়কট করে থাকে যা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির একটি অংশ। সংসদকে কার্যকর করতে আরেকটি পূর্বশর্ত হচ্ছে সংসদ সদস্যদের সংসদ অধিবেশনে নির্ধারিত সময়ে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। কিন্তু অষ্টম সংসদে সংসদ সদস্যদের অনুপস্থিতি, বিরোধী দলের সংসদ বর্জন ও কোরাম সংকটের মাত্রা এত বেশি ছিল যে সংসদ অধিবেশন মাঝপথে মুলতবি ঘোষণা করতে হয়।

৫.২.৬ ওয়াকআউট

ওয়াকআউট বলতে যেকোনো সংসদ সদস্য কর্তৃক একক বা দলীয়ভাবে সাময়িক সময়ের জন্য সংসদ কক্ষ ত্যাগ করাকে বোঝায়। সাধারণত বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা বিভিন্ন দাবি বা কোনো ঘটনা বা বক্তব্যের প্রতিবাদে ওয়াকআউট করে থাকেন। সংসদীয় গণতন্ত্রে ওয়াকআউট প্রত্যাশিত না হলেও রাজনৈতিক ও সংসদীয় সংস্কৃতি হিসেবে গণ্য করা হয়। বিরোধী দল জনগণের কল্যাণে সংসদে কথা বলতে গিয়ে সরকারি দলের কার্যক্রম বা যেকোনো বিষয়ে বিরোধিতা করে সংসদ কক্ষ সাময়িক ত্যাগ করতে পারে যা ওয়াকআউট নামে অভিহিত তবে তা অবশ্যই যৌক্তিক কারণে হওয়া বাঞ্ছনীয়। অষ্টম সংসদে বিরোধী দল মোট ৯৯ বার ওয়াকআউট করে যার মধ্যে প্রধান বিরোধী দল ৭৩ বার, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ ১৫ বার, জাতীয় পার্টি (এরশাদ) ৬ বার, স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যরা ৪ বার এবং বিকল্প ধারা ১ বার ওয়াকআউট করে।

প্রথম অধিবেশনে ঃ কোনো ওয়াকআউটের ঘটনা ঘটেনি। উল্লেখ্য, প্রধান বিরোধী দল প্রথম অধিবেশনে সংসদ বর্জন করলেও অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্যরা সংসদে উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় অধিবেশনে ঃ মোট তিন বার ওয়াকআউটের ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ দুই দিনে দুই বার এবং স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য একবার ওয়াকআউট করেন। উল্লেখ্য, প্রধান বিরোধী দল

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধিবেশনেও সংসদ বয়কট বা বর্জন করে। যে কারণগুলোতে ওয়াকআউট হয় সেগুলো ছিল- কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সংসদ সদস্য কাদের সিদ্দিকী (বীর উত্তম) কর্তৃক দাবীকৃত পয়েন্ট অব অর্ডার মাননীয় স্পিকার বিধি সম্মত নয় বলে নাকচ করে দেওয়া; কার্যপ্রণালী বিধি লংঘনের অভিযোগ এবং জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শন (রহিতকরণ) বিল, ২০০২ এর ওপর জনমত যাচাই ও বাছাইয়ের প্রস্তাব গৃহীত না হওয়া।

তৃতীয় অধিবেশনে ঃ মোট পাঁচ বার ওয়াকআউটের ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ চার বার এবং জাতীয় পার্টি (এরশাদ) এক বার ওয়াকআউট করে। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের বিরুদ্ধে মামলা মোকদ্দমা করে হয়রানির প্রতিবাদে, সংসদ সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকে পয়েন্ট অব অর্ডারে বক্তব্য প্রদানে অপর্যাপ্ত সময় প্রদানের প্রতিবাদে, বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায় নির্ধারিত সময়ের চেয়ে অতিরিক্ত সময় না পাওয়ায় বিরোধী দলীয় সংসদ নেতা শেখ হাসিনার বক্তব্যের প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদে, এবং প্রধান বিরোধী দলকে পয়েন্ট অব অর্ডারে কথা বলার সুযোগ না দেওয়ার প্রতিবাদে ওয়াকআউট হয়।

চতুর্থ অধিবেশনে ঃ প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দুই দিনে তিন বার ওয়াকআউট করে। সংসদ সদস্য মোহাম্মদ নাসিম বক্তব্য দিতে চাইলে ফ্লোর না দেবার প্রতিবাদে, কার্যপ্রণালী বিধির ২৭৪ বিধিতে সংসদ সদস্য দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সংসদ সদস্য মোহাম্মদ নাসিম বক্তব্য শুরু করার পর স্পিকার কর্তৃক মাইক বন্ধ করার প্রতিবাদে, এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির অভিযোগে ওয়াকআউট হয়।

পঞ্চম অধিবেশনে ঃ প্রধান বিরোধী দল পাঁচ দিনে ছয় বার ওয়াকআউট করেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর ৩০০ বিধিতে বক্তব্য প্রদানের পর প্রধান বিরোধী দলের কয়েকজন সংসদ সদস্য পয়েন্ট অব অর্ডারে কথা বলার জন্য দাঁড়ালে সুযোগ না দেওয়ার প্রতিবাদে, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল বিল ২০০২ এর উত্থাপন ও পাশের প্রতিবাদে, প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের সুযোগ না দেবার প্রতিবাদে, The Court-Fees (Amendment) Bill, ২০০২ এর ওপর আলোচনার জন্য প্রধান বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের পর্যাপ্ত সময় না দেওয়ার প্রতিবাদে, 'বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার তহবিল'-

Dhaka University Institutional Repository

এর নাম পরিবর্তন করে 'জাতীয় কৃষি পুরস্কার তহবিল' করার বিল সংসদে আনার প্রতিবাদে ওয়াকআউট হয়।

ষষ্ঠ অধিবেশনে ঃ মোট পনের বার ওয়াকআউটের ঘটনা ঘটে যার মধ্যে প্রধান বিরোধী দল আট দিনে এগার বার, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ তিন দিনে তিন বার ও জাতীয় পার্টি (এরশাদ) এক বার ওয়াকআউট করে। নিবন্ধীকরণ তালিকায় বাংলাদেশের নাম অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গে বক্তব্য প্রদানের সময় রাজনৈতিক মহলকে দায়ী করার প্রতিবাদে, বিরোধী দলীয় সংসদ নেতা পয়েন্ট অব অর্ডারে বক্তব্যের সময় সংসদ নেতাকে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার প্রতিবাদে, 'যৌথ অভিযান দায়মুক্তি বিল, ২০০৩' উত্থাপনের আপত্তি সংসদে কণ্ঠভোটে নাকচ হলে তার প্রতিবাদে, অধ্যাদেশ অনুমোদন সম্পর্কে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদে, 'যৌথ অভিযান দায়মুক্তি বিল, ২০০৩' বিলটি পাস করার প্রতিবাদে, 'গ্রাম সরকার বিল, ২০০৩' বিলটির বিরোধিতা করে, 'বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিল, ২০০৩' পাসের প্রতিবাদে, বিরোধী দলের সদস্যদের আনীত সংশোধনীসমূহ সরাসরি ভোটে দেওয়ার প্রতিবাদে এবং সমাপনী ভাষণের এক পর্যায়ে বিরোধী দলীয় নেতা বাধাগ্রস্থ হলে তার প্রতিবাদে ওয়াকআউট হয়।

সপ্তম অধিবেশনে ঃ মোট আট বার ওয়াকআউট হয় যার মধ্যে প্রধান বিরোধী দল পাঁচ দিনে ছয়বার, স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য এক বার ও কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ এক বার ওয়াকআউট করে। ছাত্রলীগ নেতা পলাশ হত্যা, পয়েন্ট অব অর্ডারে বক্তব্যের সুযোগ না পাওয়া, সংসদ সদস্য মোঃ আব্দুল হাইকে হত্যা চেষ্টার, প্রধান বিচারপতির নিয়োগ প্রশ্নের বক্তব্য রাখার সুযোগ না দেওয়া, বিরোধী দলীয় সংসদ নেতা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বিরোধী দলকে কথা বলার সুযোগ না দেওয়া, সংসদ সদস্যদের ঐচ্ছিক তহবিল বৃদ্ধি করার ঘোষণা নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন না হওয়া, এবং পয়েন্ট অব অর্ডারে কথা বলার সুযোগ ডেপুটি স্পিকার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার প্রতিবাদে ওয়াকআউটের ঘটনা ঘটে।

নবম অধিবেশনে ঃ কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের কাদের সিদ্দিকী (বীর উত্তম) শিক্ষা মন্ত্রীর বিবৃতির প্রতিবাদে একবার ওয়াকআউট করেন।

Dhaka University Institutional Repository

দশম অধিবেশনে ঃ জাতীয় পার্টি মাননীয় স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক রংপুরে মঙ্গা নিয়ে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ উপমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদে এক বার ওয়াকআউট করেন।

একাদশ অধিবেশনে ঃ ছয় বার ওয়াকআউটের ঘটনা ঘটে যার মধ্যে কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ চার বার ও জাতীয় পার্টি (এরশাদ) দুই বার ওয়াকআউট করে। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানকে বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দেওয়া, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদে, দুর্নীতি দমন বিল, ২০০৪ বিলটি পাসের প্রক্রিয়ার সময় আইন মন্ত্রীর বক্তব্যকে কটাক্ষপূর্ণ বলে এর প্রতিবাদে এবং আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুতবিচার) (সংশোধন) বিল, ২০০৪ বিল পাসের বিরোধীতা করে ওয়াকআউট হয়।

দ্বাদশ অধিবেশেন ঃ বারো বার ওয়াকআউটের ঘটনা ঘটে যার মধ্যে প্রধান বিরোধী দল দশ বার, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ ও স্বতন্ত্র যথাক্রমে এক বার ওয়াকআউট করে। ওআইসি সম্পর্কে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রীর বক্তব্য, পররাষ্ট্র নীতি নিয় আলোচনার বিষয়ে স্পিকারের সিদ্ধান্ত, বিরোধী দলকে আলোচনার সুযোগ না দেওয়া, অগৃহীত নোটিস বিষয়ে স্পিকারের সিদ্ধান্ত স্থগিত ও গৃহীত নোটিসের ওপর আলোচনা স্থগিত রাখা, পূর্ববতী সরকারের শাসনামল সর্ম্পকে বিরুপ মন্তব্য করা, বিরোধী দলীয় নেতার প্রাণনাশের হুমকির ঘটনায় সংসদের অধিবেশন মূলতুবি না করা, স্বাধীনতা বিকৃতির অভিযোগ, বিলের সংশোধনীর ওপর আলোচনা না করা এবং প্রধানমন্ত্রীর সমাপনী বক্তব্যের প্রতিবাদে ওয়াকআউট হয়।

ত্রয়োদশ অধিবেশনে ঃ প্রধান বিরোধী দল দুই দিনে দুই বার ওয়াকআউট করে ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার বিষয়ে সংসদ মুলতুবি করে ৬২ বিধিতে আলোচানার সুযোগ না পাওয়ায়।

চতুর্দশ অধিবেশনে ঃ মোট ছয় বার ওয়াকআউট হয় যার মধ্যে প্রধান বিরোধী দল পাঁচ বার ও বিকল্পধারা এক বার ওয়াকআউট করে। ২০০৪ সালের ২১ শে আগস্ট গ্রেনেড হামলার বিষয়ে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্য, গ্রেনেড হামলার বিষয়ে সংসদীয় তদন্ত কমিটি গঠনের প্রস্তাবে স্পিকার বিষয়টিকে সাব- জুডিস বলা, জাতীয় সংসদ (সংরক্ষিত মহিলা আসন) নির্বাচন বিল, ২০০৪ পাস, পয়েন্ট অব অর্ডার নাকচ ও বিভিন্ন বিধিতে বিরোধী দলের সদস্যদেরকে আলোচনার সুযোগ না দেয়ার প্রতিবাদে ওয়াকআউট হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চদশ অধিবেশনে ঃ এক বার কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ শোক প্রস্তাবের পর অধিবেশন মুলতুবি না করার প্রতিবাদে ওয়াকআউট করে।

বিংশতিতম অধিবেশনে ঃ চার দিনে চার বার প্রধান বিরোধী দল ওয়াকআউট করে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ (সংশোধন) বিল, ২০০৬ পাস হওয়া, তেলের দাম বৃদ্ধি, আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) (সংশোধন) বিল, ২০০৬ পাস এবং ৬২ বিধিতে আলোচনার দাবীতে ওয়াকআউট হয়।

একবিংশতিতম অধিবেশনে ঃ চার দিনে চার বার প্রধান বিরোধী দল ওয়াকআউট করে। প্রধান বিরোধী দলের কিছু বক্তব্য এক্সপাঞ্জ করে দেওয়া, যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর পয়েন্ট অব অর্ডারে বক্তব্য, সংসদ সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের বক্তব্যের কিছু অংশ অসংসদীয় বলে এক্সপাঞ্জ করা এবং বিরোধী দলীয় সংসদ নেতার সমাপনী বক্তব্যের পর বিধি ২৭৪ এর অধীন ব্যক্তিগত কৈফিয়ত এ বক্তব্য প্রদানের প্রতিবাদে ওয়াকআউট হয়।

দ্বাবিংশতিতম অধিবেশনে ঃ মোট দশ বার ওয়াকআউট হয় যার মধ্যে প্রাধান বিরোধী দল নয় বার ও কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ এক বার ওয়াকআউট করে। সংসদ সদস্য মোঃ মশিউর রহমানের বিরুপ বক্তব্য, বাজেটের ওপর পয়েন্ট অব অর্ডারের দাবী প্রত্যাখান হওয়া, জাতীয় ভোটার তালিকায় ভুল, নির্বাচন কমিশন ঘেরাও কর্মসূচিতে পুলিশের হামলা, ১৬২ বিধিতে আলোচনার দাবী, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বিরুপ বক্তব্য, সংসদ সদস্য আ,খ,ম. জাহাঙ্গীর হোসাইন এর বিরূপ বক্তব্য, পয়েন্ট অব অর্ডারে পর্যাপ্ত সময় না দেওয়া এবং The Constitution (Fifteenth Amendment) Bill প্রত্যাহারের প্রতিবাদে ওয়াকআউট হয়।

ত্রয়োবিংশতিতম অধিবেশনে ঃ মোট বারো বার ওয়াকআউট হয় যার মধ্যে প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নয় বার, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ এক বার, জাতীয় পার্টি (এরশাদ) এক বারও স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য এক বার ওয়াকআউট করে। ফুলবাড়ীয়া কয়লা খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের চুক্তি বিষয়ে প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের বক্তব্য এক্সপাঞ্জ করা, বিরোধী দলীয় সংসদ নেতার বক্তব্যের পর স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বক্তব্য দেওয়া, গণ গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে পয়েন্ট অব অর্ডারে পর্যাপ্ত সময় না দেওয়া, বিরোধী দলীয় উপনেতাকে পয়েন্ট অব অর্ডারে বক্তব্য দেবার সুযোগ না দেওয়া,

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ শ্রম বিল, ২০০৬ পাস, কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের বিশেষ সুবিধা বিল, ২০০৬ এ প্রয়োজনীয় পদ্ধতি অনুসরণ না করা, বিদ্যুৎ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য মুলতুবি প্রস্তাব গ্রহণ না করা, বৃহত্তর রংপুরকে বিভাগ ঘোষণা বিষয়ক মুলতুবি প্রস্তাব গ্রহণ না করা এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি বিষয়ে কথা বলার সুযোগ না দেওয়ার প্রতিবাদে ওয়াকআউট হয়।

৫.২.৭ বয়কট বা সংসদ বর্জন

অষ্টম সংসদের কার্যক্রম শুরু হয় প্রধান বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের মধ্য দিয়ে। অষ্টম সংসদ নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ এনে প্রধান বিরোধী দল প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনে ৫৬ কার্যদিবসে সবগুলো এবং তৃতীয় অধিবেশনে ২৪ কার্যদিবসের মধ্যে ১৮ কার্যদিবস সংসদ বর্জন করে অর্থাৎ অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে তৃতীয় অধিবেশনের ৭৪ কার্যদিবসের মধ্যে টানা ৬৮ কার্যদিবস অনুপস্থিত ছিল। এরপর চতুর্থ অধিবেশনে সংসদে যোগদান করে পঞ্চম অধিবেশন পর্যন্ত ১০০ ভাগ সংসদে উপস্থিত ছিল। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম অধিবেশনের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মেয়াদে অধিবেশন বর্জন করে। নবম, দশম এবং পঞ্চদশ থেকে ঊনবিংশতিতম অধিবেশনে আবার তারা ১০০ ভাগ কার্যদিবস বর্জন করে। অন্যদিকে বিংশতিতম অধিবেশনে ১০০ ভাগ উপস্থিত ছিল, একবিংশতিতম অধিবেশন থেকে ত্রয়োবিংশতিতম অধিবেশনে ৫১ কার্যদিবসের মধ্যে ৩ কার্যদিবস ছাড়া অবশিষ্ট সকল কার্যদিবসে উপস্থিত ছিল।

প্রধান বিরোধী দল ২৩টি অধিবেশনের মধ্যে ৯টি অধিবেশন পুরো ১০০ ভাগ বিভিন্ন দারিতে দলীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে অধিবেশনে যোগদান থেকে বিরত থাকে। অষ্টম জাতীয় সংসদের মোট ৩৭৩ কার্যদিবসের মধ্যে ২২৩ কার্যদিবস বা প্রায় ৬০% কার্যদিবস প্রধান বিরোধী দল সংসদ বয়কট বা বর্জন করে। অবশ্য প্রধান বিরোধী দল সংসদের শেষ অধিবেশনের শেষ কার্যদিবসে উপস্থিত ছিল যা বাংলাদেশের সংসদীয় ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায়, অষ্টম জাতীয় সংসদে সরকারি দল ও বিরোধী দল একে অপরকে অনেক ক্ষেত্রেই নিছক সমালোচনার জন্য সমালোচনা বা বিরোধিতা করেছে। বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অতি ক্ষমতাকেন্দ্রিক মনোভাবের কারণে নির্বাচনে পরাজয় মেনে নেওয়া ও সরকারি দল এবং বিরোধী দল সমন্বিত প্রচেষ্টায় কার্যকর সংসদ গড়ে তোলার মানসিকতা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা গড়ে উঠেনি। তবে সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে সরকারি দলের

Dhaka University Institutional Repository

ইতিবাচক ভূমিকা পালন একান্ত জরুরি। বিরোধী দলকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে সরকারের যেকোনো পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর সর্বোত্তম স্থান রাজপথ নয়, জাতীয় সংসদ।

৫.২.৮ কোরাম সংকট

বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৫(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতীয় সংসদের অধিবেশন চলার জন্য কমপক্ষে ৬০ জন সদস্যকে অধিবেশন কক্ষে উপস্থিত থাকতে হয়। অষ্টম জাতীয় সংসদে কোরাম সংকটের মাত্রা ছিল খুবই বেশি।

২০০৫ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের পঞ্চদশ অধিবেশনের চতুর্থ দিন কোরাম সংকটের কারণে সংসদের অধিবেশন মাঝপথে মুলতুবি হয়ে যায়। প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের লাগাতার সংসদ বর্জন এবং সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী সেই দিন সংসদে না যাওয়ায় অধিবেশনের শুরুতেই কোরাম সংকটের কবলে পড়ে সংসদ। প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে মাগরিবের নামাজের বিরতির পর ডেপুটি স্পিকার আখতার হামিদ সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অধিবেশন শুরু হলে রাত ৮.০৬ মিনিটে জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য গোলাম হাবিব দুলাল কোরামের বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ডেপুটি স্পিকার অধিবেশন মুলতুবির ঘোষণা দেন। জাতীয় পার্টির সদস্য গোলাম হাবিব দুলাল বলেন, কোরামের জন্য অধিবেশন কক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে সংসদ সদস্য উপস্থিত নেই। অধিবেশন মুলতুবি করে দিন। এভাবে সংসদ চলতে দেয়া যায় না। সংসদ অধিবেশন নিয়মতান্ত্রিকভাবে চলুক, আমি তা চাই।" তখন ডেপুটি স্পিকার অধিবেশন এক মিনিটের জন্য বিরতি দেন। বিরতির এক মিনিটের মধ্যেও কোরাম পূরণ না হওয়ায় ডেপুটি স্পিকার পাঁচ মিনিটের জন্য অধিবেশন মুলতুবি করে বেল বাজানোর নির্দেশ দেন। তিনি তার সংসদের অফিস কক্ষে চলে যান। বেল বাজানোর পাঁচ মিনিট শেষ হয়ে গেলেও কোরাম পূর্ণ না হওয়ায় ডেপুটি স্পিকার সংসদের অধিবেশন মুলতুবি করতে বাধ্য হন।[৫১]

২০০১ সালের অক্টোবরে শুরু হওয়া অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে ১৯টি কার্যদিবসে মোট ৫৯৮ মিনিট কোরাম সংকটের কারণে (প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩১ মিনিট) সময় অপচয় হয়। এই অধিবেশনের প্রথম দিনে ৯ দিনে মিনিট এবং একই বিরতির পর ১২ মিনিট বিলম্বে অধিবেশন শুরু হলেও কোনো কোনো কার্যদিবসে এক ঘণ্টা বা তারও বেশি সময় কোরাম সংকটের কারণে অপচয় হয়। তবে এই অধিবেশনের দ্বিতীয় কার্যদিবসে নির্ধারিত সময়ে অধিবেশন শুরু হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২০০২ সালে চারটি অধিবেশনে ৭৫ কার্যদিবসে মোট ২৯৪৬ মিনিট কোরাম সংকটের কারণে এবং ২০০৩ সালে পাঁচটি অধিবেশনে ৬৩ কার্যদিবসে মোট ২৯৪৬ মিনিট (গড়ে প্রায় ৪৬ মিনিট) কোরাম সংকটের কারণে অপচয় হয়। এই পাঁচটি অধিবেশনের মধ্যে অষ্টম অধিবেশনে সর্বোচ্চ প্রায় ৫১ মিনিট এবং দশম অধিবেশনে সর্বনিম্ন প্রায় ২৭ মিনিট কোরাম সংকটের কারণে সময়ের অপচয় হয়। ২০০৪ সালে চারটি অধিবেশনে ৮৩টি কার্যদিবসে মোট ৩০৬১ মিনিট এবং ২০০৫ সালে পাঁচটি অধিবেশনে ৬২টি কার্যদিবসে মোট ১৭৭৮ মিনিট (গড়ে প্রায় ২৯ মিনিট) কোরাম সংকটের কারণে অপচয় হয়। কোরাম সংকটে সময়ের অপচয় গত বছরগুলোর তুলনায় কম। এর অন্যতম কারণ ছিল অষ্টাদশ ও উনবিংশতিতম অধিবেশনে সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যদের সংসদে সন্তোষজনক উপস্থিতি।

২০০৬ সালে পাঁচটি অধিবেশনে ৭১টি কার্যদিবসে মোট ২৩৪৭ মিনিট (গড়ে প্রায় ৩৩মিনিট) কোরাম সংকটের কারণে অপচয় হয়। এ বছরে অনুষ্ঠিত অধিবেশনগুলোর মধ্যে বিংশতিতম অধিবেশনে কোরাম সংকটের কারণে গড়ে সর্বোচ্চ প্রায় ৪৪ মিনিট সময় অপচয় হয়।

সার্বিকভাবে অষ্টম জাতীয় সংসদে কোরাম সংকটের কারণে মোট ১৩৬৩৫ মিনিট বা প্রায় ২২৭ ঘণ্টা।[৫২] (গড়ে প্রায় ৩৭ মিনিট) সময় অপচয় হয় যা মোট কার্যকালের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। অষ্টম সংসদে ৩৭৩ কার্যদিবসের[৫৩] মধ্যে মাত্র ৯ কার্যদিবসে (২.৪%) নির্ধারিত সময়ে অধিবেশন শুরু হয়। প্রতি মিনিটে ১৫,০০০ টাকা পরিচালনা ব্যয়[৫৪] হিসাবে ২০০১ সালের অক্টোবরে শুরু হওয়া অষ্টম সংসদের প্রথম অধিবেশনে কোরাম সংকটজনিত কারণে অর্থের অপচয় হয় প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা। ২০০২,২০০৩,২০০৪,২০০৫ ও ২০০৬ সালে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে যথাসময়ে অধিবেশন শুরু না হওয়ায় এ অর্থের অপচয় যথাক্রমে প্রায় ৪ কোটি ৪২ লক্ষ, ৪ কোটি ৩৬ লক্ষ, ৪ কোটি ৫৯ লক্ষ, ২ কোটি ৬৭ লক্ষ ও ৩ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ অষ্টম জাতীয় সংসদে মোট ২৩টি অধিবেশনে শুধুমাত্র কোরামের অভাবে অধিবেশন দেরিতে শুরু করায় অর্থের অপচয় হয়েছে প্রায় ২০ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা। বিভিন্ন গণমাধ্যমসহ টিআইবি'র পার্লামেন্ট ওয়াচ প্রতিবেদনে এই কোরাম সংকটের স্বরূপ ও ক্ষতিকর প্রভাব এবং কোরাম সংকট নিরসনে সংসদ সদস্যদের সদিচ্ছা ও রাজনৈতিক অঙ্গীকারের সুপারিশ করে আসছিল। যেখানে অষ্টম সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ আসন সরকার দলীয় সংসদ সদস্যদের এবং ৩৭টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসহ সবগুলো স্থায়ী কমিটি সভাপতি

Dhaka University Institutional Repository

সরকার দলীয় সদস্যরা, সেখানে কোরাম সংকটের কারণে অধিবেশন নির্ধারিত সময়ে শুরু করা যাবে না তা কখনোই কাম্য হতে পারে না। সরকার দলীয় সংসদ সদস্যদের প্রতি প্রতিমন্ত্রী অসন্তোষ প্রকাশ করে সংসদ ভেঙ্গে দেওয়ার হুমকি দেন[৫৫] কিন্তু কোরাম সংকটের প্রকোপ থেকে মুক্ত হতে পারেনি অষ্টম জাতীয় সংসদ। এই সংকট নিরসনে প্রধানমন্ত্রীর উদ্বেগ অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার কিন্তু তা যথেষ্ট ছিল না।

৫.২.৯ সংসদ সদস্যদের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ

কার্যকর সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে সংসদ সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ একান্ত জরুরি। সংসদে সরকারি দলের সাথে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখা ও সরকারের বিভিন্ন কাজের জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতা বজায় রাখার জন্য গঠনমূলক সমালোচনা করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বিরোধী দল। আবার সরকারি দল ও বিরোধী দলের সমালোচনা করতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন সংসদে সদস্যদের নিয়মিত উপস্থিতি ও আলোচনায় অংশগ্রহণ। জাতীয় সংসদে সংসদ সদস্যরা দেশের জন্য, জনগণের জন্য কথা বলবেন এবং কাজ করতে সচেষ্ট হবেন- এটিই সবার কাম্য।

সদস্যদের উপস্থিতি ঃ অষ্টম জাতীয় সংসদের ১১৩ জন বা প্রায় ৩৮% সংসদ সদস্য শতকরা ৫০ ভাগ কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে ১৮.১% সংসদ সদস্য মাত্র এক-চতুর্থাংশ কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন। মাত্র ৭৪ জন বা ২৪.৮% সংসদ সদস্য ৭৬% বা ততোধিক দিবসে উপস্থিত ছিলেন।

সারণি ৫.৭ ঃ অষ্টম সংসদে মোট কার্যদিবসের মধ্যে সদস্যদের উপস্থিতির হার

দল	শতকরা কার্যদিবসে উপস্থিতির হার (সংখ্যা)[৫৬]				
	১-২৫	২৬-৫০	৫১-৭৫	৭৬+	মোট
সরকারি	৩৫% ৯% (১৯)	৫৪% ১৫% (৩২)	৯৪% ৪৭% (১০৪)	৮৯% ৩০% (৬৬)	৭৪% ১০০% (২২১)
প্রধান বিরোধী দল	৫৯% ৫৭% (৩২)	৪১% ৪৩% (২৪)	০% ০% (০)	০% ০% (০)	১৯% ১০০% (৫৬)
অন্যান্য বিরোধী দল	৬% ১৪% (৩)	৫% ১৪% (৩)	৬% ৩৩% (৭)	১১% ৩৮% (৮)	৭% ১০০% (২১)
মোট	১০০% ১৮% (৫৪)	১০০% ২০% (৫৯)	১০০% ৩৭% (১১১)	১০০% ২৫% (৭৪)	১০০% ১০০% (২৯৮)*

উৎস ঃ গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকরণে অষ্টম জাতীয় সংসদ (২০০১ - ২০০৬) টিআইবি, ২০১১।

* দুই জন নারী সদস্যের তথ্য দেয়া হয় নি।

Dhaka University Institutional Repository

সদস্যদের অনুপস্থিতি ঃ ৪৮ জন সংসদ সদস্য তিন-চতুর্থাংশের অধিক (২৮৩ বা এর বেশি) কার্যদিবসে অনুপস্থিত ছিলেন, যাদের মধ্যে ছিলেন সরকারি দলের ১৭ জন, প্রধান বিরোধী দলের ২৮ জন এবং অন্যান্য বিরোধী দলের তিন জন। তিন-চতুর্থাংশ পর্যন্ত কার্যদিবসে অনুপস্থিত ছিলেন ৬১ জন সংসদ সদস্য, যাদের মধ্যে ছিলেন সরকারি দলের ৩০ জন, প্রধান বিরোধী দলের ২৮ জন ও অন্যান্য বিরোধী দলের তিন জন। অর্থাৎ ১০৪ জন সংসদ সদস্য অর্ধেকের বেশি কার্যদিবসে অনুপস্থিত ছিলেন যাদের মধ্যে ৪৭ জন ছিলেন সরকারি দলের। প্রধান বিরোধী দল বিভিন্ন দাবিতে দলীয় সিদ্ধান্তে ২২৩ কার্যদিবস সংসদ বর্জন করায় মোট কার্যদিবসের মধ্যে তাদের অনুপস্থিতির হার বেশি।

সারণি ৫.৮ ঃ অষ্টম সংসদে কার্যদিবসে মধ্যে সদস্যদের অনুপস্থিতির হার

দল	শতকরা কার্যদিবসে অনুপস্থিতি (জন)				
	(১-২৫)%	(২৬-৫০)%	(৫১-৭৫)%	(৭৬%+)	মোট
সরকারি	৮০	৯৪	৩০	১৭	২২১
প্রধান বিরোধী দল	০	০	২৮	২৮	৫৬
অন্যান্য বিরোধী দল	৮	৭	৩	৩	২১
মোট	৮৮	১০১	৬১	৪৮	২৯৮

উৎস ঃ গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকরণে অষ্টম জাতীয় সংসদ (২০০১ - ২০০৬) টিআইবি, ২০১১।

অষ্টম সংসদে সংসদ সদস্যদের অধিবেশনে যোগদানের ব্যাপারে অনীহার বিভিন্ন কারণ লক্ষ করা যায়, যেমন সংসদে যোগদানের প্রয়োজনবোধ না করা, আগ্রহ না থাকা, সংসদের চেয়ে ব্যক্তিগত কাজকে গুরুত্ব দেওয়া ইত্যাদি। পেশার সাথে সংসদে অনুপস্থিতির সম্পর্ক [৫৭] অধিবেশওয়ারি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, যে সংসদ সদস্যরা একেবারেই সংসদে অনুপস্থিত ছিলেন তাদের অধিকাংশের পেশা ছিল ব্যবসা। আবার একইভাবে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিগুলোর বৈঠকগুলোতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও কমিটির অন্যান্য সদস্যদের উপস্থিতির হারও তেমন বেশি ছিল না। সংসদে সংসদ সদস্যদের গড় উপস্থিতি ছিল ৫৫%।

Dhaka University Institutional Repository

নারী সদস্যদের উপস্থিতি ঃ

অষ্টম সংসদে সাত জন নারী সদস্য সরাসরিভাবে নির্বাচিত ছিলেন। এর মধ্যে সরকারি দলের চার জন, প্রধান বিরোধী দলের দুই জন এবং অন্যান্য বিরোধী দলের এক জন। প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলের নেতা ছিলেন এই সাত জনের অন্তর্ভূক্ত। অষ্টম সংসদের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ৩৭৩ কার্যদিবসের মধ্যে ১৯৫ কার্যদিবস উপস্থিত ছিলেন; অর্থাৎ, মোট কার্যদিবসের প্রায় অর্ধেক (৪৮%) কার্যদিবস সংসদে অনুপস্থিত ছিলেন। প্রধান বিরোধীদল ২২৩ কার্যদিবস দলীয় সিদ্ধান্তে সংসদ বর্জন করে। অবশিষ্ট ১৫০ কার্যদিবসের মধ্যে বিরোধী দলীয় সংসদ নেতা শেখ হাসিনা ৪৫ কার্যদিবস (৩০%) উপস্থিত ছিলেন। মোট ৩৭৩ কার্যদিবসের প্রেক্ষিতে প্রধান বিরোধীদলীয় নেতার উপস্থিতির হার মাত্র ১২%। সরাসরি নির্বাচিত সাত জন নারী সদস্যের মধ্যে সরকারি দলের মোসাঃ ইসরাত সুলতানা সর্বোচ্চ ২৬৪ (৭১%) কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন। এর পরেই ছিলেন অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্য বেগম রওশন এরশাদ যিনি মোট ২৫৮ কার্যদিবস বা শতকরা ৬৯ ভাগ কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন।

অন্যদিকে অষ্টম সংসদে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত সদস্যরা অষ্টাদশ অধিবেশনে প্রথম দফায় ৩৬ জন এবং ঊনবিংশতিতম অধিবেশনে দ্বিতীয় দফায় নয় জন অর্থাৎ ৪৫ জন নারী সদস্য সংরক্ষিত নারী আসনে সংসদে যোগদান করেন যাদের উপস্থিতির হার সরাসরি নির্বাচনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের তুলনায় বেশি ছিল। শতকরা প্রায় ৮২ ভাগ নারী সদস্য ৭৬-১০০ ভাগ কার্যদিবস উপস্থিত ছিলেন।

সংসদে যোগদানকৃত কার্যদিবসের মধ্যে প্রধান বিরোধীদলের সদস্যদের অনুপস্থিতির হার ঃ

দলীয় সিদ্ধান্তে প্রধান বিরোধী দল মোট ৩৭৩ কার্যদিবসের মধ্যে ২২৩ কার্যদিবস বর্জন করে, অর্থাৎ ১৫০ কার্যদিবস প্রধান বিরোধী দল সংসদে উপস্থিত ছিল। এই ১৫০ কার্যদিবসের মধ্যে অষ্টম জাতীয় সংসদে প্রধান বিরোধী দল উপস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, শতকরা প্রায় ৭১ ভাগ প্রধান বিরোধী দলের সদস্যরা অর্ধেক কার্যদিবস (বর্জনকৃত কার্যদিবস ছাড়া) সংসদে অনুপস্থিত ছিলেন। শতকরা ২৫ ভাগ সদস্য তিন-চতুর্থাংশ কার্যদিবসে অনুপস্থিত ছিলেন। সংসদে যোগদানকৃত কার্যদিবসের (১৫০ দিন) মধ্যে প্রধান বিরোধী দলের দুই জন সংসদ সদস্য যথাক্রমে শতকরা ৭৯ ও ৮৬ ভাগ কার্যদিবস সংসদে অনুপস্থিত ছিলেন; অর্থাৎ, অষ্টম জাতীয় সংসদের মোট কার্যসময়ে তারা যথাক্রমে মাত্র ৩১ ও ২১ কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ৫.৯ ঃ সংসদে যোগদানকৃত কার্যদিবসের মধ্যে প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের অনুপস্থিতির হার

সংসদে যোগদানকৃত কার্যদিবস (%)	প্রধান বিরোধী দলের সদস্য সংখ্যা (%)
১-২৫	১২(২১%)
২৬-৫০	২৮(৫০%)
৫১-৭৫	১৪ (২৫%)
৭৬ +	২ (৪%)
মোট	৫৬ (১০০%)

উৎস ঃ গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকরণে অষ্টম জাতীয় সংসদ (২০০১ - ২০০৬) টিআইবি, ২০১১।

সংসদে বিভিন্ন বিষয়ে দলভিত্তিক সদস্যদের অংশগ্রহণ ঃ

সংসদ অধিবেশনে সদস্যরা প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গৃহীত বা অগৃহীত নোটিশের ওপর আলোচনা, সাধারণ আলোচনা, অর্থনীতি, অনির্ধারিত আলোচনা, আইন প্রণয়ন, বাজেট আলোচনা, রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনাসহ বিভিন্ন বিধিতে আলোচনায় অংশগ্রহণ বা বক্তব্য রাখতে পারেন। নিম্নে অষ্টম সংসদে বিভিন্ন বিষয়ে সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সারণি ৫.১০ ঃ সংসদে বিভিন্ন দলভিত্তিক সদস্যদের অংশগ্রহণ[৫৮]

অষ্টম সংসদে বিষয়ভিত্তিক সদস্যদের অংশগ্রহণ	দলভিত্তিক সংসদ সদস্য			
	সরকারি (২২৩)	প্রধান বিরোধী (৫৬ জন)	অন্যান্য বিরোধী দল (২১ জন)	মোট (৩০০ জন)
জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে অগৃহীত নোটিশ	১৩৯ (৬২%)	৩৮ (৬৮%)	১৩ (৬২%)	১৯০ (৬৩%)
জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে গৃহীত নোটিশ	৭৫ (৩৪%)	১২ (২১%)	১৩ (৬২%)	১০০ (৩৩%)
সাধারণ আলোচনা	২৬ (১২%)	৪ (৭%)	৬ (২৯%)	৩৬ (১২%)
মন্ত্রীদের মুল প্রশ্নোত্তর পর্ব	১৫৯ (৭১%)	৩১ (৫৫%)	১৯ (৯১%)	২০৯ (৭০%)
মন্ত্রীদের সম্পূরক প্রশ্নোত্তর পর্ব	১৫৮ (৭১%)	৪০ (৭১%)	১৭ (৮১%)	২১৫ (৭২%)
অনির্ধারিত আলোচনা	১০৪ (৪৭%)	৩০ (৫৪%)	১৩ (৬২%)	১৪৭ (৪৯%)
রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা	৭২ (৩২%)	৩৫ (৬৩%)	১১ (৫২%)	১১৮ (৪৯%)
প্রধানমন্ত্রীর মূল প্রশ্নোত্তর পর্ব	৪৪ (২০%)	০ (০%)	৩ (১৪%)	৪৭ (১৬%)
প্রধানমন্ত্রীর সম্পূরক প্রশ্নোত্তর পর্ব	৭০ (৩১%)	০ (০%)	১৭ (৮১%)	৮৭ (২৯%)
বাজেটের ওপর আলোচনা	১৪৩ (৬৪%)	৪১ (৭৩%)	১৭ (৮১%)	২০১ (৬৭%)

উৎস ঃ গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকরণে অষ্টম জাতীয় সংসদ (২০০১ - ২০০৬) টিআইবি, ২০১১।

Dhaka University Institutional Repository

জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণ ঃ

জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে সংসদ সদস্যরা এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও উন্নয়ন প্রকল্পসহ বিভিন্ন জরুরি জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ের প্রতি স্পিকারের অগ্রিম অনুমতিক্রমে মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। মনোযোগ আকর্ষণী এসব নোটিশ থেকে স্পিকার কোনোটি গ্রহণ করতেও পারেন, আবার নাও করতে পারেন। ৭১(১) বিধি অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য অথচ ৭১(৩) বিধি অনুযায়ী গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি, গুরুত্ব অনুযায়ী শুধুমাত্র সেগুলো সম্পর্কে প্রত্যেক নোটিশদাতা সদস্য দুই মিনিট করে বক্তব্য রাখতে পারবেন। কিন্তু দেখা যায়, অষ্টম সংসদে অগৃহীত নোটিশের ওপর আলোচনায় ১৯০ জন সংসদ সদস্য অংশগ্রহণ করেন। অবশিষ্ট ১১০ জন সংসদ সদস্যের কোন অংশগ্রহণ ছিল না। ১৫১ জন সংসদ সদস্য অগৃহীত নোটিশের আলোচনায় সংশ্লিষ্ট সদস্যরা অনুপস্থিত ছিলেন, যাদের মধ্যে সরকারি দলের ১১৩ জন, প্রধান বিরোধী দলের ২৭ জন ও অন্যান্য বিরোধী দলের ১১ জন। এছাড়া সরকারি ও বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্যে যথাক্রমে মোট ১৩৯ জন ও ৫১ জন সংসদ সদস্য বিভিন্ন কার্যদিবসে অংশগ্রহণ করেন, অর্থাৎ সরকারি দলের ৮২ জন ও বিরোধীদলের ২৮ জন সংসদ সদস্যের জরুরি জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে অগৃহীত নোটিশের ওপর কোন অংশগ্রহণ ছিল না। গৃহীত নোটিশের ওপর সরকারি দলের ৭৫ জন ও বিরোধী দলের মোট ২৫ জন সংসদ সদস্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। অর্থাৎ সরকারি দলের প্রায় ৬৬% এবং বিরোধীদলের প্রায় ৬৮% সংসদ সদস্যের সংসদে গৃহীত নোটিশের ওপর আলোচনায় কোনো অংশগ্রহণ ছিল না।

৫.২.১০ মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব

অষ্টম সংসদে মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে মূল প্রশ্নে ২০৯ জন ও সম্পূরক প্রশ্নে ২১৫ জন সংসদ সদস্য অংশগ্রহণ করেন। মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী বাদে মূল প্রশ্নে ৪১ জন ও সম্পূরক প্রশ্নে ৩৫ জন সংসদ সদস্যের কোনো অংশগ্রহণ ছিল না, যাদের মধ্যে সরকারি দলের ১৪ জন মূল প্রশ্নে ও ১৩ জন সম্পূরক প্রশ্নে, প্রধান বিরোধী দলের মূল প্রশ্নে ২৫ জন ও সম্পূরক প্রশ্নে ১৬ জন এবং অন্যান্য বিরোধী দলের ২ জন সংসদ সদস্যের কোনো অংশগ্রহণ ছিল না।

অনির্ধারিত আলোচনা ঃ

অষ্টম সংসদে অনির্ধারিত আলোচনায় ১৪৭ জন সংসদ সদস্য বিভিন্ন সময় অনির্ধারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন যাদের মধ্যে সরকারি দলের ১০৪ জন, প্রধান বিরোধী দলের ৩০জন ও অন্যান্য বিরোধী দলের ১৩ জন অংশগ্রহণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা ঃ

এই আলোচনায় ১১৮ জন অংশগ্রহণ করেন ও ১৮২ জন সংসদ সদস্যের কোন অংশগ্রহণ ছিল না। ১৮২ জন সংসদ সদস্যদের মধ্যে সরকারি দলের ১৫১ জন, প্রধান বিরোধীদলের ২১ জন ও অন্যান্য বিরোধী দলের ছিলেন দশ জন।

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব ঃ

অষ্টম সংসদে প্রধানমন্ত্রীর কাছে মূল প্রশ্নে ৪৭ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন যাদের মধ্যে ৪৪ জন সরকারি দলের ও তিন জন অন্যান্য বিরোধী দলের। প্রধানমন্ত্রীর কাছে সম্পূরক প্রশ্নে ৮৭ জন সংসদ সদস্য অংশগ্রহণ করেন যাদের মধ্যে অন্যান্য বিরোধী দলের ১৭ জন। প্রধান বিরোধী দল প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেননি বা অংশগ্রহণের সুযোগ পাননি।

বাজেটের ওপর আলোচনা ঃ

২০১ জন সংসদ সদস্য বাজেট আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। অবশিষ্ট ৯৯ জন সংসদ সদস্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করেননি যাদের মধ্যে সরকারি দলের ৮০ জন, প্রধান বিরোধী দলের ১৫ জন ও অন্যান্য বিরোধী দলের চার জন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, অষ্টম সংসদের কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়নি। এছাড়া দুর্নীতি, বিদ্যুৎ সংকট বা সন্ত্রাসের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে কোনো সাধারণ আলোচনা হয়নি। সংসদে সদস্যদের উপস্থিতির হার ছিল খুবই নগণ্য। শুধুমাত্র দ্রব্যমুল্যের উর্ধ্বগতি নিয়ে সংসদে একবার আলোচনা হয় কিন্তু সেটিও পর্যাপ্ত ও কার্যকর ছিল না। প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে সংসদ সদস্যদের কম অংশগ্রহণ করার কারণ ছিল-প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বের সংক্ষিপ্ত কার্যকাল, প্রধানমন্ত্রীর জন্য নির্ধারিত কার্যদিনে প্রধানমন্ত্রীর অনিয়মিত উপস্থিতি, সরকারি দলের সদস্যদের মূল প্রশ্নে সুযোগ বেশি দেওয়া, প্রশ্নোত্তর পর্ব টেবিলে উপস্থাপন বা প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব সদস্যদের আকৃষ্ট করতে না পারা। এছাড়া আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে বিলের ওপর জনমত যাচাই বাছাই বা সংশোধনীর প্রস্তাব নিয়েও নির্ধারিত সময়ে সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য উপস্থিত থাকেন না বা উপস্থাপন করেন না। এক্ষেত্রে সদস্যদের অনুপস্থিতির কারণ হতে পারে সংসদ সদস্যদের অনাগ্রহ অর্থাৎ যখন তারা দেখেন তাঁদের আনীত সংশোধনীগুলো গৃহীত হয় না তখন তারা তা উত্থাপন করতে আগ্রহী হন না।

Dhaka University Institutional Repository

৫.২.১১ অষ্টম সংসদে সংসদীয় কমিটি গঠন প্রক্রিয়া

১৯৭২ সালের সংবিধানে কমিটি সমূহের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম বৈঠকেই কমিটি গঠনের বাধ্যবাধকতা ছিল কিন্তু ১৯৭৫ সালে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনের মাধ্যমে "সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম বৈঠকে" শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হয়। যেহেতু কমিটি গঠনের সময়ের ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না, দেখা গেছে অষ্টম সংসদে অধিকাংশ কমিটি গঠনে প্রায় দেড় বছর সময় অতিক্রান্ত হয়। ফলে সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় কমিটিসমূহের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা অনেকটাই ব্যাহত হয়। সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠনে বিলম্বের জন্য সরকার ও বিরোধী দল পরস্পরকে দায়ী করে। প্রধান বিরোধী দল সংসদীয় আসনের আনুপাতিক হারে কমিটির চেয়ারম্যান দাবি করলেও সরকারি দল এই দাবি উপেক্ষা করে। ২০০৬ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত বৈঠকে অষ্টম জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি সম্পার্কিত স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় ঐ রিপোর্ট মোতাবেক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৪৬ বিধিসহ অন্যান্য কয়েকটি বিধি সংশোধন করা হয়। কার্যপ্রণালী-বিধির ২৪৬ বিধির প্রথম পংক্তিতে অবস্থিত "উদ্বোধনের পর যথাশীঘ্র" শব্দগুলির পরিবর্তে " তৃতীয় অধিবেশনের মধ্যে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে অর্থাৎ প্রত্যেক নতুন সংসদের "যথাশীঘ্র" শব্দের পরিবর্তে "তৃতীয় অধিবেশনের মধ্যে" স্থায়ী কমিটি গঠন করার বিধান সংশোধিত হয়। কমিটি গঠনে দল ভিত্তিক সদস্য সংখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত প্রত্যেক স্থায়ী কমিটিতে সদস্য সংখ্যা দশ যার মধ্যে ১৭টি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটিতে সরকারি ও বিরোধী দলের সদস্য সংখ্যা যথাক্রমে আট ও দুই; ১৫টি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটিতে এ হার যথাক্রমে সাত ও তিন; একটি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটিতে সংখ্যা নয় ও এক এবং তিনটি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটিতে সরকারি ও বিরোধী দলের সদস্য সংখ্যা যথাক্রমে ছয় ও চার। সরকারি হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটিতে ১৫জন সদস্যের মধ্যে সরকারি দলের সদস্য ছিলেন ১১জন। কমিটিতে বিরোধী দলের সদস্য সংখ্যা হয়ত সংসদে বিরোধী দলের সদস্যদের আনুপাতিক হার নির্দেশ করে কিন্তু সংসদীয় কমিটিগুলোকে অধিক কার্যকর করার জন্য বিশেষ করে দুর্নীতি ও অনিয়ম তদন্ত করতে কমিটিগুলোতে বিরোধী দল থেকে আরও সদস্য অন্তর্ভূক্তি প্রয়োজন ছিল।

আবার দেখা যায়, অষ্টম সংসদে সব স্থায়ী কমিটিতে সভাপতি পদে সরকারি দলের সদস্যরা ছিল। পৃথিবীর অনেক দেশে সরকারি হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটিসহ গুরত্বপূর্ণ কমিটিগুলোতে বিরোধী দলের মধ্য থেকে সভাপতি নির্বাচনের বিধান চালু আছে, বাংলাদেশের এ চর্চা চালু হওয়া উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

সংসদীয় কমিটির বৈঠক সংখ্যা ও আলোচিত বিষয় ঃ

কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৮ বিধি অনুযায়ী "প্রত্যেকটি স্থায়ী কমিটিকে মাসে অন্ততপক্ষে একটি বৈঠকে মিলিত হতে হবে"। কিন্তু অষ্টম সংসদে অধিকাংশ কমিটিগুলোই কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী বৈঠক করতে ব্যর্থ হয়। মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ও হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির মধ্যে প্রায় ১৩ শতাংশ কার্যপ্রণালী বিধি অনুসরণ করে বৈঠক করতে সমর্থ হয়। যে বৈঠকগুলো হয়েছে সেগুলোর বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, খুব কম সংখ্যক বৈঠকেই দুর্নীতি বা অনিয়মের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। আবার যেগুলো আলোচিত হয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে পারেনি। উদাহারণস্বরূপ বলা যেতে পারে, দীর্ঘ দুই বছরেও যোগাযোগমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি। যেখানে এক মাসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার কথা সেখানে দুই বছর অতিক্রান্ত হলেও এবং পর পর চার দফায় মেয়াদ বাড়ানোর পরও উপকমিটি রিপোর্ট দিতে পারেনি। ২০০৪ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে যোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্তে দুটি উপকমিটি গঠন করা হয়। এর মধ্যে সিএনজি থ্রি হুইলার আমদানি ও রুট পারমিট দেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অনিয়ম তদন্তে কমিটির সদস্য অ্যাড. নাদিম মোস্তফাকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। একইভাবে সিএনজি ফিলিং ও রিফুয়েলিং ষ্টেশন স্থাপনে সরকারি জমি বেসরকারি উদ্যোক্তাদের বরাদ্দ দেওয়ার ক্ষেত্রে অনিয়ম তদন্তে মাহমুদুল হক রুবেলকে আহ্বায়ক করে অপর একটি উপকমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় স্থায়ী কমিটিগুলোও বেশ কিছু দুর্নীতি ঘটনা উদঘাটন করলেও তা নির্মূলে কোন বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নিতে পারেনি। এমনকি দুর্নীতি তদন্তে যে উপকমিটিগুলো গঠন করা হয়েছিল সেগুলোরও অধিকাংশ উপকমিটি প্রতিবেদন জমা দিতে পারেনি।

আবার কমিটিগুলো প্রায় ক্ষেত্রে যথাসময়ে বৈঠকের প্রতিবেদন সংসদে জমা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। অষ্টম সংসদে ছয়টি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি কোন প্রতিবেদন সংসদে জমা দেয়নি। ৩০ টি কমিটি মাত্র একটি করে প্রতিবেদন সংসদে জমা দিয়েছে। আর মাত্র ১ টি কমিটি অষ্টম সংসদে ৩ টি প্রতিবেদন সংসদে জমা দিয়েছে। এছাড়া যেসব কমিটি প্রতিবেদন সংসদে জমা দিয়েছে তাদের বেশির ভাগই অর্থাৎ শতকরা ৭৭ ভাগ সংসদের মেয়াদ শেষ হবার মাসে (জুন-অক্টোবর ২০০৬) প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। যে বৈঠকগুলো হয়েছে, সেগুলোর বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করে দেখা যায়, খুব কম সংখ্যক বৈঠকেই দুর্নীতি/অনিয়মের বিষয়টি আলোচনা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩ সংসদকে কার্যকর করার জন্য সুপারিশ ঃ

১. অনুপস্থিতজনিত কারণে সদস্যপদ খারিজ হওয়ার বিধান ৯০ কার্যদিবস থেকে কমিয়ে ২০ কার্যদিবস করা উচিত।

২. বছর ভিত্তিক সর্বোচ্চ উপস্থিতির জন্য পুরস্কার প্রদান এবং অধিবেশনওয়ারী যেসকল সদস্য একেবারেই সংসদে আসবেন না, তারা সদস্য হিসেবে প্রাপ্য ভাতাদি থেকে বঞ্চিত হবেন-এ রকম বিধি চালু করা উচিত।

৩. সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংবিধানের ৭০ ধারা সংশোধন করা উচিত।

৪. সংসদের কার্যদিবস ও কার্যসময় বাড়ানো উচিত। এক্ষেত্রে অধিবেশন বিকেলের পরিবর্তে সকালে এবং সংসদ অধিবেশন বছরে কমপক্ষে ১৩৫ কার্যদিবস হওয়া উচিত।

৫. প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি প্রশ্নের পর্ব সপ্তাহে আধ ঘন্টার পরিবর্তে এক ঘন্টা করা উচিত এবং মূল প্রশ্নে বিরোধী দলের সদস্যদের প্রশ্নকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

৬. ডেপুটি স্পিকারের পদ বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচন এবং বাজেট ও আইন প্রণয়ন কার্যাবলীসহ অন্যান্য কার্যদিবসে ডেপুটি স্পিকারের শতকরা অন্তত ৪০ ভাগ সভাপতিত্ব করার বিধান চালু করা উচিত।

৭. সংসদ গঠনের পরপরই সংসদ উপনেতা নিয়োগ করা উচিত।

৮. সংসদীয় ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করা উচিত।

৯. সংসদের অধিবেশনে সরকারি ও বেসরকারি রেডিও, টিভি ও সংবাদপত্রসহ সকল গণমাধ্যমকে প্রবেশাধিকার দেওয়া উচিত।

১০. আইন করে ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে অন্তত একদিন বিরোধী সদস্য দিবস হিসেবে পালন করা যেতে পারে। এদিন বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের উত্থাপিত বিষয়গুলোকে প্রধান্য দিয়ে কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

১১. সংসদীয় ন্যায়পাল নিয়োগ করা উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

১২. সংসদ সদস্যদের জন্য নৈতিক আচরণ বিধি (Code of Ethics) প্রণয়ন করা উচিত।

১৩. দেশ ও দেশের জনগণের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে অধিবেশন বর্জনের সংস্কৃতি পরিহার করা উচিত।

১৪. প্রত্যেক সংসদ সদস্যকে স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও সুশীল সমাজ নিয়ে ফোরাম তৈরি করে স্ব স্ব নির্বাচনী এলাকার জন্য দ্বি-বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও কাজের তালিকা প্রকাশ করা উচিত।

১৫. সংসদ সদস্যদের বাৎসরিক নিজ নিজ কাজের সাফল্য ও ব্যর্থতা জনসম্মুক্ষে তুলে ধরতে হবে এবং জনমতের ওপর ভিত্তি করে মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবি বা Right to Recall উত্থাপনের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

১৬. বিভিন্ন বিল খেলাপি ও ঋণ খেলাপি সংসদ সদস্যদের পরবর্তী নির্বাচনে অযোগ্য করা উচিত।

১৭. জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের আয় ও সম্পদের হিসাবসহ হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যক্তিগত আট ধরনের তথ্য দেবার বাধ্যবাধকতা ও সত্যতা যাচাই নিশ্চিত করা উচিত।

১৮. প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যদের জন্য দপ্তর থাকতে হবে এবং উক্ত দপ্তরে দুই মাস অন্তর জনগণের জন্য প্রশ্নোত্তর পর্ব চালুর বিধান করা উচিত।

১৯. রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার ও মন্ত্রী পদে নির্বাচনে একই ব্যক্তির প্রাধান্য হ্রাস করতে একটি নীতিমালা বিবেচনা করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪ সংসদীয় কমিটি কার্যকর করার লক্ষ্যে সুপারিশ ঃ

১. প্রত্যেক সংসদের প্রথম অধিবেশনেই সকল প্রকার কমিটি গঠন করা উচিত।

২. সরকারি হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটিসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী কমিটিগুলোর মধ্য থেকে কমপক্ষে ৫০% কমিটিতে বিরোধী দলের মধ্য থেকে সভাপতি নির্বাচন করা উচিত।

৩. কোন মন্ত্রীকে ঐ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কমিটিতে সদস্য না করার বিধান চালু করা উচিত।

৪. কমিটি প্রতিবেদন জমা দেবার এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে এই প্রতিবেদন সম্পর্কে মন্তব্য/আপত্তি এবং তিন মাসের মধ্যে কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশের আলোকে মন্ত্রণালয় কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা লিখিতভাবে জানানো উচিত।

৫. মন্ত্রণালয় ও সংসদীয় কমিটির সংখ্যা কমাতে হবে এবং সংসদীয় কমিটিগুলোর কর্মকান্ড নির্দিষ্ট সময় অন্তর মূল্যায়ন করার জন্য আলাদা একটি কমিটি গঠন করা উচিত।

৬. জাতীয় বাজেট তৈরি ও নির্বাহ পদ্ধতিটি হতে হবে স্বচ্ছ এবং অংশগ্রহণমূলক যাতে করে সরকারি তহবিল ও সম্পদের অপচয় রোধ নিশ্চিত করা যায়। সংসদীয় কমিটিগুলো, বিশেষ করে সরকারি তহবিল সংক্রান্ত কমিটিগুলোর ক্ষমতা বৃদ্ধি ও সেইসাথে দলীয় প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা উচিত।

৭. যেসব সংসদ সদস্য তাদের সম্পদের হিসাব সংসদে নথিভূক্ত করেননি তাদেরকে সংসদীয় কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত না করার বিধান চালু করা উচিত।

৮. জাতীয় কোনো ইস্যুতে কমিটিসমূহ যেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির মতামত গ্রহণ করতে পারে এ বিষয়ে বিধান চালু করা উচিত।

৯. সংসদীয় কমিটির পরামর্শসহ কার্যবিবরণী জনগণ তথা সরকারি ও বেসরকারি রেডিও, টিভি ও সংবাদপত্রসহ সকল গণমাধ্যমকে অবহিত করা উচিত।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় কার্যকর সংসদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাষ্ট্রের অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী ফল বয়ে আনতে পারে। কোরাম সংকট, সংসদ বর্জন, মাত্রাতিরিক্ত অনির্ধারিত আলোচনা, কমিটি গঠনে দীর্ঘসূত্রতা ও অনিয়মিত বৈঠক এবং সর্বোপরি অর্থের অপচয় জাতীয় সংসদকে প্রকৃত অর্থে কার্যকর হতে দেয়নি। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের মাত্রাতিরিক্ত ওয়াকআউট ও সংসদ বর্জনের ধারা লক্ষ্য করা যায়। পঞ্চম সংসদের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ, সপ্তম সংসদের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি এবং অষ্টম সংসদের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের দীর্ঘদিন ধরে সংসদ বর্জন আমাদের দেশে সংসদীয় সংস্কৃতি বিকাশে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে গণ্য করা হয়। যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকাঃ

১. *জনকণ্ঠ*, ৩ মার্চ, ২০০১।

২. *প্রথম আলো*, ৩ অক্টোবর, ২০০১।

৩. *ইউরোপীয় ইউনিয়ন নির্বাচন পর্যবেক্ষণ টিম* তার রিপোর্টে বলে: তার ৭২ জন পর্যবেক্ষণ ৩৪টি জেলার ৫০০টি ভোট কেন্দ্র পরিদর্শন করে দেখতে পায় যে, ১৩.৯% কেন্দ্রে অবৈধভাবে লোকজন উপস্থিত ছিল; ভোট দেয়ার পর ২৩.৪% ভোটারের আঙ্গুলে আমোচনীয় কালি ছিল না; ২২.৯% ভোট কেন্দ্রের ভেতরে ও বাইরে অবৈধ রাজনৈতিক কর্মকান্ড ফলে ভোট কেন্দ্র বন্ধ হওয়ার পরও ১৮.৯% ভোটার লাইনে দাড়িয়েছিল; লাইনে দাড়ানো ১৫% ভোটারকে ভোট দিতে দেয়া হয়নি; ৫৬.৮% প্রিজাইডিং অফিসার ভোট গণনার আগে মোট ব্যালটের সংখ্যা উল্লেখ করেনি। ভোট কেন্দ্রে আওয়ামীলীগের ৫৩.৮% বি.এন.পির ৬৯২% পোলিং এজেন্ট উপস্থিত ছিলেন, *জনকণ্ঠ* ১৫ অক্টোবর ২০০১।

৪. *বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ*, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৫. *বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ষষ্ঠ, দশম অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ*, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬. *বাজেট বক্তৃতা ২০০৫-২০০৬*, অর্থ মন্ত্রণালয়, ৯ জুন, ২০০৫।

৭. *প্রথম আলো*, ১১ জুন, ২০০৬।

৮. www.mof.gov.bd/previous_budget/budget_2002

৯. *২০০৩-২০০৪ অর্থবছর বাজেটের সংক্ষিতসার*, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

১০. *২০০৪-২০০৫ অর্থবছর বাজেটের সংক্ষিতসার*, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

১১. *দ্যা ডেইলি স্টার*, ১০ জুন, ২০০৫।

১২. www.mof.gov.bd/previous_budget/budget_2006

১৩. অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

১৪. *বাজেটের সংক্ষিপ্তসার*, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

১৫. *২০০৪-২০০৫ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার*, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

১৬. *দ্যা ডেইলি স্টার*, ১০ জুন, ২০০৫।

১৭. www.mof.gov.bd/previous_ budget/budget_2006, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,

১৮. *ঐ*।

১৯. আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অক্টোবর ২০০৬।

২০. জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শন (রহিতকরণ) আইন, ২০০২।

২১. *দৈনিক যুগান্তর*, ৪ অক্টোবর, ২০০৬।

২২. *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫, দৈনিক যুগান্তর, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫।

২৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ২২।

২৪. সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ এর ১৮ ধারাবলে ১১৫ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

২৫. আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অক্টোবর, ২০০৬।

২৬. *ঐ*।

২৭. *ঐ*।

২৮. ৭০ (২), ৭৩ (২), ও ৭৩(৩) অনুচ্ছেদ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

Dhaka University Institutional Repository

২৯. পার্লামেন্ট ওয়াচ (অষ্টম জাতীয় সংসদ : ১ম, ২য় ও ৩য় অধিবেশন), ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২২ আগস্ট, ২০০২।
৩০. পার্লামেন্ট ওয়াচ (অষ্টম জাতীয় সংসদ : ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধিবেশন), ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ২২ আগস্ট ২০০২।
৩১. পার্লামেন্ট ওয়াচ (অষ্টম জাতীয় সংসদ : ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম অধিবেশন), ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ১৮ ডিসেম্বর, ২০০৩।
৩২. *বাংলাদেশ অষ্টম জাতীয় সংসদের একাদশ অধিবেশনের কার্যাবাহের সারাংশ*, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।
৩৩. পার্লামেন্ট ওয়াচ ২০০৫, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ।
৩৪. সংসদ পর্যবেক্ষণ, টিআইবি গবেষক দল।
৩৫. *পার্লামেন্ট ওয়াচ প্রথম থেকে পঞ্চম রিপোর্ট*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ।
৩৬. অষ্টম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশন, *দৈনিক বুলেটিন* ৩৭, ২০০২।
৩৭. অষ্টম জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশন, *দৈনিক বুলেটিন* ২৪, ২০০২।
৩৮. অষ্টম জাতীয় সংসদের একাদশ অধিবেশন, *দৈনিক বুলেটিন* ৪৩,২০০৪।
৩৯. ঐ।
৪০. অষ্টম জাতীয় সংসদের দ্বাদশ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর সমাপনী ভাষণ, ২০০৪।
৪১. অষ্টম জাতীয় সংসদের দ্বাদশ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর সমাপনী ভাষণ, ২০০৪।
৪২. অষ্টম জাতীয় সংসদের পঞ্চদশ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর সমাপনী ভাষণ, ২০০৫।
৪৩. ঐ।
৪৪. ঐ।
৪৫. অষ্টম জাতীয় সংসদের অষ্টাদশ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর সমাপনী ভাষণ, ২০০৫।
৪৬. অষ্টম জাতীয় সংসদের ত্রয়োবিংশতিতম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর সমাপনী ভাষণ।
৪৭. অষ্টম জাতীয় সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশনের দৈনিক বুলেটিন ২৪, ২০০৩।
৪৮. অষ্টম জাতীয় সংসদের দ্বাদশ অধিবেশনের দৈনিক বুলেটিন ২৫, ২০০৪।
৪৯. অষ্টম জাতীয় সংসদের একবিংশতিতম অধিবেশনের দৈনিক বুলেটিন ০৭, ২০০৬।
৫০. অষ্টম জাতীয় সংসদের ত্রয়োবিংশতিতম অধিবেশনের দৈনিক বুলেটিন ১৮, ২০০৬।
৫১. "পার্লামেন্ট ওয়াচ ২০০৫" ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ।
৫২. প্রথম থেকে সপ্তদশ অধিবেশনে কোরাম সংকটে সময়ের অপচয় হিসাব করতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় কতৃক প্রকাশিত দৈনিক বুলেটিন ও অষ্টাদশ অধিবেশন থেকে অক্টোবর ২০০৬ সালের কোরাম সংকটে সময়ের অপচয় টিআইবি কর্তৃক সংসদ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে হিসাব করা হয়েছে।
৫৩. জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে সপ্তদশ অধিবেশনের দৈনিক বুলেটিন সমূহ ও টিআইবি কতৃক সংসদ পর্যবেক্ষণ।
৫৪. *প্রথম আলো*, ১৪ জুলাই, ২০০৯।
৫৫. "পার্লামেন্ট ওয়াচ ২০০৫" ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ।
৫৬. বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যা দ্বারা সংসদ সদস্যদের বুঝানো হয়েছে।
৫৭. "পার্লামেন্ট ওয়াচ ২০০৫" ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২৭ জুন, ২০০৬।
৫৮. *প্রথম আলো*, ২৯ জানুয়ারি, ২০০৭।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ সুশাসন ও বাংলাদেশ

৬.১ দুর্নীতি পরিস্থিতি ২০০১ - ২০০৬ ঃ

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে দুর্নীতি অন্যতম প্রধান অন্তরায়। দুর্নীতির ব্যাপকতা ও গভীরতার মাপকাঠিতে আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের তুলনামূলক অবস্থান নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। তবে দুর্নীতি যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক বিকাশ ও স্থিতিশীলতা এবং সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রধানতম প্রতিবন্ধক সে বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই।

দুর্নীতি কোনো সমস্যা নয়। আর এ সমস্যা বাংলাদেশ বা আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের একচ্ছত্র সমস্যা নয়। পৃথিবীর সব দেশে দুর্নীতি ছিল, আছে, হয়ত বা থাকবেও চিরদিন। বস্তুত দুর্নীতি মানুষের সহজাত কু-প্রবৃত্তিগুলোর অন্যতম। দুর্নীতি বলতে আমরা বুঝি প্রাপ্ত বা অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিজের বা গোষ্ঠীর স্বার্থ অর্জন করা। দুর্নীতি শুধুমাত্র ঘুষের আদান-প্রদান নয়, এর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার। অর্থাৎ ক্ষমতার সাথে দুর্নীতির ওতপ্রোত সম্পৃক্ততা রয়েছে। এই ক্ষমতা রাজনৈতিক হতে পারে, আর্থিক হতে পারে, এমনকি সামাজিক ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমেও দুর্নীতি ঘটতে পারে। যাদের হাতে ক্ষমতা আছে, তারা সকলেই দুর্নীতি করে এমনটি কখনোই বলা যাবে না। তবে যারা দুর্নীতি করে, তারা কোনো না কোনোভাবে ক্ষমতাকে ব্যবহার করে থাকে।

যদিও দুর্নীতি একটি বিশ্বজনীন সমস্যা, বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষিতে দুর্নীতির ক্ষতিকর প্রভাব স্বভাবই তুলনামূলকভাবে বেশি। দুর্নীতি দারিদ্র্য ও সব ধরনের অবিচার বাড়ায়। দুর্নীতি উন্নয়নকে ব্যাহত করে। দুর্নীতি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। দুর্নীতির ফলে মানুষ তার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। দুর্নীতি আইনের শাসনের পরিপন্থি। একইভাবে দুর্নীতি অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য বাড়ায়। দুর্নীতির ফলে সমাজে অপরাধ-প্রবণতা বাড়ে, সামাজিক অস্থিতিশীলতা ও অসন্তোষ বাড়ে। দুর্নীতির ফলে রাষ্ট্র, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সরকার ও মৌলিক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি মানুষের আস্থা দ্রুত অবনতির দিকে ধাবিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থিত পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ বাংলাদেশ। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকেই বিদ্যমান সমস্যার সাথে নতুন নতুন সমস্যা যুক্ত হয়ে দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়নকে করেছে বাধাগ্রস্থ, বিশ্ব দরবারে দেশটিকে করে তুলেছে নাজুক। ব্যাপক সমস্যা জর্জরিত এই দেশটির অন্যতম একটি সমস্যা দুর্নীতি। দুর্নীতির কারণে দেশটির জিডিপি কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছতে পারছে না, দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি সফলতা পাচ্ছে না, জীবনযাত্রার মান নিম্নগামী হচ্ছে এবং সর্বোপরি গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাবোধ নষ্ট হচ্ছে। ব্যাপক গণদারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, জনসংখ্যাধিক্য, অপুষ্টি, সম্পদের অভাব, পশ্চাৎপদ অর্থনীতি, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সুশাসনের অভাব এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, বিভাগ, প্রতিষ্ঠান ও সমাজের সকল স্তরে সর্বব্যাপী দুর্নীতির কারণে দেশটি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে। ২০০১ সালে বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি প্রকিউরমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট সম্পর্কিত এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সম্পর্কে বলা হয়েছে সরকারি অফিসে ঘুষ ছাড়া ফাইল নড়ে না। ঘুষ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যেন এটা বেতনের অংশ হয়ে গেছে।[১]

Dhaka University Institutional Repository

৬.১.১ দুর্নীতির সংজ্ঞা ঃ

দুর্নীতি শব্দটি ল্যাটিন 'Corruptus' থেকে এসেছে যার অর্থ হলো 'ধ্বংস বা ক্ষতিসাধন'।[২] জাতিসংঘ প্রণীত ' Manual of Anti-Corruption Policy' মতে ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার করাই হলো দুর্নীতি'।[৩] এই ক্ষমতার অপব্যবহার সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্যদিকে, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল প্রণীত দুর্নীতির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "Behavior on the part of officials in the public sector, whether politicians or civil servant, in which they improperly and unlawfully themselves, or those close to them, by the misuse of the public power entrusted to them'। প্রায়োগিক অর্থে, ঘুষের লেনদেন, অর্থ আত্মসাৎ, চাঁদাবাজি, প্রতারণা, ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বজনপ্রীতিই হল দুর্নীতি।[৪]

দুর্নীতির সংজ্ঞা বিষয়ে লেখক ও গবেষকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মতপার্থক্য থাকায় দুর্নীতির সহজ এবং সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেয়া কঠিন। দুর্নীতির প্রকৃতি ও ধরন এবং দেশ ও সমাজভেদে দুর্নীতির বিভিন্নতার কারণে দুর্নীতির ব্যাখ্যায় ভিন্নতাও লক্ষণীয়। যেমন, আফ্রিকার দু'একটি দেশে সরকারি কর্মচারীদেরকে উপহার প্রদানকে দুর্নীতি মনে না করে প্রচলিত সংস্কৃতির অংশ মনে করা হলেও, অন্যত্র উদ্দেশ্য প্রণোদিত উপহার প্রদানকে দুর্নীতি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশেরও সামন্ত আমলে বা মোগল শাসনামলেও উচ্চপদস্থ সরকারি আমলাদের সাথে দেখা করার সময় উপহার, নজরানা নিয়ে দেখা করাকে দুর্নীতি হিসাবে বিবেচনা করা না হলেও বর্তমানে এ ধরনের কর্মকান্ডকে দুর্নীতি হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে।[৫] দুর্নীতি বিষয়ক গবেষকরা নিজ নিজ একাডেমিক ডিসিপ্লিনের ভেতর থেকে দুর্নীতিকে সংজ্ঞায়িত করায় তাদের প্রদত্ত দুর্নীতির সংজ্ঞায় নিজস্ব মতামত ও বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে। সেজন্য অর্থনীতিবিদদের দেয়া দুর্নীতির সংজ্ঞার সাথে রাজনীতি বিজ্ঞানীদের দেয়া দুর্নীতির সংজ্ঞায় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

অর্থনীতিবিদ রোজ-একারম্যান সংগঠনের ভোট এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বাজার ব্যবস্থাপনার প্রভাবকে গুরুত্ব দেন। আবার রাজনীতি বিজ্ঞানীদের দুর্নীতির সংজ্ঞায় 'নির্ধারিত কর্তব্য থেকে বিচ্যুতি' (Joseph S.Nye, '*Corruption and Political Development; A Cost-Benefit Analysis*', American Political Science Review, Vol. 61, No. 2, 1967, P. 419;) 'ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে সরকারি ক্ষমতার অবৈধ ব্যবহার' (T.F. Nas, C. Price &

Dhaka University Institutional Repository

C.T. Weber, '*A Policy-Oriented Theory of Corruption*', American Political Science Review, Vol. 80, No. 1, 1986, P. 108;), দায়িত্বশীলতা ভঙ্গ করা' (Arnold A. Rogow & H.D. Lasswell, ' *The Definition of Corruption*', in Arnold J. Heidenheimer (ed.), *Political Corruption: Readings in Comparative Analysis* (New Jersey : Holt, Rinehart and Winston, Inc. 1970, P. 54;), 'ক্ষমতার বিকৃত ব্যবহার' (H. A. Brasz, '*The Sociology of Corruption*', in Heidenheimer (ed.), Political Corruption: Reading in Comparative Analysis, op. cit., P.41;), রাজনৈতিক ও দলীয় স্বার্থে সরকারি কর্তৃত্বের অবৈধ বা অনৈতিক ব্যবহার' (G. Benson, *Political Corruption in America* (Lexington M.A: Lexington Books, 1978) P.XIII,), 'সরকারি অফিসের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষমতার স্বার্থপর চর্চা' (John B. Monterio, Corruption : Control of Maladministration (Bombay : P.C. Manaktala and Sons, 1966) P.16;), ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে সরকারি ক্ষমতা ও সম্পদের অপব্যবহার' (Michael Johnston, '*Right & Wrong in American Politics: Popular Conceptions of Corruption*', Polity, Vol. XVIII, No. 3, 1986, P.369) প্রভৃতি প্রসঙ্গ গুরুত্ব পায়।[৬]

দুর্নীতি দমন কমিশনের মতে দুর্নীতি বলতে, 'ঘুষ গ্রহণ ও ঘুষ প্রদান,সরকারি কর্মচারীকে অপরাধে সহায়তা করা, সরকারি কর্মচারী কর্তৃক কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে মূল্যবান বস্তু বিনামূল্যে গ্রহণ, কোন সরকারি কর্মচারী কর্তৃক বেআইনীভাবে কোন পক্ষপাতমূলক আচরণ প্রদর্শন, কোনো সরকারী কর্মচারী কর্তৃক বেআইনীভাবে কোন ব্যবসায়ে সম্পৃক্ত হওয়া, কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি বা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত থেকে বাঁচানোর জন্য সরকারি কর্মচারী কর্তৃক আইন অমান্য, অসৎ উদ্দেশ্যে ভুল নথিপত্র প্রস্তুত, অসাধু উদ্দেশ্যে সম্পত্তি আত্মসাৎ করণ, মৃত্যুকালে আত্মসাৎ করণ, অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ, অসাধুভাবে প্রবৃত্ত করা, নথি জাল করা, খাঁটি দলিলকে জাল হিসেবে ব্যবহারকরণ, হিসাব বিকৃতকরণমূলক কর্মকান্ড, দুর্নীতিতে সহায়তা, ষড়যন্ত্র ও প্রচেষ্টাকরণ' কে বুঝিয়েছে।[৭]

দুর্নীতি বিষয়ক লেখক ও গবেষকরা যেভাবে দুর্নীতিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন তাতে তাদের প্রদত্ত দুর্নীতির সংজ্ঞায় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতিই গুরুত্বের সাথে উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু দুর্নীতির অবস্থান ও সক্রিয়তা তো শুধুমাত্র রাজনীতি ও প্রশাসনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা সমাজের সব

Dhaka University Institutional Repository

এলাকায় বিস্তৃত। অথচ, দুর্নীতির সংজ্ঞায় সামাজিক দুর্নীতিকে কম অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সুতরাং দুর্নীতি বলতে সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্মপ্রক্রিয়ায় স্বজনপ্রীতি, ঘুষ বা উৎকোচ গ্রহণ, সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীর অসৎ আচরণ যেমন ঘুষ গ্রহণ ও হয়রানি, চাঁদা/কমিশনের বিনিময়ে অবৈধ সুযোগ প্রদান, আইন বহির্ভূত কোনো উপহার বা সুযোগ সুবিধার বিনিময়ে সরকারের কাজে অবৈধভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ, তহবিল তছরূপ বা চুরি, সরকারি সম্পদ আত্মসাৎসহ সব ধরনের অন্যায় কাজ দুর্নীতির আওতায় পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.১.২ বাংলাদেশে দুর্নীতি পরিস্থিতি ঃ

পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ২৪ বছরের সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশের জনগণ আশা করেছিলেন যে এ দেশের রাজনৈতিক নেতা এবং প্রশাসকরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন এ দেশটিকে দুর্নীতি মুক্তভাবে গড়ে তুলতে সমর্থ হবেন। কিন্তু তারা ব্যর্থ হন। পরবর্তী সময়ে ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত সময়ে দুর্নীতি দমন তো নয় বরং নিয়ন্ত্রণেও কোনো পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি।

১৯৯০ পরবর্তী গণতান্ত্রিক নির্বাচিত সরকারের আমলেও দুর্নীতি পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়নি। খালেদা জিয়া সরকার (১৯৯১-১৯৯৫) দুর্নীতি রোধে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়। এ সরকারের শাসনামলে ১৯৯৬ সালে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল প্রকাশিত দুর্নীতির ধারণা সূচকে বাংলাদেশকে চতুর্থ সর্বাধিক দুর্নীতিযুক্ত দেশ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। পরবর্তীতে শেখ হাসিনা সরকারের শাসনামলেও (১৯৯৬-২০০১) দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের কোনো উদ্যোগ না নেয়ায় দুর্নীতি আরো বৃদ্ধি পায়। দুর্নীতি পরিস্থিতি এতটা আশংকাজনক হয়ে ওঠে যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদে দুর্নীতিকে 'কালব্যাধি' আখ্যা দিয়ে ঘুষ না দিলে প্রধানমন্ত্রীর চাকরির সুপারিশও কার্যকরী হয় না , ফুয়েল না দিলে ফাইল নড়ে না, দুর্নীতির মামলা কোর্টে গেলে সহজে আর আলোর মুখ দেখে না প্রভৃতি মন্তব্য করেন।[৮] বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর দুর্নীতিকে বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে অন্যতম অন্তরায় হিসাবে উল্লেখ করেন এবং প্যারিসে দাতাগোষ্ঠীর সভায় প্রথম বারের মতো বাংলাদেশের দুর্নীতির ওপর ভিডিও রিপোর্ট দুর্নীতির ধারণা সূচকে যে সকল দেশের নাম অন্তর্ভূক্ত ছিল তার মধ্যে দেখানো হয়।

২০০১ সালে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল এর দুর্নীতির ধারণা সূচকে বাংলাদেশকে প্রথম বারের মত সর্বাধিক দুর্নীতিযুক্ত দেশ হিসাবে আখ্যায়িত করে। এ ঘটনাটি সারা বিশ্বে বাংলাদেশের দুর্নীতি বৃদ্ধির বিষয়টিকে পরিচিত করে তোলে। একটি গবেষণা [৯] থেকে এসময়ে বিভিন্ন খাতে ১(এক) বছরে সংঘটিত দুর্নীতির একটি সহজ হিসাব পাওয়া যায় ঃ

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ঃ ৬.১

২০০২ সালের খানা জরিপ অনুযায়ী খাত ওয়ারী দুর্নীতির তথ্য

দুর্নীতিগ্রস্থ খাতের নাম	মোট দুর্নীতির পরিমান (টাকা)
শিক্ষা	৯২০ কোটি (৪০% ছাত্র/ছাত্রী দুর্নীতির শিকার)
স্বাস্থ্য	১২৫০ কোটি (খানা প্রতি ১৮৪৭ টাকা অতিরিক্ত খরচ করতে হয়েছে)
ভূমি প্রশাসন	১৫শ ১৫কোটি
বিদ্যুৎ ব্যবস্থা	১শ ৮২ কোটি
কর	১২ কোটি
পুলিশ	২ হাজার ৬৬ কোটি
বিচার ব্যবস্থা	১ হাজার ১শ ৩৫ কোটি

উৎস ঃ টিআইবি কর্তৃক পরিচালিত একটি গবেষণা, বাংলাদেশ দুর্নীতি ঃ একটি খানা জরিপ, ২০০২।

অষ্টম সংসদ নির্বাচনে বিএনপি এর নির্বাচনী ইশতেহারে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনের অঙ্গীকার করে দুর্নীতি দমনের লক্ষ্যে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ন্যায়পাল গঠন, স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন, মানবাধিকার কমিশন গঠন, এবং প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্যবর্গ এবং সম-পর্যায়ে সকলের সম্পত্তির হিসাব গ্রহণ ও প্রকাশ করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। কিন্তু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে চারদলীয় জোট সরকার পূর্ববর্তী সরকারের দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করলেও দেশের সার্বিক দুর্নীতি পরিস্থিতির উন্নয়নে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক কোনো উদ্যোগ নেয়নি। বরং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার ছয় মাস পর সরকারের অর্থমন্ত্রী ন্যায়পাল এবং মানবাধিকার কমিশনকে 'বিদেশী ভাবধারা' এবং 'ইউরোপীয় ধারণা' বলে ব্যাখ্যা করে এ জাতীয় সংগঠনগুলোর এশীয় দেশগুলোতে পরিচিতি ও গ্রহণযোগ্যতা নেই বলে মন্তব্য করেন।[১০] এ ধরনের সংগঠন গড়ে তুললে এসব সংগঠনের প্রধান পদে যোগ্য লোক খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে বলেও তিনি মত ব্যক্ত করেন। কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের চাপে এবং বিশেষ করে দাতাদের অব্যাহত চাপে অনেক দেরীতে হলেও সরকার ২০০৪ সালে সংসদে দুর্নীতি দমন কমিশন বিল পাশ করে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করে।[১১] কমিশন গঠন করলেও তা কার্যকরী ভূমিকা না রাখায় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০০২ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত পর পর চারবার বাংলাদেশ টিআই এর দুর্নীতির ধারণা সূচকে সর্বাধিক দুর্নীতি পরায়ণ দেশ হিসাবে গণ্য হয়েছে। টিআইবি কর্তৃক ২০০৪ সালে পরিচালিত খানা জরিপে দেখা যায় ৯টি খাতের ২৮টি সেবা নিতে জনগণকে বছরে আনুমানিক ৬ হাজার ৭শ' ৯৬ কোটি টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিটি বাংলাদেশী মানুষকে বছরে গড়ে ৪শ' ৮৫ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। এর মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

ভূমি সংশ্লিষ্ট অফিস, থানা এবং নিম্ন আদালতের সাথে সংশ্লিষ্টরা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ঘুষ সংগ্রহ করেছে।[১২] খাত অনুযায়ী সংঘটিত এ দুর্নীতির চিত্র সারণি ঃ ৬.২-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ঃ ৬.২

টিআইবি পরিচালিত ২০০৫ সালের খানা জরিপ অনুযায়ী খাতওয়ারী দুর্নীতির তথ্য

দুর্নীতি খাতের নাম	মোট দুর্নীতির পরিমাণ (১ বছরে) টাকায়	প্রধান উপখাত অনুযায়ী দুর্নীতির পরিমাণ
শিক্ষা (১১টি উপখাত)	৬০ কোটি ৬৫ লক্ষ	✦ ৯টি খাতে চাঁদা ও ফি আদায় ৫৪ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ✦ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপবৃত্তির ক্ষেত্রে ৩ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা ✦ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উপবৃত্তির ক্ষেত্রে ২কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা
স্বাস্থ্য (৫টি উপখাত)	৬০ কোটি ৬৫ লক্ষ	✦ অন্তর্বিভাগে দুর্নীতি ৩০ কোটি টাকা ✦বহির্বিভাগে দুর্নীতি ১৫ কোটি ৯ লক্ষ টাকা ✦ অপারেশনে দুর্নীতি ২১ কোটি টাকা ✦ এক্সরে করতে দুর্নীতি ১৪ কোটি ৬ লক্ষ টাকা ✦ রক্ত,মল-মূত্র পরীক্ষা ৩২ কোটি ৯০ লক্ষ
ভূমি (৪টি উপখাত)	১ হাজার ৯শ' ৬১ কোটি ২লক্ষ	✦ জমি রেজিঃ খাতে দুর্নীতি ১ হাজার ৪শ ৫৪ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা ✦ভূমি খারিজে দুর্নীতি ১শ ৩৬ কোটি ৮১ লক্ষ ✦ খাস জমি ভোগকারীদের কাছ থেকে দুর্নীতি ৩শ ৬৯ কোটি ৬৭ লক্ষ
পুলিশ (৪টি উপখাত)	১ হাজার ৫শ' ৩১ কোটি টাকা	✦ এফআইআর করতে দুর্নীতি ২শ ২৭কোটি ১৩ লক্ষ ✦ জিডি করতে দুর্নীতি ৭৬ কোটি ৬১ লক্ষ ✦ পুলিশ ক্লিয়ারেন্স নিতে দুর্নীতি ৯৩ কোটি টাকা ✦ বিভিন্ন মামলার আসামিদের কাছ থেকে ঘুষ ১ হাজার ১শ ৩৪ কোটি ৩০ লক্ষ
বিচার বিভাগ (২টি উপখাত)	২ হাজার ৪২ কোটি টাকা	✦ মামলার বাদীদের কাছ থেকে ঘুষ ৮শ ১২ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা ✦ মামলার বিবাদীদের কাছ থেকে ঘুষ ১ হাজার ২শ ২৯ কোটি ৬১ লক্ষ
ব্যাংক ও পেনশন	৩শ' ২৮কোটি টাকা (২শ' ৪৬ কোটি + ৮২ কোটি টাকা)	✦ ঋণ গ্রহণকারীদের কাছ থেকে ঘুষ ২৪৬ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা ✦ পেনশন উত্তোলনকারীদের কাছ থেকে ঘুষ ৮২ কোটি টাকা ✦(শুধুমাত্র পেনশন ভোগীদের ৭১% কে গড়ে ৮০০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে)

Dhaka University Institutional Repository

কর	২শ ৬ কোটি ৯১ লক্ষ	✦ আয় কর প্রদানকারীকে ঘুষ দিতে হয়েছে ১শ ৬৭ কোটি ৭৩ লক্ষ ✦ হোল্ডিং কর প্রদানকারীদের ঘুষ দিতে হয়েছে ৩৯ কোটি ১৮ লক্ষ
বিদ্যুৎ	১শ ৬৯ কোটি ১৬ লক্ষ	✦ বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে ঘুষ ১শ ৪ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা ✦ বিদ্যুৎ বিল কমানোর জন্য এর সাথে সংশ্লিষ্টরা ঘুষ নেন ৬৫ কোটি
সালিশ ও ত্রাণ	৪শ ১৩ কোটি ৬৮ লক্ষ	✦ সালিশে ৪১৩ কোটি ✦ ও ত্রাণে ৬৮ লক্ষ

Source: Transperancy Interntaional Bangladesh কর্তৃক পরিচালিত দুর্নীতির খানা জরিপ ২০০৫

বর্তমানে বাংলাদেশের এক শ্রেণির লুটেরা রাজনীতিবিদ এবং দুর্নীতিবাজ আমলা ও পেশাজীবীদের দৌরাত্ম্যে বাংলাদেশের সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা নিজের স্বার্থে ব্যবহার, সরকারি বিভিন্ন ক্রয়ে অতিরিক্ত মূল্য দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ, ঘুষ বা কমিশনের বিনিময়ে বিদেশী কোম্পানিগুলোকে ব্যবসা করার সুযোগ প্রদান, সিন্ডিকেটের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে অর্থ উপার্জন, সরকারি পণ্য ক্রয়ের মাধ্যমে, বরাদ্দকৃত অর্থের পূর্ণ ব্যবহার না করে আত্মসাৎ, বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমনঃ পাসপোর্ট, পুলিশ, বিদ্যুৎ গ্যাস, টেলিফোন ও অন্যান্য খাতে ঘুষের লেনদেন, অতিরিক্ত মুনাফা আদায়, খাদ্য ও অন্যান্য উপকরণে ভেজাল দ্রব্য মেশানো, শেয়ার কেলেংকারী ও বিভিন্ন সরকারি কাজে দালালদের দৌরাত্ম্যসহ সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। Transperancy Interntaional Bangladesh কর্তৃক পরিচালিত দুর্নীতির খানা জরিপ ২০০৫ অনুযায়ী, বাংলাদেশের ১০টি খাতের ২৫টি সেবা নিতে প্রায় ৭০ শতাংশ লোক ঘুষ প্রদান করেছে।[১৩] একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, বিগত ৩৫ বছরে বাংলাদেশে ৫০-৬০ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে।[১৪] এ অবস্থায় বিগত চারদলীয় জোট সরকার বিভিন্ন চাপে দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করলেও কায়েমী স্বার্থবাদীদের চাপে তা কার্যকর হতে পারেনি এবং ঔপনিবেশিক শাসক ও শোষকদের স্বার্থ সংরক্ষণকারী গোষ্ঠী বাংলাদেশকে লুটেপুটে খাওয়ার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলেছিল। কিন্তু একথা সত্য যে দুর্নীতির এ ভয়াল দানব একদিনে সৃষ্টি হয় নি। বিভিন্ন নেতিবাচক নীতি ও অদূরদর্শিতায় দুর্নীতির এ দানব আমাদের ঘাড়ে চেপে বসেছিল। এহেন অবস্থায়, গত ১১ জানুয়ারি, ২০০৭-এ বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনভাবে কাজ শুরু করে। তথাপি এক গবেষণা মতে, ২০০৬-২০০৭ সালে বাংলাদেশের ৬৬.৭ শতাংশ খানা কোনো না কোনো দুর্নীতির শিকার হয়েছে।[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ঃ ৬.৩

টিআইবি'র গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত দুর্নীতির একটি তুলনামূলক চিত্র

দুর্নীতিগ্রস্ত খাতের নাম	২০০১ সালে দুর্নীতির পরিমাণ	২০০৪ সালে দুর্নীতির পরিমাণ	জুন, ২০০৬-জুন, ০৭ সালে দুর্নীতির (শুধু ঘুষ) পরিমাণ
শিক্ষা	৯২০ কোটি	৬০ কোটি ৬৫ লক্ষ	১১৭ কোটি টাকা
স্বাস্থ্য	১২৫০ কোটি	১১৩ কোটি ৭৫ লক্ষ	১০৮ কোটি টাকা
ভূমি প্রশাসন	১৫শ ১৫ কোটি	১ হাজার ৯শ ৬১ কোটি ২ লক্ষ	১৬০৬ কোটি টাকা
বিদ্যুৎ ব্যবস্থা	১শ ৮২ কোটি	১শ ৬৯ কোটি ১৬ লক্ষ	৪৭৪ কোটি টাকা
কর	১২ কোটি	২শ ৬ কোটি ৯১ লক্ষ	১৪৯ কোটি টাকা
পুলিশ	২ হাজার ৬৬ কোটি টাকা	১ হাজার ৫শ ৩১ কোটি টাকা	৮৭৯ কোটি টাকা (পুলিশসহ অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা)
বিচার ব্যবস্থা	১ হাজার ১শ ৩৫ কোটি	২ হাজার ৪২ কোটি টাকা	৬৭১ কোটি টাকা
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	.....	গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি	৫২৫ কোটি টাকা (পুরো ব্যাংকিং সেক্টর)
ব্যাংক ও পেনশন	গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত হয়নি	৩শ ২৮কোটি টাকা (২শ ৪৬ কোটি + ৮২ কোটি টাকা)	গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত হয়নি
সালিশ ও ত্রাণ	গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত হয়নি	৪শ ৩১ কোটি ৬৮ লক্ষ	গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি
এনজিও	গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত হয়নি	গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি	২০ কোটি টাকা
স্থানীয় সরকার	গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি	গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি	১৮৭ কোটি টাকা

উৎস ঃ তারেক শামসুর রহমান সম্পাদিত, বাংলাদেশ রাজনীতির চার দশক, ঢাকাঃ শোভা প্রকাশ ২০০৯, পৃ.৩৬১।

Dhaka University Institutional Repository

৬.১.৩ দুর্নীতির ফলে সৃষ্ট ক্ষতির ধরন ঃ

দুর্নীতি আমাদের সমাজকে যেমন অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে ঠিক একইভাবে এটি মানবাধিকার লঙ্ঘন করে, উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটায় এবং পরিবেশ বিপর্যয় ত্বরান্বিত করে। ২০০০, ২০০৩ ও ২০০৫ সালে টিআইবি পরিচালিত করাপশন ডেটাবেজে[১৬] খাত অনুযায়ী আর্থিক দুর্নীতির বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সাধারণত যে খাতগুলোর কথা বারবার আসে, যে খাতগুলো মানুষের মৌলিক চাহিদা ও মৌলিক মানবাধিকারের সাথে জড়িত, সে খাতগুলোর কোনো কোনো উপখাতে দুর্নীতি হয় এবং উক্ত উপখাতে দুর্নীতির হারও অপর একটি গবেষণায় উঠে এসেছে। সারণি ৬.৪-এ তা দেখানো হলো ঃ

সারণি ঃ ৬.৪

দুর্নীতিগ্রস্থ খাতের উপখাতসমূহ এবং দুর্নীতির হার (%)

শিক্ষার উপখাতসমূহ	পুলিশের উপখাত	স্বাস্থ্যখাতের উপখাত সমূহ	স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন
✦মাধ্যঃ বিদ্যালয় (৩৩.৫৫%)	✦ থানা পুলিশ (৭৭.২৬%)	✦ স্বাস্থ্য সচিবালয় (১.৯৪ %)	✦ এলজিআরডি সচিবালয় (০.৪%)
✦মহাবিদ্যালয় (১৫.৩১%)	✦ ট্রাফিক পুলিশ (১১.৩৭%)	✦ পরিবার পরিকল্পনা (৫.৯৫%)	✦ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (১.২%)
✦ মাদ্রাসায় (১৩.০৩%)	✦ পুলিশ সুপার দপ্তর (৩.৫৩%)	✦ঔষধ প্রশাসন (৩.৫৭%)	✦ ওয়াসা (২.৪%)
✦ প্রাঃ বিদ্যালয় (১০.৪২%)	✦ র‍্যাব (৩.৫৩%)	✦ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (১৭.০৬%)	✦ সিটি কর্পোরেশন (২.৮%)
✦ বিশ্ববিদ্যালয় (৮.৮%)	✦ডিবি পুলিশ (২.৭৫%)	✦ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স (৬১.৯০%)	✦ ডিসি অফিস (৫.৬%)
✦ শিক্ষা অফিস (৮.১৪%)	✦ বিশেষ শাখা (পুলিশ) (০.৭৮%)	✦ বিশেষায়িত হাসপাতাল (১.৫৯%)	✦ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (৮.০%)
✦ শিক্ষা বোর্ড (৫.২১%)	✦ সিআইডি (০.৭৮%)	✦ সিভিল সার্জন অফিস (১.৯৮%)	✦ পল্লী উন্নয়ন (৯.৬%)
✦ শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগ (১.৬৩%)		✦ সেবা পরিদপ্তর (১.৫৯%)	✦ পৌরসভা (৯.৬%)
✦ প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তর (১.৩%)		✦ বেসরকারি ডাক্তার ও ক্লিনিক (৪.৩৭%)	✦ইউএনও অফিস (১১.২%)
✦ কারিগরি শিক্ষা (০.৯৮%)			✦ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (১৬.৭%)
✦ এনসিটিবি (০.৬৫%)			✦ ইউনিয়ন পরিষদ (৩২.৭%)
✦ স্যাটেলাইট ও অন্যান্য স্কুল (০.৬৫%)			

উৎস ঃ তারেক শামসুর রহমান সম্পাদিত, বাংলাদেশ রাজনীতির চার দশক, ঢাকাঃ শোভা প্রকাশ ২০০৯, পৃ.৩৬১।

Dhaka University Institutional Repository

৬.১.৪ দুর্নীতির কারণ ও ধরন ঃ

বাংলাদেশে দুর্নীতির কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিভিন্ন গবেষক বিভিন্ন কারণের কথা উল্লেখ করেছেন। অদূরদর্শী রাজনীতি, রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও ঐকমত্যের অভাব, রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন, দুর্বল আমলাতন্ত্র, নিম্ন মজুরি কাঠামো, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার অনুপস্থিতি, সুশাসন ও ন্যায় বিচারের অভাব, মূল্যবোধের অবক্ষয়সহ তথ্যের সীমিত প্রবাহ[১৭]- কে কেউ কেউ দুর্নীতির কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। রবার্ট ক্লিটগার্ড বলেছেন, যদি মর্জিমাফিক ও একচ্ছত্র ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং জবাবদিহিতা না থাকে তাহলে দুর্নীতি বাড়বে।[১৮] অর্থাৎ একচ্ছত্র ক্ষমতা, মর্জিমাফিক ক্ষমতা, জবাবদিহিতার অভাব ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয়া দুর্নীতি বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে পদবী অনুসারে সরকার থেকে সুনির্দিষ্ট এবং আইনগত ক্ষমতা দেয়া থাকে। কিন্তু এই ক্ষমতা তারা প্রায়ই তাদের বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন, কিংবা নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে। সাধারণত ক্ষমতার অপব্যবহার, ঘুষ, আত্মসাৎ, প্রতারণা, ভীতি প্রদর্শন করে অর্থ আদায়, দায়িত্ব পালনে অবহেলা, সম্পত্তির অপচয়, প্রভাব বিস্তার, স্বজনপ্রীতি, সরকারি ক্রয়ে অনিয়ম এসব কারণে দুর্নীতি সংঘটিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ এ বিষয়গুলোই দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত। টিআইবি এক গবেষণায় দেখিয়েছে বিভিন্ন খাতে যে দুর্নীতি হয় সেগুলোর মধ্যে ক্ষমতার অপব্যবহার করে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়নে দুর্নীতির হার সবচেয়ে বেশি, শতকরা ৬৭ দশমিক ৭ভাগ। ঘুষ গ্রহণের মাঝে পুলিশ বিভাগে দুর্নীতি হয় সবচেয়ে বেশি, শতকরা ৩১ দশমিক ৭৬ ভাগ (ডেটাবেজ রিপোর্ট, ২০০৫), এছাড়াও দুর্নীতির উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো-

ক) মর্জিমাফিক ক্ষমতা

মর্জিমাফিক ক্ষমতা পরিমাপের জন্য অস্পষ্ট নীতিমালা, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রেহাই প্রদান, নীতিমালার অস্পষ্ট কিংবা ভুল ব্যাখ্যাকরণ ও নীতিমালাকে নিজের পক্ষে সুবিধাজনকভাবে ব্যাখ্যা করাকে সূচক হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। ২০০৫ সালে প্রকাশিত দূর্নীতি সংক্রান্ত ঘটনার শতকরা ৮০.৭% ঘটনায়ই মর্জিমাফিক ক্ষমতা ছিল উচ্চ। ৪.২% ঘটনায় মর্জিমাফিক ক্ষমতা অনুপস্থিত ছিল, নিম্ন ছিল ১২.২% ঘটনায় আর ৩.০% ঘটনায় মর্জিমাফিক ক্ষমতার মাত্রা জানা সম্ভব হয়নি।[১৯]

Dhaka University Institutional Repository

খ) জবাবদিহিতার অভাব

যখন কোনো ব্যক্তি জানতে পারে, তার কাজের জন্য কোনো জবাবদিহিতা করতে হবে না তখন সেই ব্যক্তি স্বেচ্ছাচার কিংবা অন্যায় কাজ করতে অনুপ্রাণিত হবে। দুর্নীতি সংঘটনের পেছনে জবাবদিহিতার অভাব একটি অন্যতম কারণ। জবাবদিহিতার অভাব পরিমাপের জন্য পরিদর্শন প্রক্রিয়া, রিপোর্টিং পদ্ধতি এবং জনসাধারণের নজরদারির অভাবকে সূচক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে করাপশন ডেটাবেজ রিপোর্টে। টিআইবি'র এক গবেষণায় দেখা যায়, ৬৫.২% ঘটনায় জবাবদিহিতার অভাব ছিল উচ্চ মাত্রার, ২০.১% ঘটনায় জবাবদিহিতার অভাব ছিল নিম্ন মাত্রার, অনুপস্থিত ছিল ৭.৬% ঘটনায় আর ৭% ঘটনা থেকে জবাবদিহিতার মাত্রা পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি।[২০]

গ) দুর্বল প্রশাসনিক ব্যবস্থা

দুর্নীতি বৃদ্ধির পেছনে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা একটি অন্যতম কারণ। দুর্নীতি ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত না দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা যায়। বদলি, সাময়িক বরখাস্ত কিংবা বাধ্যতামূলক অবসর বস্তুতপক্ষে কোনো স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে না। টিআইবি'র রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০৫ সালে সংঘটিত দুর্নীতির ঘটনায় শতকরা ৩৮.১% দুর্নীতির বিরুদ্ধেই কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। মাত্র ১৮.১% ঘটনার আলোকে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্যে মামলা দায়ের ৬.৭%, তদন্তাধীন ৫.৬%, বরখাস্ত ২.১%, ক্লোজড ১.৫% বদলি ০.৬%, স্ট্যান্ড রিলিজ ০.২% এবং অন্যান্য ১.৪%। ১৬.৩% ঘটনায় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কি না তা জানা যায়নি। ১৯.১% দুর্নীতির ঘটনা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেছেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট বিভাগ, জনগণ কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নিজে। ৮.৪% দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণ অথবা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি প্রতিবাদ জানিয়েছেন।[২১]

ঘ) দুর্নীতির অর্থনৈতিক প্রভাব

সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতির ফলে দেশ ও দেশের জনগণ যে বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে তা সাধারণ মানুষের কল্পনারও বাইরে এবং জাতীয় ও সামাজিক জীবনে এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব হয় সুদুরপ্রসারী। দুর্নীতি ক্ষমতার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় ক্ষমতার বাইরে অবস্থানরত নিম্ন আয়ের জনগণ তার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ন্যায়বিচার ও অন্যান্য মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চিত হয় এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য বিরাজ করে। দুর্নীতিবাজ কর কর্মকর্তারা ঘুষ বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধার বিনিময়ে কর প্রদানকারীদের কর ফাঁকি দিতে সহায়তা করায় সরকার প্রাপ্য রাজস্ব আয় হতে

Dhaka University Institutional Repository

বঞ্চিত হয়। হয়রানি ও ঘুষের দৌরাত্ম্য ব্যবসা বাণিজ্যে বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম ও অন্যান্য কৃষি ও শিল্প খাতে উৎপাদন ব্যাহত হয়। দুর্নীতিবাজরা দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ নিরাপদ রাখতে হুন্ডি বা অবৈধ উপায়ে সম্পদ বিদেশে পাচার করে। দেশীয় পুঁজির দেশীয় বিনিয়োগ না হওয়ায় কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে যায়। অধিকন্তু বিভিন্ন সেবা পেতে ঘুষের প্রবণতা থাকায় দ্রব্যের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেয়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সক্ষম হয় না বলে জাতীয় অর্থনীতি ক্রমশই মুখ থুবরে পড়ে। এক হিসাব মতে, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য সেবাখাতে দুর্নীতির দরুন বছরে প্রায় ৮/১০ হাজার কোটি জাতীয় আয় ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।[২২] দুর্নীতির ফলে জাতীয় অর্থনীতি কী পরিমাণ ক্ষতি হয় এসব পরিসংখ্যান থেকে তা সহজেই অনুমেয়।

ঙ) দুর্নীতি উন্নয়ন ব্যাহত করে

এক শ্রেণির দুর্নীতিবাজ রাজনীতিক, আমলা ও পেশাজীবীদের যোগসাজশে সরকারের উন্নয়ন কাজে বরাদ্দকৃত অর্থ আত্মসাতের ফলে অর্থনৈতিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন ব্যাহত হয় ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় হয়। দুর্নীতির কারণে অর্থনৈতিক অনুন্নয়নে সাথে সাথে বাড়ছে রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা, দেখা দিচ্ছে সুশাসনের অভাব টিআইবি'র করাপশন ডেটাবেজ রিপোর্ট, ২০০৫ অনুযায়ী ২০০৪ সালের অভিবীক্ষিত প্রতিবেদন থেকে যে ধরনের ক্ষতি সাধিত হয়েছে, তার মধ্যে উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়েছে ১.৪% ঘটনায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ক্ষতির মধ্যে উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হওয়ার (২৭.৮%) শীর্ষে। আর তৃতীয় পর্যায়ে এই হার ৩৩.৭%।[২৩] বাংলাদেশের সামনে এখন সবচেয়ে বড় উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ দারিদ্র দূরীকরণ। এ দারিদ্র্য কমানোর জন্য এ পর্যন্ত বহু পদক্ষেপই নেয়া হয়েছে। কিন্তু সুশাসনের অভাব দুর্নীতির দুষ্টচক্রে তা কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি।

চ) দুর্নীতি মানবাধিকার হরণ করে

দুর্নীতির সঙ্গে মানবাধিকারের সম্পর্ক গভীর। দুর্নীতির কারণে শারীরিক নির্যাতন এমনকি হত্যার মতো নারকীয় ঘটনাও ঘটে। অনেক ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী দুর্নীতি করার জন্য সাধারণ জনগণের ওপর চাপ প্রয়োগ করে, অর্থ আদায়ের জন্য নির্যাতন করে। বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার এক জরিপ থেকে দেখা যায় সাব-ইন্সপেক্টর থেকে ডিআইজি পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের পুলিশ কর্মকর্তাদের আয় তাদের নিজ বেতনের এক হাজার গুণ বেশি।[২৪] টিআইবি পরিচালিত করাপশন ডেটাবেজ রিপোর্ট ২০০৫-এ অভিবীক্ষিত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, দুর্নীতির ফলে সরাসরি মানবাধিকার লঙ্ঘন ঘটেছে শতকরা ৬.৩ ভাগ ঘটনায়। মাধ্যমিক পর্যায়ে ১৮.৭%।[২৫]

Dhaka University Institutional Repository

ছ) দুর্নীতি বিনিয়োগে হতাশা বাড়ায়

বিনিয়োগ অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি অন্যতম প্রধান শর্ত। কিন্তু বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগের চিত্র অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। ২০০৩ সালে প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিনিয়োগ বোর্ডের পেশ করা এক রিপোর্ট থেকে দেখা যায় গত দশ বছরে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ প্রস্তাবের ৫৯ হাজার কোটি টাকার ৪১ ভাগেরই কোনো হদিস নেই। ৩২ শতাংশ বিনিয়োগ প্রস্তাবের বিপরীতে শিল্প স্থাপন প্রক্রিয়া স্থবির হয়ে আছে এবং ওই সময়ে নিবন্ধিত শিল্পের মধ্যে মাত্র ১৬ ভাগ উৎপাদনে আছে।[২৬] ওয়ার্ল্ড ইনভেস্টমেন্ট রিপোর্ট ২০০২- এ বলা হয়েছে ২০০০ সালে বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ (এফডিআই) ছিল ২৮ কোটি মার্কিন ডলার। ২০০১ সালে এর বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় মাত্র ৭ কোটি ৮০ লাখ মার্কিন ডলার।[২৭] ২০০৩ সালে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ বিনিয়োগ পরিস্থিতির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রধান বাধা হচ্ছে দুর্নীতি।[২৮] জাপান কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ (সোকোকাই) পরিচালিত এক জরিপে বলা হয়েছিল, ঘুষ না দিলে জাপানি বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে থাকার জন্য মাল্টিপল ভিসা ও ওয়ার্ক পারমিট পায় না। ওয়ার্ল্ড ইনভেস্টমেন্ট রিপোর্ট ২০০৩-এ বলা হয়েছে, ২০০১ সালে বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ (এফডিআই) ছিল ৭৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০২ সালে এই বিনিয়োগের পরিমাণ কমে হয়েছে মাত্র ৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।[২৯] বলা বাহুল্য দুর্নীতিতে পরপর পাঁচ বার শীর্ষে থাকায় বিশ্বে বাংলাদেশ দুর্নীতিবাজ দেশ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে এবং এতে বিদেশী বিনিয়োগ সম্ভাবনা হারিয়ে যাচ্ছে। বিনিয়োগ পরিবেশের এই অবস্থার জন্য দুর্নীতি অন্যতম প্রধান কারণ। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ২০০৬-০৭ অর্থবছরে বিনিয়োগ বোর্ডে ১৩০টি বিনিয়োগ প্রকল্প নিবন্ধিত হয়েছিল। এসব প্রকল্পে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৯ হাজার ৩৫৮ কোটি টাকা। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের আলোচ্য সময়ে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলানায় বিদেশি বিনিয়োগ ৩ গুণ কমেছে।[৩০] সমসাময়িক স্কলাররাও দুর্নীতিকে উন্নয়নের সহযোগী মনে না করে একে উন্নয়নের শত্রু হিসাবে বিবেচনা করেছেন। অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতি কিভাবে সরকারি নীতিকে অকার্যকর করে, বিনিয়োগ এবং উন্নয়নমুখী অর্থনৈতিক তৎপরতাকে কিভাবে বাধাগ্রস্থ করে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[৩১] জাতিসংঘের সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল কফি আনান দুর্নীতিকে অর্থনৈতিক অকার্যকারিতার জন্য দায়ী করেছেন এবং এ দুষ্ট ব্যাধিকে দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়ন অর্জনের পথে অন্যতম বাধা হিসাবে বর্ণনা করেছেন।[৩২]

Dhaka University Institutional Repository

৬.২ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ২০০১ - ২০০৬ ঃ

উনিশ'শ একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ নামক যে রাষ্ট্রটির জন্ম তার আর্থ-সামাজিক চিত্রটার বিশ্লেষণ এখন সময়ের দাবী। যে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের প্রত্যাশা নিয়ে আমরা ১৯৭১ সালে হাজার মাইলের ব্যবধানের পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ নামে আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলাম, সেই প্রত্যাশার পূরণ করতে যেয়ে আমরা এখনও যেন অনেক অপূর্ণতার সাথেই কসরৎ করে যাচ্ছি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পিছনে মূল বক্তব্য ছিল সকল ধরনের অর্থনৈতিক শোষণের অবসান, অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি। এ কারণেই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরুতেই ভবিষ্যৎ বাঙালি ও বাংলার সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষার ভিন্নতা লক্ষণীয়, যা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির বিভিন্ন গতিময়তা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

৬.২.১ সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারাবাহিক সফলতা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে টেকসই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিগত পাঁচ বছর অব্যাহতভাবে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশের ওপর অর্জন সম্ভব হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত জ্বালানির মূল্য রেকর্ড পর্যায়ে বৃদ্ধিজনিত কারণে বাংলাদেশের আমদানি ব্যয়ের ওপর অস্বাভাবিক চাপ, দোহা রাউন্ড আলোচনার দীর্ঘসূত্রতা, বিকাশমান অর্থনীতির দেশসমূহের ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধি ও ব্যাপকভিত্তিক বাজার সম্প্রসারণ ইত্যাদি সত্ত্বেও বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য পরিস্থিতি সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি, রেমিট্যান্স প্রবাহের ধারাবাহিক অগ্রগতি, চলতি হিসাবের অনুকূল ভারসাম্য বৈদেশিক লেনদেনের পরিস্থিতিকে স্থিতিশীল পর্যায়ে রেখেছে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সরকার সামাজিক ও মানব সম্পদ উন্নয়নে বাস্তবমূখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

২০০১-০২ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ছিল ৪.৪২ শতাংশ। ২০০২-০৩ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার বেড়ে ৫.২৬ শতাংশে দাঁড়ায়। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের উচ্চতর প্রবৃদ্ধির কারণে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬.২৭ শতাংশে উন্নীত হয়-যা এযাবতকালে অর্জিত প্রবৃদ্ধির মধ্যে অন্যতম সর্বোচ্চ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক প্রাক্কলন অনুযায়ী বন্যা ও অতিবর্ষণের কারণে কৃষিখাতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও শিল্প ও সেবাখাতে প্রবৃদ্ধির কারণে ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ৫.৩৮ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশ অনুকূল থাকায় ২০০৫-০৬ অর্থবছরে

Dhaka University Institutional Repository

জিডিপি প্রবৃদ্ধি প্রায় ৬ শতাংশ দাঁড়ায়। ২০০১-০৫ অর্থবছর পর্যন্ত মাথাপিছু জিডিপি-র গড় প্রবৃদ্ধি ৩.৯১ শতাংশে দাঁড়ায় যা ১৯৯৬-২০০০ অর্থবছরে ছিল ৩.৮৩ শতাংশ। উল্লেখ্য যে, ২০০৪-০৫ অর্থবছরে সাময়িক হিসাবে মাথাপিছু জিডিপি ও জাতীয় আয় যথাক্রমে ৪৪৫ ও ৪৭০ মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

রাজস্ব খাতে শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০০১-০২ অর্থবছরের বাজেটের অনুৎপাদনশীল ব্যয় পরিহার করায় সরকারের বাজেট ঘাটতি ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরের জিডিপি-র ৬.১ শতাংশ থেকে ৪.৪ শতাংশে হ্রাস পায়। সহজ শর্তে প্রাপ্ত বৈদেশিক ঋণ ব্যবহার করায় সরকারের অভ্যন্তরীণ ঋণ নিম্নতম পর্যায়ে সীমিত রাখা সম্ভব হয়। ২০০২-২০০৩ এবং ২০০৩-০৪ অর্থবছরে প্রকৃত ঘাটতি যথাক্রমে জিডিপি-র ৩.৫ এবং ৩.৪ শতাংশে হ্রাস পায়। ২০০৪-০৫ অর্থবছরের বাজেট ঘাটতি সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী জিডিপি-র ৪.৫ শতাংশে দাঁড়ায়।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০০৩-০৪ অর্থবছর শেষে পূর্ববর্তী সাত বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো ২.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। ২০০৪-০৫ অর্থবছরেও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকে এবং মে, ২০০৫ শেষে তা ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে-যা তিন মাসের আমদানি ব্যয় মিটানোর জন্য যথেষ্ট।

বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ব্যাংক ও একচেঞ্জ হাউস প্রতিষ্ঠাসহ "মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০০৫" প্রবর্তন, বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে রেমিটেন্স সেল স্থাপন, রেমিটেন্স পাঠানোর সময় এবং খরচ কমিয়ে আনা ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ত্বরিত এসব পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে রেমিটেন্সের পরিমাণ ২০০২-০৩ অর্থবছরের ২২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে রেমিটেন্স প্রবাহ ৩৩৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। ২০০৪-০৫ অর্থবছরের প্রথম এগার মাসে (মে পর্যন্ত) রেমিটেন্স প্রবাহ দাঁড়ায় প্রায় ৩৫১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার-যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ১৫ শতাংশ বেশি।

২০০০-০১ অর্থবছরে বৈদেশিক লেনদেনের চলতি ভারসাম্য ঘাটতি ছিল ১০৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সরকারের সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দীর্ঘকাল পরে ২০০১-০২ অর্থবছরে ঘাটতির পরিবর্তে চলতি ভারসাম্যে ১৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত অর্জিত হয়। ২০০২-০৩ এবং ২০০৩-০৪ অর্থবছরেও এ অগ্রগতির গতিধারা বজায় থাকে এবং চলতি ভারসাম্য উদ্বৃত্তির পরিমাণ যথাক্রমে ১৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ১০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। ২০০৪-০৫ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে চলতি হিসাবে ঘাটতি পরিলক্ষিত হলেও সার্বিক ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.২.২ কৃষি

২০০৬-০৭ অর্থবছরের জিডিপিতে স্থির মূল্যে সার্বিক কৃষি খাতের অবদান ২১.১১ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরের জিডিপিতে এ খাতের অবদান ছিল ২১.৮৪ শতাংশ। সার্বিক কৃষিখাতের মধ্যে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষি ও বনজ খাতের অবদান ১৬.৩৮ শতাংশ এবং মৎস্য সম্পদ খাতের অবদান ৪.৭৩ শতাংশ। ২০০৫-০৬ অর্থবছরের জিডিপিতে এ খাতদ্বয়ের অবদান ছিল যথাক্রমে ১৬.৯৮ শতাংশ এবং ৪.৮৬ শতাংশ। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে খাদ্য শস্যের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩২৯.৭৬ লাখ মেট্রিক টন (আউশ ২২.২২ লাখ মেট্রিক টন, আমন ১৩১.৮০ লাখ মেট্রিক টন, বোরো ১৬৭.৪০ লাখ মেট্রিক ও গম ৮.৩৪ লাখ মেট্রিক টন)। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী আউশ আমন ফসলের উৎপাদন ১০৬ লাখ মেট্রিক টন হবার সম্ভাবনা রয়েছে। বোরোর আবাদ এ বছর লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বেশি হয়েছে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটের আলোকে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের কৃষিকে যথাযথ দিকনির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে একটি নতুন জাতীয় কৃষি নীতি প্রণয়নের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জাতীয় কৃষি গবেষণা ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালীকরণ, মৃত্তিকা সম্পদের ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় রোধ, সেচের পানির উপযোগিতা বাড়ানো, মানসম্পন্ন বীজের সরবরাহ বৃদ্ধি, ভূমির অপব্যবহার ও ফসলের পুষ্টি ঘাটতি রোধকল্পে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

৬.২.৩ বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ

বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং পোর্টফোলিও বিনিয়োগ প্রবাহে নব্বই দশকে যে অস্থিরতা বিরাজমান ছিল তা এ দশকের শুরুতে স্থিরতা এবং পরবর্তী সময়ে অগ্রগতি লাভ করে। নব্বই দশকে বিনিয়োগ প্রবাহে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ছিল ১৯৯৬-৯৭ সালে, যখন মূলধন বাজারে ধ্বস নামার কারণে পোর্টফোলিও বিনিয়োগ হিসেবে আগত ৬.২ কোটি ডলারের বেশি তরল অর্থ (hot money) দেশ থেকে বাইরে চলে যায়। ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারে তারল্য সংকট সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের মাধ্যমে বড় আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলোর বিনিয়োগের সুবাদে দেশে '৯০ দশকে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ আসে (৩২.১ কোটি ডলার) ১৯৯৭-৯৮ সালে। তারপর থেকে দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ পরিস্থিতিতে এক ধরনের নিস্তেজ অবস্থা বিরাজ করেছে। বিস্তারিত সারণি ৬.৫ এ সন্নিবেশিত-

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ৬.৫ঃ বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের নীট প্রবাহ

অর্থ বছর	প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ			পোর্টফোলিও বিনিয়োগ			ইপিজেডে নীট বৈদেশিক বিনিয়োগের অন্তঃপ্রবাহ	সার্বিক নীট বৈদেশিক বিনিয়োগের অন্তঃপ্রবাহ	নীট বৈদেশিক বিনিয়োগ ও জাতীয় আয়ের অনুপাত	নীট বৈদেশিক বিনিয়োগ ও বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ অনুপাত	মাথাপিছু বৈদেশিক বিনিয়োগ (ডলারে)
	অন্তঃ প্রবাহ	বহিঃ প্রবাহ	নীট প্রবাহ	অন্তঃ প্রবাহ	বহিঃ প্রবাহ	নীট প্রবাহ					
২০০১-০২	৬.৫২	০.০৬	৬.৪৭	০.০৫	০.৬১	-০.৫৬	৫.৫৭	১১.৪৮	০.২৪	১.৪৪	০.৮৭
২০০২-০৩	৯.৪৯	০.৩০	৯.১৯	০.২০	০.০৪	০.১৬	১০.৩১	১৯.৬৬	০.৩৯	২.২৪	১.৪৭
২০০৩-০৪	১৪.৭৮	০.৬৬	১৪.১২	০.৫৪	০.০০	০.৫৪	১১.৫০	২৬.১১	০.৬৮	৩.৮২	২.৯৪
২০০৪-০৫	৩৬.৭৮	০.২৮	৩৬.৬৮	০.০১	০.০০	০.০১	১১.৮৫	৪৮.৫৪	০.৮১	৪.৩৪	৩.৬৩

সূত্রঃ সিপিডি ডেটাবেজ ও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৫।

২০০৩ সাল হতে বৈদেশিক বিনিয়োগে চাঙ্গা ভাব দেখা দিতে শুরু করে মূলত তেল ও যোগাযোগ খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগের কারণে। এ ধারা ২০০৪ এবং ২০০৫ সালেও অব্যাহত থাকে। বৈদেশিক লেনদেন হিসাব মোতাবেক অক্টোবর ২০০৫ পর্যন্ত মোট বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৪৫.৩ কোটি মার্কিন ডলার। অন্যদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের জরিপের তথ্য মোতাবেক এ সময়কালে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৬৫.৪ কোটি ডলার, এর মধ্যে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকাতে বিনিয়োগ হয়েছে ১০.৯ কোটি ডলার।

৬.২.৪ শিল্প

বাংলাদেশে অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। ১৯৮০-৮১ অর্থবছরের স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদনে বৃহৎ খাত সমূহের মধ্যে শিল্প খাতের অবদান ১৭.৩১ শতাংশ এবং ২০০৬-০৭ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ২৯.৭৭ শতাংশ। শিল্প খাতের উর্দ্ধমূখী এ প্রবৃদ্ধির ধারা ২০০৭-০৮ অর্থবছরে জাতীয় প্রবৃদ্ধিকে ৭ এ উন্নীত করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। স্থির মুল্যে ২০০৬-০৭ অর্থবছরের সাময়িক হিসাবে জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে অবদান শতকরা ১৮.৭৯ ভাগ প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা গত বছরের চেয়ে ০.৭১ ভাগ বেশি। ফ্যানুফ্যাকচারিং খাতে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ১১.১৯ ভাগ প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা বিগত অর্থবছরের চেয়ে শতকরা ৩.৯ ভাগ বেশি। মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্পের প্রবৃদ্ধি প্রতি বছর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে মোট ৮ (আট) টি ইপিজেড রয়েছে যথা: চট্টগ্রাম, ঢাকা, মংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, উত্তরা (নীলফামারী), আদমজী ও কর্ণফুলী ইপিজেড। বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহে ২০০৫-০৬ পর্যন্ত মোট বিনিয়োগ হয়েছে ৯৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। উক্ত সালের প্রথম ৮ মাসে প্রকৃত বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার । ২০০৬-০৭ অর্থবছরের প্রথম ৮মাসে

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃত বিনিয়োগ হয়েছে ১০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী সালের একই সময়ের চেয়ে ৪৬ শতাংশ বেশি। ফেব্রুয়ারি, ২০০৭ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহে পুঞ্জীভূত বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ১০৮৩.৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ইপিজেডসমূহে ২০০৫-২০০৬ অর্থবছর পর্যন্ত সর্বমোট রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১১.৮৩৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বর্তমানে ইপিজেডসমূহে ২৫২টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত রয়েছে। চালু শিল্পের মধ্যে শতকরা প্রায় ২০ ভাগ তৈরি পোশাক শিল্প ও ১০ ভাগ বস্ত্র শিল্প সমূহে মোট ১,৯৫,১০৮ জন স্থানীয় জনবল কর্মরত রয়েছে, যার প্রায় ৬০ শতাংশ মহিলা।

সারণি ৬.৬ ঃ মোট রপ্তানিতে ইপিজেডের অবদান

(কোটি মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	চট্টগ্রাম ইপিজেড	ঢাকা ইপিজেড	মংলা ইপিজেড	কুমিল্লা ইপিজেড	উত্তরা ইপিজেড	ঈশ্বরদী ইপিজেড	ইপিজেড হতে রপ্তানি	মোট রপ্তানি	মোট রপ্তানিতে ইপিজেডের অংশ (শতকরা)
২০০০-০১	৬২.০০	৪৪.৮০					১০৬.৮০	৬৪৬.৭০	১৬.৫
২০০১-০২	৬০.০০	৪৬.৭০	০.২০				১০৭.৭০	৫৯৮.৬০	১৮.০
২০০২-০৩	৬৪.১০	৫৫.৫০	০.৩০	০.১০			১২০.০০	৬৫৪.৫০	১৮.৩
২০০৩-০৪	৬৭.৯০	৬৬.৮০	০.৩০	০.৪০			১৩৫.৪০	৭৫৯.৯০	১৭.৮
২০০৪-০৫	৭৭.২০	৭৫.৮০	০.৮০	১.০০		০.১০	১৫৪.৯	৮৪৩.৫০	১৮.৪
২০০৫-০৬ (জুলাই-নভেম্বর)	৩৬.১১	৩৪.২৫	০.৩৩	১.২৮		০.০৫	৭২.০০	৪০১.১০	১৮.০

সূত্র ঃ বেপজা ও বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

৬.২.৫ স্থল বন্দর

ক) বেনাপোল স্থল বন্দর

বেনাপোল কাস্টমস ও বন্দরের মাধ্যমে যে রাজস্ব আদায় হয় তা সারাদেশের মোট রাজস্ব আদায়ের ৩.৫%। বেনাপোল স্থল বন্দরের মাধ্যমে পণ্য আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ এবং একই সাথে সরকারের রাজস্ব আয়ও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ১৬% রপ্তানি এবং ৮৪% আমদানি হয়। একই অর্থবছরে প্রায় ২৯% আমদানি এবং প্রায় ২৭% রপ্তানি বৃদ্ধি পায়।

সারণি ৬.৭ঃ বেনাপোল বন্দরে আমদানি বৃদ্ধির হার

অর্থবছর	পণ্যের পরিমাণ (লক্ষ মে. টন)	বৃদ্ধির হার (%)
২০০০-০১	৫,৭৩,৫৯২	২৯.০০
২০০১-০২	৬,৬৮,৫৫০	১৪.০০
২০০২-০৩	৮,৫৮,৬৯৪	২২.০০
২০০৩-০৪	৯,০৯,০৮১	৬.০০
২০০৪-০৫	১২,৭৭,৯৮৬	২৯.০০

উৎস ঃ বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা উত্তরণের উপায়, টিআইবি, ২০১০।

Dhaka University Institutional Repository

২০০০-০১ হতে ২০০৪-০৫ অর্থবছর পর্যন্ত বেনাপোল বন্দরের আয় গড়ে প্রতি বছর ১২.৩৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৩-০৪ অর্থবছরের তুলনায় ২০০৪-০৫ অর্থবছরে রাজস্ব আয় বাড়ে ২৪%। ২০০১-০২ অর্থবছরে এই বন্দরের মাধ্যমে আমদানি বৃদ্ধি পায় ১৪% যার বিপরীতে বন্দরের রাজস্ব বৃদ্ধি পায় মাত্র ১.১৫%, তবে একই সময় কাস্টমসের রাজস্ব বৃদ্ধি পায় ১৭%। অন্যদিকে আদায় বৃদ্ধি পায় ২০% এবং কাস্টমসের রাজস্ব বৃদ্ধি পায় ১৯%। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে আমদানি পণ্য বৃদ্ধি পায় ৬% যার বিপরীতে বন্দরের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পায় ৩.১৬% এবং কাস্টমসের রাজস্ব বৃদ্ধি পায় ৩.৬%। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে আমদানি পণ্য বৃদ্ধি পায় ২৯% যার বিপরীতে বন্দরের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পায় ১৯% এবং কাস্টমসের রাজস্ব বৃদ্ধি পায় ১৯.৪%। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে বেনাপোল কাস্টমসের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার ৯৪% রাজস্ব আদায় হয়েছিল। সে তুলনায় ২০০৪-০৫ অর্থবছরে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রার ১০১ ভাগ অর্জিত হয়েছে। গত অর্থবছরে বেনাপোল কাস্টমসে প্রতি মে.টন আমদানিকৃত পণ্যের রাজস্ব আদায় হয়েছে গড়ে ৩.৮৮০ টাকা এবং এ বছর প্রতি টনে রাজস্ব আদায় হয়েছে গড়ে ৪.১৫০ টাকা। কাস্টমস থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, প্রতি অর্থবছরের প্রথম দিকে কাস্টমসের রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রা থেকে অনেক দূরে থাকে। কিন্তু অর্থবছরের শেষের দিকে রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রা থেকে ছাড়িয়ে যায়। বেনাপোল স্থলবন্দরের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২ হাজার ৭৫ কোটি টাকা যার বিপরীতে কাস্টমসের আদায় হয়েছে প্রায় ২ হাজার ৩৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ ২০০৩-০৪ এবং ২০০৪-০৫ এই দুই অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রার ৯৮% আদায় হয়েছে।

খ) টেকনাফ স্থলবন্দর

অন্যদিকে টেকনাফ বন্দরে কাস্টমসের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাঁচ বছর আগে যেখানে আমদানি থেকে রাজস্ব আদায় হয়েছে ১০ কোটি টাকারও কম, সেখানে ২০০৪-০৫ অর্থবছরে রাজস্ব আদায় হয়েছে ৫৩ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা। টেকনাফ স্থল বন্দর স্থাপন করার পর নভেম্বর ২০০৩ থেকে জুন ২০০৪ পর্যন্ত ৩,০৭৩ টন পণ্য রপ্তানি হয় এবং ৪৩,৩৯৫ টন পণ্য আমদানি হয়। অন্যদিকে ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ১,৭৩৩ টন পণ্য রপ্তানি হয় এবং ৯৯,৮৮৭ টন পণ্য আমদানি হয়। বন্দর স্থাপনের পরে যে পণ্য আমদানি-রপ্তানি হয় তার মধ্যে ৩.২৫% রপ্তানি হয় এবং ৯৬.৭৫% আমদানি হয়। টেকনাফ বন্দরের মাধ্যমে আমদানি বাণিজ্য থেকে রাজস্ব আদায় প্রতি বছরই বৃদ্ধি পাচ্ছে (সারণি ৬.৮)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ৬.৮ ঃ টেকনাফ বন্দরে রাজস্ব বৃদ্ধির শতকরা হার

অর্থবছর	বৃদ্ধির হার (%)
২০০০-০১	৯.৪৯
২০০১-০২	৪৭.৭২
২০০২-০৩	১০১.১৭
২০০৩-০৪	৯৮.৬৮
২০০৪-০৫	-০.৪৩

উৎস ঃ বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা উত্তরণের উপায়, টিআইবি, ২০১০।

সীমান্ত বাণিজ্য চুক্তি শুরুর পর টেকনাফের মাধ্যমে ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে ১ কোটি ৩৮ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকার পণ্য রপ্তানি হয়। ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়ে ১ কোটি ৮১ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা এবং ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে দাঁড়ায় ২ লক্ষ ২৭ হাজার ৪০ হাজার টাকা। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে রপ্তানি কমে ৭৪ লক্ষ ১০ হাজার টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে রপ্তানি আয় পৌঁছে ৪৭ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকায়। ২০০০-০১ অর্থবছরে রপ্তানি আয় সর্বনিম্ন পরিমাণে নেমে যায় যার পরিমাণ মাত্র ১৭ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকায়। এরপর আবার তা বাড়তে থাকলেও ২০০৪-০৫ অর্থবছরে আবার তা কমে যায়। টেকনাফ বন্দর চালু হওয়ার পর বেসরকারি বন্দর কর্তৃপক্ষ নভেম্বর ২০০৩ থেকে জুন ২০০৫ সালে সরকারকে ৫২ লক্ষ ৯৮ হাজার ৩শ' ৩ টাকা রাজস্ব প্রদান করে যা মোট রাজস্ব আদায়ের ১১% অর্থাৎ টেকনাফ বন্দরের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি বাবদ বন্দর ৪ কোটি ৮১ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা রাজস্ব আদায় করে।

২০০৩-০৪ ও ২০০৪-০৫ অর্থবছরে বেনাপোল বন্দর দিয়ে যথাক্রমে ৩৭ হাজার ৭৮টি এবং ৪৩ হাজার ৮শ' ৮৭টি বিল অব এন্ট্রি দাখিল হয়। কনসাইনমেন্ট প্রতি ১৭ হাজার ২শ' ৩ টাকা হিসাবে দুই অর্থবছরে ৮০ হাজার ৮শ' ৬৫টি কনসাইনমেন্ট থেকে আনুমানিক ১শ' ৩৯ কোটি টাকা স্পিডমানি হিসাবে আদায় করা হয় যার মধ্যে ৯৯ কোটি টাকা আদায় করে কাস্টমসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এবং বাকি ৪০ কোটি টাকা আদায় করে বন্দরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। বেনাপোল কাস্টমস ২০০৪-০৫ অর্থবছরে মোট ১,৯৫২ টি চালানের ক্ষেত্রে (৪.৪৬%) অনিয়মের বিষয় চিহ্নিত করে মোট ৯.৬৬ কোটি টাকা জরিমানা আদায় করে। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে একই সময়ে একই ক্ষেত্রে মোট ৮৮০টি চালানে (২.৩৭%) মোট ৪.৯০ কোটি টাকা জরিমানা আদায় করেছিল। তবে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তিদের মতে এই অনিয়মের ঘটনা আরও অনেক বেশি।

Dhaka University Institutional Repository

৬.২.৬ দারিদ্র্য বিমোচন

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০০৫-এর তথ্যানুসারে মৌলিক চাহিদা ব্যয় পদ্ধতি (Cost of Basic Needs-CBN) ২০০০ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪৮.৯ শতাংশ, যা ২০০৫ সালে হ্রাস পেয়ে ৪০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। জরিপে ব্যবহৃত প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ (Direct Calorie Intake) পদ্ধতি অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে ২০০০ সাল অনপেক্ষ দারিদ্র্যের হার ছিল ৪৪.৩ শতাংশ, যা ২০০৫ সালে হ্রাস পেয়ে ৪০.৪ শতাংশ দাঁড়ায়। একই সময় চরম দারিদ্র্যের (Hard-core poverty) ক্ষেত্রেও নিম্নমূখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এই জরিপে বিভাগওয়ারী দারিদ্র্য পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মাথা গণনা অনুপাতে নিম্ন দারিদ্র্য রেখার ক্ষেত্রে অন্যান্য বিভাগের চেয়ে বরিশাল বিভাগে দারিদ্র্যের হার সবচেয়ে বেশি (৩৫.৬ শতাংশ) এবং চট্টগ্রাম বিভাগ সবচেয়ে কম (১৬.১ শতাংশ)। এরপরেই ঢাকা ও সিলেট বিভাগের অবস্থান। মাথা গণনা অনুপাতে দারিদ্র্য হ্রাসের হার শহরাঞ্চলেও লক্ষণীয়, যা ২০০০ সালে ২৮.২ শতাংশ হলেও ২০০৫ সালে তা ২০.২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ভূমির মালিকানার ভিত্তিতে ২০০৫ সালে উচ্চ দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে দারিদ্র্য পরিমাপে দেখা যায় যে, ৪৬.৩ শতাংশ জনগণ ভূমিহীন এবং মাথা-গণনা অনুপাতে নিম্ন দারিদ্র্য রেখার ক্ষেত্রে দারিদ্র্য পরিমাপে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ৩৯.২ শতাংশের জমির পরিমাণ ০.০৫ একরের নিচে। মাথা পিছু মাসিক আয় ব্যয় ও ভোগব্যয় পরিস্থিতি বিশ্লেষণে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, খানার মাসিক নামিক (Nominal) ভোগব্যয় জাতীয় পর্যায়ে ৫৯৬৪ টাকা অনুমিত হলেও পল্লী এলাকায় তা ৫১৬৫ টাকা এবং শহরাঞ্চলে তা ছিল ৮৩১৫ টাকা। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে অতি দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। এগুলোর মধ্যে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কর্মসূচি, খাদ্য সাহায্য কর্মসূচি, দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ কর্মসূচি, আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য। এ সব কর্মসূচিতে বয়স্ক দরিদ্রদের জন্য বয়স্ক ভাতার ক্ষেত্রে ১৬ লক্ষ সুবিধাভোগী, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ্য মহিলা ভাতার ক্ষেত্রে ৬ লক্ষ ৫০ হাজার এবং অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতার ক্ষেত্রে ১ লক্ষ উপকারভোগী প্রত্যক্ষভাবে আর্থিক সুবিধা পাচ্ছে। এছাড়া, প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্পে ৫৫ লক্ষ অতি দরিদ্র শিশু উপকৃত হচ্ছে। আবাসন প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৫ হাজার ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যসেবা, পরিবার পরিকল্পনা, আয়বর্ধক কার্যক্রমসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। দেশের প্রধান নয়টি এনজিও ডিসেম্বর ২০০৬ পর্যন্ত ৪৬৬০৮.৭২ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করে। এছাড়া

Dhaka University Institutional Repository

ফেব্রুয়ারি ২০০৭ পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংক ৩১৪৪৮.৪২ কোটি টাকা, ডিসেম্বর ২০০৬ পর্যন্ত পিকেএসএফ এবং বিআরডিবি যথাক্রমে ৩৫০৬.০৮ কোটি টাকা এবং ৫৫৭১.৪২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে। তফসিলি ব্যাংকসমূহ একই সময় ১২১১১.০৪ কোটি টাকা, অন্যান্য বাণিজ্যিক বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ ২৪৭৫.৯৫ কোটি টাকা এবং সরকারের প্রশাসনিক বিভাগসমূহ ৮৬৬৮.৯৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৩ বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও ইসলামী জঙ্গিবাদ (২০০১-২০০৬) ঃ

রাজনীতি হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে মানুষ তার রাজনৈতিক আদর্শ অনুসারে নিজের সমাজকে বিন্যস্ত করে।[৩৩] আর রাজনীতিতে ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। এটি কেবল ব্যক্তিগত বিশ্বাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ধর্ম জনমতেরও উৎস বটে। সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রেও ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আর মানুষের ধর্ম বিশ্বাস তার রাজনৈতিক চেতনাকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।[৩৪] বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্ম বড় ধরনের প্রভাব ফেলছে।[৩৫] বাংলাদেশের মানুষ অত্যন্ত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান যাদের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই রাজনীতির উপর ধর্মের প্রভাব পাকিস্তান আমল থেকে অদ্যাবধি এখানে সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত হয়নি। মূলত ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মের প্রতি অনুরক্ত থাকা বাংলাদেশী জাতির এক চিরঞ্জীব বৈশিষ্ট্য।[৩৬] বাংলাদেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিমন্ডলে ধর্মকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয়। ব্রিটিশ আমল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই ভূখন্ডের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, রাজনীতিতে ধর্ম বরাবরই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। অবশ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ধর্ম ব্যবহৃত হয়েছে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ক্ষমতার আসন মজবুত করার হাতিয়ার হিসেবে।

৬.৩.১ খালেদা জিয়া শাসনামল (২০০১-২০০৬)

২০০১ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোট এবং ধর্ম পরিচয় ভিত্তিক দল জাতীয় পার্টির এক অংশকে নিয়ে নির্বাচনী জোট গঠন করে। খালেদা জিয়া তার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে ধর্মভিত্তিক দলগুলো আসন কম পেলেও সারা দেশে তাদের প্রচুর ভোট রয়েছে। কাজেই জোটবদ্ধ নির্বাচন করলে বিজয় অবশ্যম্ভাবী। নির্বাচনে চারদলীয় জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং সরকার গঠন করে। বললে অত্যুক্তি হবে না, ২০০১ সালের নির্বাচনে ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায়, চারদলীয় জোট আসন পেয়েছে ১৯৩টি, প্রাপ্ত ভোটের হার ৪৭ দশমিক ০৫ ভাগ। এর মাঝে জামায়াতে ইসলামীর প্রাপ্ত ভোটের হার ৪ দশমিক ১৮ ভাগ (আসন ৬২)। জাতীয় পার্টির নেতৃত্বাধীন ইসলামী ঐক্যফ্রন্টের প্রাপ্ত ভোটের হার ৭ দশমিক ২৫ ভাগ (আসন ১৪)। আওয়ামী লীগ বাদে ধর্মনিরপেক্ষবাদী দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের হার অত্যন্ত করুণ, মাত্র ১ দশমিক ১২ ভাগ (কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ ১, জাতীয় পার্টি-মঞ্জু ১, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ০)।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৩.২ ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ঃ সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপট

অতি সম্প্রতি ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিয়ে সারা দেশে নানা কথাবার্তা চলছে। কোনো কোনো মহল থেকে সরকারের কাছে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে প্রায় প্রতিদিনই বক্তৃতা, বিবৃতি, প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ অব্যাহত রয়েছে। তাদের দাবির পেছনে তারা যুক্তি উপস্থাপন করছেন। অন্যদিকে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে এ দাবিকে অযৌক্তিক আখ্যায়িত করে পাল্টা অভিযোগ করা হচ্ছে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বন্ধের দাবিদাররা বিদেশী এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে চায়। তাদের অভিমত স্বাধীনতা বিরোধী ধুয়া তুলে এক শ্রেণির ইসলাম বিরোধী শক্তি দেশের ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোকে কোণঠাসা করে নিজেরা রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করতে এ ধরনের অযৌক্তিক দাবি তুলছে।

দেশব্যাপী একযোগে ৬৩ টি জেলায় ১৭ আগস্টের (২০০৫) সেই বোমা হামলা ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোকে বেকায়দায় ফেলে দেয়। যদিও মূলধারার ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো কখনোই এ কাজে জড়িত ছিল না। মিডিয়া ও কতিপয় রাজনৈতিক দল জামায়াতকে দোষারোপ করলেও পরবর্তীতে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। জামায়াতসহ সব কয়টি ইসলামী দল বোমা হামলার তীব্র নিন্দা এবং এর সাথে তাদের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই বলে জোর দাবি জানিয়েছিল। পরবর্তীতে সেই দাবি সত্য প্রমাণিত হয়েছে। বরং এর সাথে জড়িত ছিল চরমপন্থী দল জামায়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ বা জেএমবি। তাদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এ দেশের ইসলামী রাজনীতি তথা ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সুস্থ চর্চাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছিল। আর এ সুযোগটাই গ্রহণ করে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিরোধী শক্তি। এ সময় তাদেরকে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিরুদ্ধে বিষোদগার ও তা বন্ধের জন্য তৎপরতা চালাতে দেখা যায়। এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী জেএমবির এ অপকর্মের দায়ভার জামায়াতের ঘাড়ে চাপাতে চেয়েছেন। অবশ্য সকল প্রোপাগান্ডা ও ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বাংলাদেশে এখনও টিকে আছে।

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদের পাশাপাশি ইসলামী জঙ্গিবাদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনায় নব্বইয়ের দশকের শুরুতে বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের ওপর পশ্চিমা দেশগুলোর বিরূপ মনোভাব এবং নিপীড়নের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন মুসলিম প্রধান দেশে ইসলাম উগ্রবাদী জঙ্গি গ্রুপগুলোর উত্থান ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হয়। যতদুর জানা যায় ওই সময় বাংলাদেশের অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান ও বিভিন্ন মাদ্রাসার ছাত্র আফগানিস্তান, কাশ্মীর, ইরাক,

Dhaka University Institutional Repository

লেবানন, ফিলিস্তিন প্রভৃতি দেশে গমন করে মসুলমানদের পক্ষে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, নিপীড়িত মুসলিম জনপদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, ইসলামী শাসন কায়েমের উদ্দেশ্যে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। তারা ওইসব দেশে অবস্থানকালীন বিভিন্ন ইসলামী জঙ্গি সংগঠন ও নেতৃবৃন্দের সংস্পর্শে আসে। নব্বইয়ের দশকের শুরু ও মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশী মুজাহিদদের অনেকেই দেশে ফেরত এলে তাদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠনসমুহ বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রমের বিস্তৃতি ঘটাতে প্রয়াস চালায়। এসব সংগঠন জনগণকে ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েম করার তাগিদ দিতে থাকে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সাধারণ মানুষের ধর্ম ও জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞানের অভাব, হতাশা, প্রশাসনের দুর্বলতা এবং সর্বোপরি উদার সরকারি নীতির কারণে এরূপ সংগঠনসমূহ দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করে ভেতরে ভেতরে শক্তিশালী হয়। ফলাফল জামায়াতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ নামক একটি সংগঠন ১৭ আগস্ট দেশব্যাপী বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এর লক্ষ্যস্থল ছিল আদালত প্রাঙ্গণ, জনবহুল ও প্রকাশ্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ। অ্যাইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর রেকর্ড পর্যালোচনা করে এবং গ্রেফতারকৃত জেএমবি সদস্যদের নিকট থেকে জানা যায়, তারা ২০০০ সালের প্রথম দিক থেকেই দেশব্যাপী এলাকা ভিত্তিক পরিকল্পিতভাবে প্রশিক্ষণ, বোমা বিস্ফোরণ, এনজিও/ব্যাংক ডাকাতি, হত্যা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে। অদ্যাবধি জেএমবি কর্তৃক সংগঠিত বিভিন্ন ঘটনা সারণি-৬.৯ এ দেখা যেতে পারে।

সারণি ৬.৯ ঃ জেএমবি কর্তৃক সংগঠিক বিভিন্ন ঘটনা (২০০১-২০০৬)

তারিখ	সংঘটিত ঘটনাবলি
২০০১ সালের জুন/জুলাই	রাঙ্গামাটিতে বোমা বিস্ফোরণ
২০০১ সালের শেষের দিকে	বাগেরহাট ইউপি চেয়ারম্যান তারাপদ পোদ্দারকে হত্যার চেষ্টা
২০০২ সালের মাঝামাঝি	সাতক্ষীরার সিনেমা হল ও সার্কাস প্যান্ডেলে বোমা বিস্ফোরণ
২০০২ সালের মাঝামাঝি	দিনাজপুরের জেএমবি মেসে দুর্ঘটনামূলক বোমা বিস্ফোরণ
২০০২ সালের ৭ ডিসেম্বর	ময়মনসিংহ সিনেমা হলে বোমা হামলা
২০০২ সালের শেষের দিকে	সাতক্ষীরায় অস্ত্রসহ জেএমবি সদস্য গ্রেফতার
২০০২ সাল থেকে ২০০৫ সাল	বিভিন্ন স্থানে এনজিও, ব্র্যাক অফিস ও গ্রামীণ ব্যাংকে জেএমবি সদস্যরা ডাকাতি করে মালামাল লুট করে।
২০০৩ সালের ২০ জানুয়ারি	জয়পুরহাটের চিশতিয়া মাজারে ৫ জন খাদেম হত্যা
২০০৩ সালের প্রথম দিকে	টাঙ্গাইলের সখিপুরে ফাইলা পাগলার মাজারে বোমা বিস্ফোরণ

Dhaka University Institutional Repository

২০০৩ সালের ১৪ আগস্ট	জয়পুরহাটের ক্ষেতলালে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ ও অস্ত্র লুট
২০০৪ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি	ঢাকায় ড. হুমায়ুন আজাদের ওপর হামলা ও হত্যার চেষ্টা
২০০৪ সালের মার্চ মাসে	টাঙ্গাইলে ভারতীয় গোয়েন্দা সন্দেহে একজনকে হত্যা
২০০৪ সালের ১ এপ্রিল থেকে ২৫ মে	রাজশাহীর বাগমারায় সর্বহারা নিধন অভিযান
২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে	পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য শহীদকে হত্যা
২০০৪ সালের মে মাসে	আত্রাই ক্যাম্পে তিনজনকে হত্যা
২০০১ ও ২০০৪ সালে	ধর্মান্তরিত ২জন খ্রিস্টানকে হত্যা
২০০৪ সালের শেষে	জনকণ্ঠের সম্পাদক আতিকুল্লাহ খান মাসুদের ওপর হামলার পরিকল্পনা
২০০৫ সালের জানুয়ারি মাস	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ইউনুস হত্যা
২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট	৬৩ টি জেলায় বোমা বিস্ফোরণ
২০০৫ সালের মার্চ এবং সেপ্টেম্বর মাস	আমেরিকান এনজিও পিস কোরের সদস্য ও আমেরিকান নাগরিক হত্যার পরিকল্পনা
২০০৫ সালের ৩ অক্টোবর	চট্টগ্রাম, চাঁদপুর ও লক্ষ্মীপুরে বোমা হামলা
২০০৫ সালের ১৪ নভেম্বর	ঝালকাঠিতে বোমা হামলা করে ২ বিচারক হত্যা
২০০৫ সালের নভেম্বর মাসে	সিলেটে হিন্দু বিচারককে বোমা হামলা করে হত্যার পরিকল্পনা
২০০৫ সালের ২৯ নভেম্বর ও ১ ডিসেম্বর	গাজীপুরে আত্মঘাতী বোমা হামলা
২০০৫ সালের ৩ অক্টোবর ও ২৯ নভেম্বর	চট্টগ্রামে আত্মঘাতী বোমা হামলা
২০০৫ সালের ৮ ডিসেম্বর	নেত্রকোনায় আত্মঘাতী বোমা হামলা
২০০৬ সালের ২৯ ডিসেম্বর	টাঙ্গাইলের বাইপাসে পুলিশ চেকপোস্টে তল্লাশিকালে কর্তব্যরত পুলিশ ও সোর্সের ওপর হামলা

উৎস ঃ মেজর মোঃ আতিকুর রহমান, বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ ঃ কিছু কথা ঃ কিছু প্রাসঙ্গিক কথা, র‍্যাবের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী জার্নাল, ২০০৮,পৃ. ৬০-৬২।

জেএমবির সদস্যরা যখন ইসলামের নামে বোমাবাজি শুরু করলো, হত্যাযজ্ঞ শুরু করলো তখন সত্যিকার নিষ্ঠাবান ইসলামী দলসমুহ এবং ওলামায়ে কেরাম তার বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠল। একযোগে একবাক্যে তারা ঘোষণা করলেন, "ইসলামের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই"। যখনই কোনো মহল থেকে এহেন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের উপর আঘাত হানার চেষ্টা হয়েছে বা মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হয়েছে, ইসলামী দলের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং সম্ভাব্য শক্তি দিয়ে তা প্রতিহত করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। অথচ জেএমবি ও হরকাতুল জেহাদ নামক তথাকথিত ইসলামী দলসমূহের পক্ষ থেকে এর বৈপরীত্ব বা বালখিল্যতা প্রদর্শন করা হয়েছে। ফলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি তথা ইসলামী রাজনীতি এক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৩.৩ ইসলামী জঙ্গিবাদ

বাংলাদেশে ইসলামী জঙ্গি দলগুলোর ঘোষিত লক্ষ্য হলো ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। ঘোষিত লক্ষ্যের দিক থেকে এটা স্পষ্টত যে জঙ্গি দলগুলোর লক্ষ্য রাজনৈতিক। এই রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা যথেষ্ট সক্রিয়। তারা তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য 'জিহাদী' বা ধর্মযুদ্ধের মতাদর্শকে ব্যবহার করে এবং তারা জিহাদী মতাদর্শে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আমূল সংস্কারবাদী প্রক্রিয়াকে (Radicalization) অন্তর্ভুক্ত করে। তাদের আমূল সংস্কারবাদী প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে জিহাদের জন্য দাওয়াত, বক্তৃতা, ধর্মীয় আলোচনা, প্রচারণা এবং প্রচারপত্রের বিলি ইত্যাদি। সুতরাং তাদের এই ধরনের কার্যকলাপ থেকেও এটা প্রমাণিত হয় যে তাদের লক্ষ্য রাজনৈতিক।

ইসলামী জঙ্গি দলগুলো ১৯৯৯ সাল থেকে সহিংসতার সূত্রপাত করেছে। ১৯৯৯ সাল থেকে বারবার তাদের সহিংসতার লক্ষ্যবস্তু ছিল বেসামরিক স্থাপনা, যেমন বিচার বিভাগ, আদালত, এনজিও অফিস, সরকারি এবং ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয়, প্রেস ক্লাব, সিনেমা হল, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। যার মাধ্যমে তারা হত্যা করেছে বিচারক, আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী এবং বেশ কিছু নিরীহ মানুষ। বোমা, গ্রেনেড হামলা এবং হত্যার মাধ্যমে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলো ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত ২০২ জন বেসামরিক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে এবং ১৮৯০ জন ব্যক্তিকে আহত করেছে।[৩৭] নিম্নে জঙ্গি দলগুলো কর্তৃক নিরীহ এবং বেসামরিক জনগণকে হত্যা ও হতাহতের সংখ্যা তুলে ধরা হলো।

সারণি ৬.১০ঃ জঙ্গিদল কর্তৃক হত্যার পরিসংখ্যান

সাল	হত্যা (জন)	আহত (জন)
২০০১	৫১	২৪৭
২০০২	২৮	২৯৮
২০০৩	০৭	২৬
২০০৪	৩২	৬২১
২০০৫	৬৬	৫৬১

Source: Abul Barkat: Growth of fundamentalism and the growth of political Islam in Bangladesh, 2006, P. 24-26

যেহেতু জঙ্গি দলগুলোর সহিংসতার শিকার সবসময়ই বেসামরিক ও নিরীহ জনগণ সেহেতু একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় জঙ্গি দলগুলোর লক্ষ্য বৃহত্তর জনগোষ্ঠী অথবা নিষ্পেষিত জনগোষ্ঠীর স্বার্থ উদ্ধার করা নয়।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৩.৪ হুজিবি

বাংলাদেশে হুজিবি উৎপত্তি মূলত ১৯৯০ দশকের শুরুর দিকে। তবে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে জানা যায় ১৯৮৮ সালে মুফতি আব্দুর রহমান ফারুকের নেতৃত্বে যশোরে এই সংগঠনটি যাত্রা শুরু করে।[৩৮] ধারণা করা হয় আফগান ফেরত বাংলাদেশী মুজাহিদগণ হুজিবি প্রতিষ্ঠা করে। এটা কথিত যে হুজিবি একটি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠন। ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত এই সংগঠনটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে ঘোষিত হয়েছে। হুজিবির লক্ষ্য হলো বাংলাদেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এই সংগঠনের অনেক সদস্যের আফগানিস্তান, কাশ্মীর ইত্যাদি জায়গায় যুদ্ধের অভিজ্ঞতা রয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক গ্রেফতারকৃত হুজি সদস্যদের মাধ্যমে জানা যায় হুজিবির সাথে পাকিস্তানী জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈয়বার যোগাযোগ রয়েছে। বাংলাদেশে হুজিবির বর্তমান নেতা হচ্ছেন মুফতি আব্দুল হান্নান, যিনি ২০০৫ সালের ১ অক্টোবর র‍্যাব কর্তৃক গ্রেফতার হন এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনসভার বোমা হামলার অভিযোগে অভিযুক্ত। হুজিবি কর্তৃক পরিচালিত গ্রেনেড ও বোমা হামলাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, উদীচী বোমা হামলা (১৯৯৯), যশোর ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা (২০০৫), রমনা বটমূলে গ্রেনেড হামলা (২০০১), শাহ এস এম কিবরিয়া হত্যা (২০০৫), সিপিবি র‍্যালিতে বোমা বিস্ফোরণ (২০০১) ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে হুজিবি বাংলাদেশে নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও, গত মে মাসে (২০০৮) ইসলামিক ডেমোক্রেটিক পার্টি নামে এরা আত্মপ্রকাশ করেছে। তারা ইসিতে নিবন্ধনের জন্য আবেদনও করেছে। দলের আহবায়ক হয়েছেন আফগান ফেরত কমান্ডার শেখ আব্দুস সালাম। ইতোমধ্যে সারাদেশে ৫২টি সাংগঠনিক জেলা ও ২২৫টি উপজেলায় আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে (২০০৮)।

৬.৩.৫ জেএমবি

১৯৯৮ সালে হুজিবি থেকে পৃথক হয়ে শায়খ আব্দুর রহমানের নেতৃত্বে জেএমবি প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে ১৭ আগস্ট, ২০০৫ সালের দেশব্যাপী বোমা হামলার পূর্ব পর্যন্ত এই সংগঠনটি সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। সংবাদপত্রে জেএমবি সম্পর্কে তথ্য প্রকাশিত হয় ২০০২ সালে যখন পুলিশ দিনাজপুর থেকে অস্ত্রসহ ৮ জন জেএমবি সদস্যকে গ্রেফতার করে।[৩৯] ১৯৯৮ সালে জেএমবির মজলিসে শূরা গঠিত হওয়ার পর কর্মী তৈরীর উদ্দেশ্য শূরা সদস্যরা দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। জেএমবি কর্তৃক পরিচালিত বোমা হামলাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ১৭ আগস্টের (২০০৫) দেশব্যাপী বোমা

সংস্করণ, অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ হত্যা চেষ্টা (২০০২) ময়মনসিংহের সিনেমা হলে বোমা হামলা (২০০২), ময়মনসিংহে উদীচী গোষ্ঠীর উপর বোমা হামলা (২০০৫), অধ্যাপক ইউনুস হত্যা (২০০৫), মনোয়ার হোসেন বাবু হত্যা (২০০৪), ঝালকাঠিতে বিচারক হত্যা (২০০৫), ফাইলা পাগলার মাজারে বোমা হামলা (২০০৩) ইত্যাদি। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, জেএমবি ও জেএমজেবি একই সংগঠন। জেএমজেবির নাম ২০০৮ সালে এপ্রিল মাস থেকে জানা গেলেও সংগঠনটি তাদের যাত্রা শুরু করে সিদ্দিকুল ইসলাম বাংলা ভাইয়ের নেতৃত্বে তার বেশ কিছুদিন আগে থেকে। এটি বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যে বাম চরমপন্থি তৎপরতা বিরাজমান তা দমনের জন্য উত্থান হয়। বাংলাদেশ সরকার ২০০৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি জেএমবি ও জেএমজেবি উভয় সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

৬.৩.৬ সাবিক পর্যালোচনা

ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বর্তমানে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিশ্বে তীব্র ইমেজ সংকটের সম্মুখীন। একদিকে ধর্মের নামে বিশ্বব্যাপী অব্যাহত জঙ্গি সন্ত্রাসবাদের বিস্তার অপরদিকে উক্ত সন্ত্রাসের প্রসঙ্গ টেনে পশ্চিমা ও আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যম কর্তৃক অব্যাহতভাবে ধর্মভিত্তিক যেকোন রাজনীতিকেই 'মৌলবাদী সন্ত্রাস' হিসেবে অভিহিত করার কারণে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ইমেজ সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে যা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির ক্ষেত্রে ঘটছে না । ধর্মভিত্তিক রাজনীতির এই সংকট পুরোনো হলেও এর মাত্রা দর্শনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে আশির দশক থেকে। বাংলাদেশেও নব্বইয়ের দশক থেকে হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী 'জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ', শাহাদত-ই-আলহিকমা ইত্যাদি ধর্মভিত্তিক জঙ্গি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে যাদের সন্ত্রাসী বোমা হামলায় ১৯৯৯ সালের ৬ মার্চ (যশোরে উদীচীর বোমা হামলা) থেকে শুরু করে ২০০৫ সালের ১৬ আগস্ট পর্যন্ত সারাদেশে মোট ২৩টি বড় ধরনের বোমা ও গ্রেনেড হামলায় সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতি কর্মীসহ ১৮১ জন নিহত ও ১,৩৯৯ জন আহত হয়।[৪০] পরবর্তীতে 'জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ' এর আত্মঘাতী বোমা হামলায় ১৪ নভেম্বর ২০০৫ থেকে ৮ ডিসেম্বর ২০০৫ পর্যন্ত বিচারক, আইনজীবী, সাংবাদিক, এনজিও কর্মী ও পুলিশসহ ২১ জন নিহত ও প্রায় ২৩৫ জন আহত হয়।[৪১] এ সকল সন্ত্রাসী ঘটনায় বাংলাদেশও বহির্বিশ্বের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। সকল প্রচার মাধ্যমে ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে বিশেষ করে ইসলাম ভিত্তিক রাজনীতিকে একতরফাভাবে সন্ত্রাস হিসাবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে যা জনজীবনকে বিপন্ন এবং সরকারের ভাবমূর্তিকে প্রশ্নের সম্মূখীন করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৪ মানবাধিকার পরিস্থিতি (২০০১ - ২০০৬)

মানবাধিকার বলতে একজন মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের অধিকারকে বোঝায়। আন্তর্জাতিক আইনের বিভিন্ন বিষয় থেকে মানবাধিকার ধারণাটি সৃষ্ট হয়েছে। বাংলাদেশের আইন ও মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে প্রায় প্রতি বছরই বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংগঠন তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। এসব প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় দেশের বিগত বছরের সার্বিক মানবাধিকার ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রকৃত চিত্র, একই সাথে এসব প্রতিবেদন দেশে আইনের শাসন ও মানবাধিকার বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টিতে ইতিবাচক অবদান রাখছে। এ প্রতিবেদনগুলো জনসমক্ষে প্রকাশ ও প্রচারের ফলে সমাজে আইন ও মানবাধিকার বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি সরকারের উপর এক ধরনের চাপসৃষ্টি করে যাতে সরকার দেশে আইনের শাসন ও মানবাধিকার রক্ষায় আরো বেশি উদ্যোগী হয়। বর্তমান সময়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা, নাগরিক সমাজ এবং এনজিওসমূহ মানবাধিকার রক্ষা এবং দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মানবাধিকারের কয়েকটি বিষয় নিম্নে আলোচিত হলোঃ

৬.৪.১ গণমাধ্যমের অধিকার

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাংবাদিকদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়নের ঘটনা কোনো নতুন বিষয় নয়। সাংবাদিকতাই সম্ভবত একমাত্র পেশা যেখানে মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা সবচেয়ে বেশি। কিন্তু পৃথিবীর যেখানেই আইনের শাসন ও মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটে সেখানেই সবার আগে পৌঁছে যান যে মানুষটি তিনি আর কেউ নন-একজন সাংবাদিক। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যিনি সংবাদ সংগ্রহের পাশাপাশি ঐ বঞ্চিত মানুষটির পাশে দাঁড়ান তিনি আর কেউ নন-একজন সাংবাদিক, একজন সংবাদকর্মী। মানুষের দুঃখ-কষ্ট-বেদনার কথা যিনি সবাইকে জানিয়ে দেন, যিনি মানুষকে আহ্বান করেন মানুষের পাশে দাঁড়াতে, তিনি সাংবাদিক। কাজেই মানবাধিকার লংঘনের ঘটনায় সাংবাদিকরাই প্রথম মানবাধিকার কর্মী।

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গেলে, মানুষের অধিকারের কথা বলতে গেলে, আইনের শাসনের কথা বলতে গেলে, দুর্নীতির কথা ফাঁস করলে যাদের স্বার্থহানি হয়, সেই স্বার্থান্বেষী মহল স্বাভাবিকভাবেই

Dhaka University Institutional Repository

সাংবাদিক-মানবাধিকার কর্মীদের উপর চড়াও হবে এটাই স্বাভাবিক। সমগ্র বিশ্বেই যখন এ অবস্থা তখন বাংলাদেশতো আর তার ব্যাতিক্রম নয়।

আমাদের দেশে সাংবাদিক নির্যাতনের ব্যাপকতা অনেক বেশি। বেশি এ কারণে যে, এখানে ক্ষমতার ছত্রছায়ায় কখনো কখনো সাংবাদিক নির্যাতনের ঘটনাগুলো ঘটে থাকে। আবার যেসব দেশে রাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এ নির্যাতনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তখন রাষ্ট্র তার দায় এড়াতে পারে না। স্বৈরশাসকের আমলে সাংবাদিক নির্যাতনের হার ছিল সবচেয়ে বেশি। গণতন্ত্রকে হত্যা করতে হলে আগে সাংবাদিকের মানবাধিকার হরণ করতে হয়-স্বৈরশাসকদের এ কথা ভালোই জানা। কিন্তু এখনতো দেশে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত। তারপরও কেন সাংবাদিকের মানবাধিকার হরণ?

সাংবাদিকের মানবাধিকার আসলে মানুষের মত প্রকাশের অধিকারের সাথেই সম্পৃক্ত। মত প্রকাশের স্বাধীনতা মানুষের মৌলিক অধিকার। পৃথিবীর অন্যান্যদেশের সংবিধানের মতো আমাদের সংবিধানেও মত প্রকাশের অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের চিন্তা, মত ও বিবেকের স্বাধীনতার স্বীকৃতি রয়েছে। রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক না স্বৈরাচারী তার একটি অন্যতম মাপকাঠি হলো রাষ্ট্রে মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে কি না। তাই বলা হয়, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ছাড়া গণতন্ত্র হয় না (ফরিদ আহমেদ বনাম পশ্চিম পাকিস্তান, পিএলডি, ১৯৬৫)। সংবিধানের ৩৯(১) অনুচ্ছেদে যথাযথভাবেই কোনো শর্ত আরোপ করা ছাড়াই চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু অনুচ্ছেদ ৩৯ (২)-এ কিছু শর্ত সাপেক্ষে বাক ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা রয়েছে। একই শর্তসাপেক্ষে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অধিকারও নিশ্চিত করা হয়েছে।

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের অনুচ্ছেদ ১৯-এ মত এবং বাক ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার স্বীকৃতি রয়েছে এবং এ অধিকার কোন রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে আবদ্ধ নয় (Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through

Dhaka University Institutional Repository

any media and regardless of frontiers Article-19) এছাড়া উক্ত মানবাধিকার ঘোষণার অনুচ্ছেদ ১৮-তে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার অধিকার স্বীকৃত।

দেশের জাতীয় দৈনিকসমূহতে সাংবাদিকদের উপর শারীরিক নির্যাতন, হুমকি, মিথ্যা মামলা, অপহরণ এবং হত্যার খবর নিয়মিত প্রকাশ করে থাকে। ১০ অক্টোবর ২০০১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত বিএনপির শাসনামলে সাংবাদিক নির্যাতন সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায় যা মূলত বিএনপি এবং তার অঙ্গ-সংগঠন দ্বারা সংঘটিত হয়। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কর্মীদের বিভিন্ন অনৈতিক কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশ করার জন্য ৬ অক্টোবর ২০০১ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈনিক প্রথম আলোর সংবাদদাতা চকর মালিথাকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কর্মীরা লাঠি ও রড দ্বারা পিটিয়ে মারাত্মক আহত করে।[৪২]

অক্টোবর ২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা এবং সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের উপর প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করার জন্য চিত্রপরিচালক, শিশুসাহিত্যিক ও সাংবাদিক শাহরিয়ার কবিরকে ২২ নভেম্বর ২০০১ তারিখে তৎকালীন জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তার প্রামাণ্যচিত্র জব্দ করা হয় এবং দেশের অভ্যন্তরে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী হিসেবে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতে ১ জানুয়ারি ২০০২ তারিখে তাকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়।

অক্টোবর ২০০১ সালে বিএনপি ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে টেলিভিশন মিডিয়ার উপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার শুরু করে। স্বাধীন ও মুক্তচিন্তার প্রচার মাধ্যম একুশে টেলিভিশনকে টেরেস্ট্রিয়াল মাধ্যমে প্রচার অবৈধ ঘোষণা করা হয়। অন্যদিকে নতুন করে বেশকিছু ব্যক্তি মালিকানাধীন টেলিভিশন যেমন এনটিভি, চ্যানেল ওয়ান, আরটিভি, বাংলাভিশন, বৈশাখী ইত্যাদি লাইসেন্স প্রদান করা হয় যার মধ্যে বেশিরভাগ মালিক হচ্ছে বিএনপির মন্ত্রী, এমপি বা তাদের পারিবারিক আত্মীয়স্বজনদের।

সারণি ৬.১১: ২০০৫ সালের সাংবাদিক নির্যাতন ঘটনা [৪৩]

Dhaka University Institutional Repository

নির্যাতনের ধরণ	সাংবাদিক সংখ্যা
হত্যা	৪
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সন্ত্রাসী এবং ধর্মীয় উগ্রপন্থী দ্বারা সাংবাদিক নির্যাতন	৬২
গ্রেফতার	১০
শারীরিক নির্যাতন	৪৫
অপহরণ	৪
হুমকি	১৭৪
লাঞ্ছনা	৬৪
মামলা গ্রহণ ও তদন্ত পরিচালনা	৮৭

সিপিজে ২০০৫ সালের রিপোর্ট অনুসারে, খুলনার দক্ষিণাঞ্চল সাংবাদিক নির্যাতনের রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। ৪ জানুয়ারি দৈনিক যুগান্তরের দীপ আযাদের উপর বোমা নিক্ষেপ করা হয় কিন্তু বিস্ফোরণ না হওয়ায় তিনি বেঁচে যান। ৫ ফেব্রুয়ারি খুলনার প্রেসক্লাবের বাইরে বোমা বিস্ফোরিত হলে ৪ জন সাংবাদিক আহত হয়। এছাড়া সাংবাদিক মানিক সাহা এবং সম্পাদক হুমায়ুন কবিরকে পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা হত্যা করে। ২৩ ফেব্রুয়ারি কুষ্টিয়ায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ক্যাডাররা দৈনিক যুগান্তরের স্থানীয় প্রতিনিধি আল-মামুন সাগরকে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে আহত করে। ১৪ মার্চ ঢাকায় যুগান্তরের সিনিয়র ফটোসাংবাদিক এস এম গোর্কী রাস্তায় র‍্যাবের নির্যাতনের ছবি তুললে, তাকেও র‍্যাবের সদস্যরা মারধর করে।[৪৪]

২০০৬ সালে সংবাদপত্রে প্রকাশিত সাংবাদিক নির্যাতনের বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে কুষ্টিয়ার ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ২৯ মে ২০০৬ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিএনপির ক্যাডার বাহিনী দ্বারা বাংলাদেশ অবজারভারের সম্পাদকসহ প্রায় ২৫ জন সাংবাদিক আহত হয়। নিম্নের সারণিতে ২০০৬ সালের সাংবাদিক নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরা হলো।

সারণি ৬.১২: ২০০৬ সালের সাংবাদিক নির্যাতন ঘটনা [৪৫]

Dhaka University Institutional Repository

নির্যাতনের ধরণ	সাংবাদিক সংখ্যা
হত্যা	৪
হুমকি	৪৮
অপহরণের চেষ্টা	২
সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা	৮৬
সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে আইনি নোটিশ	৫
সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে মামলা	১০
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দ্বারা সাংবাদিক নির্যাতন	৮০
সন্ত্রাসী দ্বারা সাংবাদিক নির্যাতন	৯৭
বিএনপি ক্যাডার দ্বারা সাংবাদিক নির্যাতন	৮৩
আওয়ামী লীগের ক্যাডার দ্বারা সাংবাদিক নির্যাতন	১২
ইসলামী ছাত্র শিবির ক্যাডার দ্বারা সাংবাদিক নির্যাতন	৩
সরকারি কর্মচারী দ্বারা সাংবাদিক নির্যাতন	৪
পোশাক শ্রমিক দ্বারা সাংবাদিক নির্যাতন	৫

রাষ্ট্রীয় ও আর্ন্তজাতিক আইনে সংবাদপত্রের অধিকার, মানুষের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকারসহ সকল পেশায় নিয়োজিত জনগণের অধিকার স্বীকৃত থাকলেও বাস্তবে সাংবাদিকদের নানাভাবেই নির্যাতনের শিকার হতে হয়, যা কি না আইনের শাসনের পরিপন্থী ও গুরুতর মানবাধিকার লংঘন। আমরা আশা করি, ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত যেসব সাংবাদিক তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে এবং পরবর্তীতে আর কোনো সাংবাদিকের মানবাধিকার হরণ করা হবে না।

৬.৪.২ হাজতী ও কয়েদীদের অধিকার

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) অনুসারে কয়েদীদের অধিকার সমূহের মানদণ্ড বর্ণিত রয়েছে। কয়েদীদের সংশোধন এবং অপরাধ প্রবণতার মানসিকতা থেকে নিজেদের মুক্তির জন্য নৈতিক ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে ICCPR এর ন্যূনতম মানদণ্ডের অধিকার কয়েদীদের দেয়া হয় না। নিম্নে কয়েদীদের অধিকারের কয়েকটি মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত পর্যালোচনা করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

কয়েদীদের আবাসনঃ

বাংলাদেশে ৯ টি কেন্দ্রীয় কারাগারসহ মোট ৮১ টি জেলখানা রয়েছে হাজতী ও কয়েদীদের জন্য। ৮ সেপ্টেম্বর ২০০১ দৈনিক প্রথম আলোর তথ্যানুসারে কারাগারসমূহে ধারণ ক্ষমতার প্রায় তিনগুণ বেশি কয়েদী রয়েছে। যেখানে জেলখানায় মোট কয়েদীর সংখ্যা ৬৮,৪০৫ জন সেখানে মোট ধারণ ক্ষমতা ২৪,১৫২ জন। ২০০২ সালে ৮১ টি জেলখানার মোট ধারণ ক্ষমতা ছিল ২৫,০১৮ পক্ষান্তরে হাজতী ও কয়েদীর সংখ্যা ছিল ৭৫,১৩৫ জন। এর মধ্যে বিচারাধীন হাজতীর সংখ্যা ৪৯,২৭০ জন অর্থাৎ প্রায় মোট কয়েদীর ৬৫ শতাংশ।[৪৬]

কয়েদীদের স্বাস্থ্যাবস্থাঃ

বেশিরভাগ কয়েদী অপুষ্টি, আমাশয়, বিভিন্ন প্রকার চর্মরোগে আক্রান্ত। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস, নিরাপদ পানির অভাব এবং অপর্যাপ্ত শৌচাগার এর প্রধান কারণ।

জেলের অভ্যন্তরে দুর্নীতিঃ

কয়েদীদের সেবা সুবিধার অপর্যাপ্ততার কারণে কিছু কয়েদী টাকার বিনিময়ে অতিরিক্ত সুযোগ গ্রহণ করে পক্ষান্তরে গরিব কয়েদীদের অবস্থার আরও অবনতি হয়। ২৮ নভেম্বর ২০০১ এর যুগান্তরের প্রতিবেদন অনুসারে জেলের ভিতর বিভিন্ন মাদকদ্রব্য, মদ এমনকি আগ্নেয়াস্ত্রের প্রবেশ ঘটে কারারক্ষীদের দুর্নীতির মাধ্যমে। এছাড়া কয়েদীদের প্রায়ই টাকার বিনিময়ে মোবাইল ফোন ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যায় যা সম্পূর্ণভাবে অবৈধ। ৩১ মে ২০০৫ সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে এবং বোমার স্প্লিন্টারের আঘাতে একজন জেল ওয়ার্ডেন সহ কয়েকজন কয়েদী আহত হয়।

জেলের অভ্যন্তরে কয়েদী মৃত্যুঃ

জেলখানায় হাজতী এবং কয়েদীদের মৃত্যু নৈমত্তিক ঘটনা। মূলত অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে মৃত্যুর কারণের প্রতিবেদন দেয়া হয়। কিন্তু অসুস্থ কয়েদীদের চিকিৎসা বা হাসপাতালে ভর্তির প্রতি অবজ্ঞা এবং

Dhaka University Institutional Repository

কারারক্ষীদের নির্যাতন এর প্রধান কারণ। অনেক ক্ষেত্রে অসুস্থ কয়েদীদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সুযোগ দেয়া হয় না, যা জেল কোড ৭৪১ ও ৭৪২ এর অমান্যকরণ। ২০০১ সালের বিএনপির ৮২ দিনের শাসনামলে ১২ জন কয়েদীর মৃত্যু হয়। ২০০২ সালে ১১৭ জন কয়েদীর মৃত্যু হয়।[৪৭]

২০০৩ সালে বিচারাধীন আসামি ৭৩ জন, অভিযুক্ত আসামি ৩৭ জন এবং পুলিশ হেফাজতে ২১ জনের মৃত্যু ঘটে। এছাড়া ২০০৪ সালে ১০৪ জন, ২০০৫ সালে ৮৬ জন এবং ২০০৬ সালে ৭১ জন কয়েদীর মৃত্যু হয়। ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত কয়েদীদের মৃত্যু সংখ্যার তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এর হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে কিন্তু এখনো বিদ্যমান।

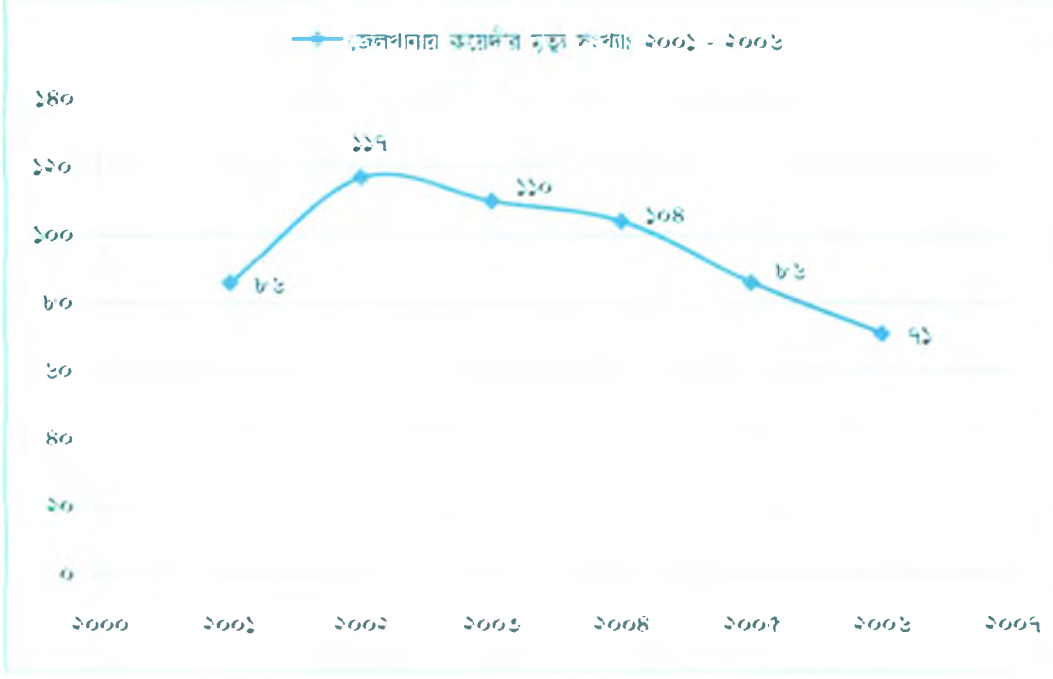

Source: Human Rights in Bangladesh 2001-2006, ASK

Dhaka University Institutional Repository

৬.৪.৩ নারীর অধিকার ও নারী নির্যাতন

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর অংশগ্রহণ ও মর্যাদা অনেক সীমিত।

জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণঃ

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৭৩ থেকে শুরু করে ১৯৯৬ সালের ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যন্ত নারীদের সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা এবং নির্বাচিত হওয়ার হার অনেক কম। ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানের ৬৫ (৩) অনুচ্ছেদ অনুসারে ১৫ টি নারী আসন পরবর্তী ১০ বছরের জন্য সংরক্ষিত রাখা রয়েছে। পরবর্তীতে ১০ বছরের জন্য ১৯৭৮ সালে সংবিধান সংশোধন করে সংরক্ষিত নারী আসন ৩০ করা হয়। সংবিধানের দশম সংশোধনের মাধ্যমে ১৯৯০ সালে পরবর্তী ১০ বছরের জন্য সংরক্ষিত নারী আসন ৩০ করা হয়, যার মেয়াদ এপ্রিল ২০০১ এ শেষ হয়। ফলে ২০০১ সালের অক্টোবরে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংরক্ষিত নারী আসন শূন্য ছিল। ২০০৪ সালের ১৬ মে জাতীয় সংসদে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী গৃহীত হওয়ার মাধ্যমে সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা ৩০ থেকে ৪৫ এ উন্নীত করা হয়। এর মেয়াদ করা হয় পরবর্তী ১০ বছর, অর্থাৎ ২০১৪ সালে এর মেয়াদ শেষ হবে।

১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনে সরাসরি নির্বাচনে ৩৬ জন নারী অংশগ্রহণ করে এবং মাত্র ৭ জন নির্বাচিত হন। ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনে সরাসরি নির্বাচনে ৩৮ জন নারী অংশগ্রহণ করে এবং মাত্র ৬ জন নির্বাচিত হন।

সারণি ৬.১৩: ১৯৭২-২০০৬ কেবিনেটে নারী সদস্যদের হার[৪৮]

ক্ষমতাসীন দল	সময়কাল	কেবিনেট সদস্য	নারী মন্ত্রী	শতকরা হার
আওয়ামী লীগ	১৯৭২-১৯৭৫	৫০	২	১.০০
বিএনপি	১৯৭৬-১৯৮২	১০১	৬	৫.৯৪
জাতীয় পার্টি	১৯৮২-১৯৯০	১৩৩	৪	৩.০০
বিএনপি	১৯৯১-১৯৯৬	৩৯	৩	৭.৬৯
আওয়ামী লীগ	১৯৯৬-২০০১	৩৮	৪	১০.৫২
চার দলীয় ঐক্য জোট	২০০১-২০০৬	৫১	৩	৫.৮৮

Dhaka University Institutional Repository

সরকারি চাকরিতে নারীর অবস্থানঃ

সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে নারীদের জন্য ১০% কোটা সুবিধা রাখা হয়েছে। কিন্তু সরকারের নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থান অত্যন্ত সীমিত। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে গড়ে শতকরা ১৫ জন নারী চাকুরিরত রয়েছে। কিছু নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয় ছাড়া এই হার আশংকাজনকভাবে কম। নিম্নে ২০০১ সালে কয়েকটি মন্ত্রণালয়ে চাকরিতে নারীদের শতকরা হার বর্ণিত হলঃ

সারনী ৬.১৪ : ২০০১ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে চাকরিতে নারীদের শতকরা হার

মন্ত্রণালয়ের নাম	নারীদের শতকরা হার
নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৬২.২৭
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৬.৭৩
স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়	২৭.৪১
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	২২.০৩
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	০১.৭৭
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০২.০৭
কৃষি মন্ত্রণালয়	০২.৫৯

Source: Human Rights in Bangladesh 2001, ASK

এখানে উল্লেখ্য যে, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে নারী ও শিশুদের বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য মহিলা কোটা সংরক্ষিত রয়েছে। অন্যদিকে প্রথাগতভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়- এই তিন মন্ত্রণালয়ে নারীদের অংশগ্রহণের হার তুলনামূলকভাবে বেশি। পক্ষান্তরে সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে এই হার উল্লেখযোগ্যভাবে সীমিত।

২০০১ সালে মার্চ মাসে বাংলাদেশে প্রথম একজন নারী সরকারি কর্মকর্তা ডেপুটি কমিশনার (উপ-সচিব মর্যাদা সম্পন্ন) হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। ২০০১ সালে বাংলাদেশে মোট পুলিশ সদস্য সংখ্যা ১,০০,৮৩৬ জন, তন্মধ্যে নারী পুলিশ সদস্য সংখ্যা মাত্র ৪৯২ জন, যা অত্যন্ত অপ্রতুল।

Dhaka University Institutional Repository

নারী নির্যাতনঃ

নারী নির্যাতন একটি বহুল আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থার শুরু থেকেই নারী নির্যাতনের সূচনা। নারী নির্যাতন একটি ঘৃণ্য ব্যাপার, যা আমাদের সমাজে প্রতিনিয়ত ঘটছে। অথচ একটি সভ্য, স্বাধীন দেশে এমনটা হওয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই। তা সত্ত্বেও নারী নির্যাতন হচ্ছে এবং এটা অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নারী নির্যাতনের ধরণ ও বৈচিত্র সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের সাথে সাথে পাল্টায়। তবে সমসাময়িক সামাজিক প্রেক্ষাপটে যেসব ধরণের নারী নির্যাতন পরিদৃষ্ট তা নিম্নরূপঃ

- এসিড নিক্ষেপের মাধ্যমে নারী নির্যাতন
- ধর্ষণের মাধ্যমে নারী নির্যাতন
- অপহরণ ও নারী পাচারের মাধ্যমে নারী নির্যাতন
- যৌতুক দাবীর মাধ্যমে নারী নির্যাতন
- তালাক প্রদানের মাধ্যমে নারী নির্যাতন
- শ্রমশক্তির যথাযথ মর্যাদা প্রদান না করে নারী নির্যাতন
- ফতোয়ার মাধ্যমে নারী নির্যাতন

সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত জনগোষ্ঠী নারীদের উপর নির্যাতনের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। এসব নির্যাতনের মধ্যে অন্যতম হচেছ নারীর উপর যৌন হয়রানি বা নির্যাতন। নারীর উপর যৌন হয়রানি সংবাদের শিরোনাম হয়েছে। যৌন হয়রানির কারণে আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটেছে বেশ কিছু ক্ষেত্রে। যৌন হয়রানির কারণে ২০০৩ সালে ২৪ জন, ২০০৪ সালে কমপক্ষে ৩৫ জন নারী আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। এছাড়া খুন ও আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনাও ঘটেছে। যৌন হয়রানির পাশাপাশি দেশে বিভিন্ন বয়সের প্রায় একহাজার নারী প্রতি বছর ধর্ষণের স্বীকার হয়েছে। এসব ঘটনার একটি বিরাট অংশই আইন-আদালত পর্যন্ত গড়ায় না। নিম্নে ২০০১ – ২০০৬ বিভিন্ন ধরণের নারী নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ৬.১৫ : ২০০১ - ২০০৬ বিভিন্ন ধরণের নারী নির্যাতনের সংখ্যা

	ধর্ষণ	যৌতুক	শারীরিক নির্যাতন	এসিড নিক্ষেপ	ফতোয়ার শিকার
২০০১	৭৭৮	১৮৬	২৫৩	১৭৭	৩৪
২০০২	১৪১২	৩৫৮	৩৫০	২৬২	৩২
২০০৩	১৩৮১	৩৭৪	৩৩১	২৪৯	৪৬
২০০৪	৯৬৮	৪২৬	৩৫৩	২৪২	৩৫
২০০৫	৮৩৫	৩৫৬	৩৩১	১৩০	৪৬
২০০৬	৭৪১	৩৩৪	৩২৩	১৪২	৩৯

Source: Human Rights in Bangladesh 2001 – 2006, ASK

৬.৪.৪ সংখ্যালঘুদের অধিকার

অ্যামেনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশের মানবাধিকার রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০১ সালের নির্বাচন পরবর্তী সময়ে বিএনপি জামায়াত জোট সারাদেশে নির্মম বর্বরতা চালায়। ওই বছর অক্টোবরে বিএনপি-জামায়াত ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সুপরিকল্পিতভাবে দেশের প্রধান বিরোধীদল আওয়ামী লীগ এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন শুরু করে। লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, হত্যা, ধর্ষণ এমন কোন নির্যাতন নেই, যা ওই সময়ে করা হয়নি। মানবাধিকার সংগঠনগুলো এ ধরনের ২৬ হাজার ঘটনা রেকর্ড করেছে। যার মধ্যে ৫০০ ঘটনা ছিল স্পর্শকাতর। বিষয়টি বিশ্বব্যপী ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করলে জোট সরকার বিষয়টি ভারতীয় ষড়যন্ত্র বলে আখ্যা দেয়।

সংখ্যালঘু নির্যাতনের সবচেয়ে ভয়াবহ ও রোমহর্ষক ঘটনাগুলো ঘটে বরিশালের গৌরনদী ও আগৈলঝাড়া উপজেলায়। সেই দুঃসহ নির্যাতনের ঘটনার কথা স্মরণ করে এখনও চমকে ওঠেন ওই অঞ্চলের সংখ্যালঘুরা। দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকার ওই বছরের ৬ ডিসেম্বরের সংখ্যার রিপোর্টে বলা হয়, ২ ডিসেম্বর রাতে টরকী বন্দরের বার্ষিক কীর্তন শুনে বাড়ি ফেরার পথে আগৈলঝাড়ার বারপাইকা গ্রামের দিনমজুর জগদীশ বৈরাগীর পত্নী সুনিত্রী বৈরাগী (২৫) কে কাঞ্চন বেপারী ও ফিরোজ শিকদারের নেতৃত্বে একদল দূর্বৃত্ত গণধর্ষণ করে। পরদিন ৩ ডিসেম্বর রাতে বিএনপি ক্যাডার রফিক চোকদার সংখ্যালঘু পলিন চন্দ্র বাড়ৈয়ের সম্মুখে তার কন্যা শোভা (১৪) কে ধর্ষণ চেষ্টা চালায়।

Dhaka University Institutional Repository

ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গায় ক্যাবল ব্যবসায়ী বলাই কুন্ডুর বাড়িতে দুর্বত্তরা ৪ ডিসেম্বর অগ্নিসংযোগ করে। ২০০১ সালের ১ অক্টোবরের রাত থেকে বিএনপি ক্যাডাররা ভোলার লর্ড হার্ডিঞ্জ ইউনিয়নে গণলুট চালায়। ওই রাতের তান্ডবে ২৮৭ টি সংখ্যালঘু পরিবার নির্যাতনের শিকার হয়। ২১ জন নারী লাঞ্ছনার শিকার হয়।

ইংরেজি ডেইলি স্টারে প্রকাশিত এক খবর অনুযায়ী, ভোলার লালমোহন উপজেলায় প্রায় এক হাজার নরনারী ২০০১ সালের নির্বাচনের পর বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার হয় । বিএসএস সংবাদদাতার কাছে দেয়া বিবৃতিতে নির্যাতিতদের মধ্যে অনেকেই জানান, কীভাবে ২০০১ সালের নির্বাচনের পর বিএনপির স্থানীয় নেতা এবং ক্যাডাররা তাদের নানাভাবে নির্যাতন করে। তারা অনেক হত্যার ঘটনাও উল্লেখ করেন। অভিযোগকারীরা সরকারের কাছে বিচারের জন্য আবেদন জানান। ২০০১ সালের ১ অক্টোবরের নির্বাচনের পরদিন ২ অক্টোবর সকাল অনুমান ৭ টায় বিএনপির ২০/২৫ জন সশস্ত্র ক্যাডার বিদেশ হাজারীর বাড়ি আক্রমণ করে। লাঠি-সোঁটা, গাছের ডাল দিয়ে এলোপাতাড়ী পেটাতে থাকে বিদেশ হাজারীদের ওপর। উজিরপুর থানা ছাত্রদল সভাপতি লিখন নিজ হাতে গুলি করে বিদেশ হাজারীর বাম হাতের কনুইতে। সন্ত্রাসী হায়েনার দল বিদেশ হাজারীর মোটর সাইকেল লুট করে। গুরুতর আহতাবস্থায় বিদেশ হাজারী উজিরপুর হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে যান। কিন্তু বিএনপি ক্যাডারদের ইশারা ও নির্দেশে চিকিৎসকরা তার চিকিৎসা করেনি। চিকিৎসার জন্য বাধ্য হয়ে বিদেশ হাজারী চলে যান ঢাকায়। একই সালের ৫ অক্টোবর বিএনপি ক্যাডাররা বিদেশ হাজারীর বাড়ি-ঘর লুট করে।

২০০২ সালের ২১ আগস্ট তখনকার ক্ষমতাসীন চারদলীয় জোটের কর্মীদের নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন বলে অভিযোগ করেন ওই নারী (৩৫)। ২০০১ সালে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী খুন, ধর্ষণ, হামলা, লুটপাটসহ সহিংসতা এবং সংখ্যালঘু ও বিরোধী দলীয় নেতা কর্মী নির্যাতনের ঘটনা তদন্তে গঠিত কমিশনে শুক্রবার জবানবন্দি দেন ওই নারী। বাগেরহাট সার্কিট হাউসে এই নারীসহ

Dhaka University Institutional Repository

আরো কয়েকজনের জবানবন্দি নেন তদন্ত কমিশনের সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মুহাম্মদ সাহাবুদ্দিন।

একটি মানবাধিকার সংগঠনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী খুন, ধর্ষণ, হামলা, লুটপাট সহসহিংসতা এবং সংখ্যালঘু ও বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীদের ওপর নির্যাতনের ঘটনা তদন্তে দুই মাসের মধ্যে সরকারকে তদন্ত কমিশন গঠনের নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। হাইকোর্টের এমন নির্দেশের পর ওই বিষয়ে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করে সরকার। তদন্ত কমিশনের সদস্য, উপস্থিত নির্যাতিত অন্যান্য নারী-পুরুষ ও সাংবাদিকদের সামনে নিজের ওপর নির্যাতনের কাহিনী বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বিএনপির সাবেক রামপাল উপজেলা সভাপতি মল্লিক মিজানুর রহমান মজনু ও সদস্য বাশার কাজীর নির্দেশে সন্ত্রাসীরা তাকে রামপাল বাসস্ট্যাণ্ড থেকে ধরে মারধরের পর বিবস্ত্র করে ফেলে। এরপর স্থানীয় বিএনপি কার্যালয়ে নিয়ে বেদম মারধর করে তার চুল কেটে দেয়। ওই সময় রামপাল থানা থেকে পুলিশ এলে ওই দুই নেতা পুলিশদের নিয়ে পাশের চায়ের দোকানে চলে যান। এরপর সন্ত্রাসীরা বিএনপি কার্যালয়েই তাকে ধর্ষণ করে। তিনি কমিশনকে জানান, বাগেরহাট আদালতে এই মামলা চলাকালে জেলা বিএনপির তৎকালীন সভাপতি ও বাগেরহাট-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য এমএএইচ সেলিম ওরফে সিলভার সেলিম তার বাগেরহাটের বাড়িতে ডেকে নিয়ে জোর করে মীমাংসা পত্রে স্বাক্ষর করিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। সন্ত্রাসীদের হুমকির কারণে আদালতে মামলার সাক্ষীদের হাজির করতে না পারায় তিনি মামলাটি প্রথমে ঢাকা এবং পরে খুলনা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করেন। এরপরই বাগেরহাট জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও বাগেরহাট-৪ আসনের সাংসদ মোজাম্মেল হোসেন সার্কিট হাউজে এসে তার ওপর হামলার বিবরণ দেন। তিনি বলেন, ২০০১ সালের ১১ নভেম্বর জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মাহাবুবুর রহমান টুটুলের নেতৃত্বে কশাই আব্দুল হক, সোহেল, শাহনেওয়াজ, ডলার সহ অস্ত্রধারী তাদের একটি সংবাদ সম্মেলনে হামলা চালায়। জোট সরকারের নির্যাতনের প্রতিবাদে ওই দিন শহরের আমলাপাড়ায় তৎকালীন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ফকির মনসুর আলীর

Dhaka University Institutional Repository

বাসায় দলের জেলা কমিটি সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজন করেছিল। এসময় তিনি সহ দলের ছয়/সাত জন নেতা কর্মী রক্তাক্ত জখম হন। ছয়জন সাংবাদিকও আহত হন। কমিশনের সামনে মোজাম্মেল হোসেন তার শরীরের ক্ষত স্থান দেখান। তিনি আরো বলেন, এ ঘটনায় পুলিশ বাদি হয়ে করা মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সাক্ষ্য প্রমাণ না পাওয়ার অজুহাত দেখিয়ে বাগেরহাটের একটি আদালত মামলাটি খারিজ করে বলে তিনি জবান বন্দিতে জানান।

২০০১ সালের ৭ অক্টোবর রামপালের বর্ণি গ্রামে জোট কর্মীদের মারধরে নিহত গৌরম্ভা ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি নূর মোহম্মদ মল্লিকের স্ত্রী হেনা মল্লিকও ঘটনার বর্ণনা দেন। কমিশনের সামনে তিনি বলেন, ভয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় সন্ত্রাসীরা তার স্বামীকে ধরে তার সামনে পিটিয়ে খুন করে। তিনি বাধা দিতে গেলে তাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখে তারা। স্বামীর লাশ দাফনের জন্য খাটিয়া আনতে গেলে স্থানীয় মসজিদ থেকে তাকে খাটিয়া দেওয়া হয়নি বলেও জানান। জবান বন্দি নেওয়ার সময় বাগেরহাট-৩ (রামপাল-মংলা) আসনের সাংসদ সৈয়দা হাবিবুন নাহার উপস্থিত ছিলেন। তিন সদস্যের কমিশনের অপর দু'জন হলেন- সদস্য সচিব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব মনোয়ার হোসেন আখন্দ এবং সদস্য গোয়েন্দা পুলিশের অতিরিক্ত উপমহাপরিদর্শক মীর শহীদুল ইসলাম। তদন্ত কমিশনের সদস্য সচিব মনোয়ার হোসেন আখন্দ বলেন, অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর বাগেরহাটে নির্যাতনের চিত্র ছিল ভয়ঙ্কর। তারা মোট ৭২ টি পৃথক ঘটনার লিখিত জবান বন্দি গ্রহণ করেন। এর মধ্যে ১২ টি গণধর্ষণ এবং আটটি হত্যার ঘটনা রয়েছে। এছাড়া ঢাকায় থেকেও তারা বাগেরহাটের বেশ কিছু ঘটনার কথা জেনেছেন এবং জবানবন্দি নিয়েছেন। যারা কমিশনের সামনে আসতে পারেনি তাদের লিখিত বক্তব্য ডাকযোগে পাঠানোর আহ্বান জানান তিনি। কমিশনের সদস্যরা বৃহস্পতিবার রাতে পিরোজপুর থেকে বাগেরহাট সার্কিট হাউজে এসে পৌঁছেন। সকাল ১০ টা থেকে তারা নির্যাতিতদের স্বাক্ষ্য গ্রহণ শুরু করে বিকাল ৪ টায় শেষ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া মোরেলগঞ্জের বৃদ্ধ কাঠমিস্ত্রি রতিকান্তকে ওই নির্বাচনের পরদিন প্রকাশ্য রাস্তায় পিটিয়ে হত্যার পর লাশের ওপর দাঁড়িয়ে উল্লাস করে জামায়াত-বিএনপির ক্যাডাররা। সে কথা বলতে গিয়ে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ডা. মোজাম্মেল হোসেন এমপি বলে ওঠেন, সে ঘটনার বর্ণনা করা যায় না। তিনি নিজে সংবাদ সম্মেলনে বর্বর হামলার শিকার হন। যেখানে সাত সাংবাদিক ও পাঁচ আওয়ামী লীগ নেতাও জখম হন।

২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-পরবর্তী সংঘটিত সহিংস ঘটনাগুলোর সরেজমিনে তদন্তে সরকার গঠিত তদন্ত কমিশনের প্রধান সাবেক বিচারপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন নির্যাতিতদের জবান বন্দি নিতে বাগেরহাট সার্কিট হাউসে আসেন। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এ সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। এ সময় কমিশনের অপর দুই সদস্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের উপসচিব ও তদন্ত কমিশনের সদস্য সচিব মনোয়ার হোসেন এবং মীর শহিদুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বাগেরহাট সদর আসনের এমপি অ্যাডভোকেট মীর শওকাত আলী বাদশা ও বাগেরহাট-৩ আসনের এমপি তালুকদার হাবিবুন নাহার, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান মুজিবর রহমান খান সহ নির্যাতিত শত শত মানুষ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাগেরহাটের সেই ভয়াবহ নির্যাতনের কাহিনী সেসময় দেশি-বিদেশি সংবাদ মাধ্যমে গুরুত্বের সঙ্গে প্রচার করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা ঃ

১. *দৈনিক যুগান্তর*, ০৯ জানুয়ারি, ২০০১।

২. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত, *উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা সংকলনের একটি প্রবন্ধ*, দুর্নীতি উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরনের পথ, সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ ঃ জুন ২০০৭, পৃ. ১১০।

৩. *ঐ*।

৪. http/www.anticorruption.info/corr_def_alt.htm

৫. *মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি ঃ স্বরূপ ও প্রতিকার*, এএইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ, ২০০৮, পৃ. ২-৩।

৬. *ঐ*, পৃ. ৩।

৭. দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪, ধারা ২ (ঙ)।

৮. *মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, দুর্নীতি নির্বাচন ও রাজনীতি : স্বরূপ বিশ্লেষণ - সংকট উত্তরণ*, ঢাকা ঃ পরমা, ২০০৩, পৃ. ৫৫।

৯. ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৭ সালে দেশব্যাপী ২৫০০ জনের উপর একটি খানা জরিপ পরিচালনা করে এবং মিডিয়াসহ দেশের সর্বমহলে বিষয়টি নজর কাড়তে সক্ষম হয়। এই জরিপের সাধারণ উদ্দেশ্য হলোঃ দুর্নীতির ধরন ও বিস্তার পরিমাপ করা; কীভাবে এবং কোথায় দুর্নীতি হচ্ছে তা অনুমান করা, দুর্নীতি এবং এর কারণ সম্পর্কে খানার ধারণা বের করা। খানা বলতে এখানে বোঝান হয়েছে একজনের নেতৃত্বে একটি পরিবার অর্থাৎ এক হাঁড়িতে রান্না বান্না হয় এমন এক একটি পরিবার। ২০০২ সালের জরিপে সমগ্র বাংলাদেশকে প্রশাসনিক বিভাগ অনুসারে ৬টি বিভাগে ভাগ এবং এই বিভাগগুলোকে গ্রাম ও শহর এলাকায় ভাগ করা হয়। জরিপের নমুনা ভৌগলিক ও অঞ্চল অনুসারে বিভাজন করা হয়। দেশের জাতীয় পর্যায়ের তথ্য বিবেচনা করে শতকরা ৭৬ ভাগ নমুনা গ্রাম ও ২৪ ভাগ নমুনা শহর এলাকা থেকে নেয়া হয়। এভাবে উপজেলা, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন এবং এসব এলাকা থেকে গ্রাম ও মহল্লা দৈবচয়ন নমুনায়নের মাধ্যমে জরিপ পরিচালনার জন্য বাছাই করে ৩০৩০ খানার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

১০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ মে, ২০০২।

১১. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, *দুর্নীতি দমন কমিশনের সূচনার বয়ান*, *প্রথম আলো*, ১০ এপ্রিল, ২০০৫।

১২. *বাংলাদেশে দুর্নীতি ঃ একটি খানা জরিপ*, টিআইবি, ২০০৫।

১৩. *ঐ*।

১৪. বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, *অডিটর জেনারেল বাংলাদেশ (এজিবি)*, অডিট প্রতিবেদন।

১৫. *দুর্নীতি বিষয়ক খানা জরিপ*, টিআইবি, ২০০৭।

১৬. তারেক শামসুর রেহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশ রাজনীতির চার দশক*, ঢাকা ঃ শোভা প্রকাশ ২০০৯, পৃ.৩৬২।

১৭. চৌধুরী ও মজুমদার, বাংলাদেশ - দুর্নীতির অবিমিশ্র অভয়াশ্রম, *Bangladesh Journal of Political Economy*, Vol. 17. No. 2.

১৮. Robert Klitgaard. "*Corruption as a system in the Next Stage of anticorruption*", Special Report, by Daniel Kaufmann.

১৯. করাপশন ডেটাবেজ রিপোর্ট, ২০০৫, টিআইবি।

২০. *ঐ*।

২১. *ঐ*।

২২. উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা সংকলন, *প্রাগুক্ত*।

২৩. বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, করাপশন ডেটাবেজ রিপোর্ট, ২০০৫, *প্রাগুক্ত*।

২৪. *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৮ এপ্রিল, ২০০২।

২৫. বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, করাপশন ডেটাবেজ রিপোর্ট, ২০০৫, *প্রাগুক্ত*।

Dhaka University Institutional Repository

২৬. *দৈনিক সংবাদ*, ২৪ জানুয়ারি, ২০০৩।

২৭. আংকটাড কর্তৃক প্রকাশিত, *World Investment Report-2002.*

২৮. World Bank Report, *Improving the Investment Climate in Bangladesh 2003.*

২৯. আংকটাড কর্তৃক প্রকাশিত, *World Investment Report-2003.*

৩০. *সমকাল*, ২৭ জুলাই, ২০০৮।

৩১. Amartya Sen, *Development as Freedom*, Oxford, Oxford University Press, 1999, pp. 275-278

৩২. Iftekharuzzaman, *Corruption and Human Insecurity in Bangladesh*, Paper presented at the seminar organized by Transparency International Bangladesh to mark the International Anti-corruption Day on 9 December.

৩৩. Mark Peter, *Political Continuity and Change*, Harper and Roae Publishers, 1972, Page - 11.

৩৪. ড. মোহাম্মদ হাসান, *বাংলাদেশ ঃ ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি*, ঢাকা ঃ গ্রন্থমেলা, জুন ২০০৩, পৃ. ২৭।

৩৫. ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশে ধর্মের রাজনীতি, মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, (মাওলানা আবদুল আউয়াল সম্পাদিত), ঢাকা ঃ শিখা প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃ. ৩৩।

৩৬. জিয়াউর রহমান, *জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস*, ঢাকা ঃ অনন্যা, ১৯৯৫, পৃ. ৩৮।

৩৭. Abdul Barkat, "*Economics of Fundamentalism and the growth of Political Islam in Bangladesh* : in Harun - or - Rashid (ed) Social Science Review, Vol. 23 Nor 2. December, 2006, P. 24-25.

৩৮. Bomb & Grenade Explosions: And other Forms of Violence by Religions Militants in Bangladesh, (South Asians for Human Rights), Nov. 2006. P. 33-34.

৩৯. *Ibid* P. 29.

৪০. *প্রথম আলো*, ১৯ আগস্ট, ২০০৫।

৪১. *সাপ্তাহিক যায়যায় দিন*, বর্ষ ২২, সংখ্যা ৯, ০৬ ডিসেম্বর, ২০০৫, পৃ. ২৬ - ২৭।

৪২. *Prothom Alo*, 7 October, 2001.

৪৩. BAJDC, Article of Rubayat Ferdous, Journalism Department, University of Dhaka, Published in *the Daily Star*, 2006.

৪৪. 2005 Protest Letter to Prime Minister.

৪৫. *Prothom Alo, Bhorer Kagoj, Ittefaq, Janakantha, Inqilab, Bangla Bazar Potrika, Jugantor, Somokal, The Daily Star, New Age, Sangbad and Sangram.*

৪৬. Human Rights in Bangladesh 2001, Dhaka : Ask, 2002.

৪৭. *Prothom Alo, Bhorer Kagoj, Ittefaq, Janakantha, Inqilab, Bangla Bazar Potrika, Jugantor, Somokal, The Daily Star, New Age, Sangbad and Sangram.*

৪৮. *Jugantor*, 28 April, 2006.

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায় ঃ উপসংহার

পাঁচ বছর আগে বিএনপি যে নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করেছিল তাতে ৩২টি বিষয়ে শতাধিক সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার ছিল। অঙ্গীকার মানা হয়েছে হাতে গোনা কয়েকটি বিষয়ে। যেমন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক ও প্রবাসীকল্যাণ নামে দুটি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়েছে। প্রতিশ্রুতি ছিল স্থায়ী বেতন কমিশন গঠনের, একবারের জন্য বেতন কমিশন গঠন করে সরকার অঙ্গীকারের আংশিক পূরণ করেছে। প্রতিশ্রুতি মেনে একটি দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন হলেও তা আজও অকার্যকর। শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্থ দেশ হওয়ার দুর্নাম থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি কথার ফানুস হয়ে থেকেছে। বরং এ সরকারের সময়েই আরও চার বার শীর্ষস্থান দখল করে রেখেছে দেশ। ইশতেহার অনুযায়ী গ্রাম সরকার গঠন, জননিরাপত্তা আইন বাতিল ও দ্রুত বিচার আইন কার্যকর, বিধবা ও বয়স্ক ভাতা সম্প্রসারণ এবং শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেওয়ার অঙ্গীকার পালন করছে জোট সরকার।

বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করা, উপজেলা ও জেলা পরিষদ গঠন করে স্থানীয় সরকারের এসব সংস্থাকে উন্নয়ন কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা, সরকারি বেতার-টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিসহ সরকারের সম্পদের হিসাব প্রকাশ সমপর্যায়ের সব ব্যক্তির সম্পদের হিসাব প্রকাশ করার সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার থাকলেও তা পূরণ করেনি বিএনপি-জামায়াতের নেতৃত্বে চারদলীয় জোট সরকার।

গত পাঁচ বছরে অসংখ্যবার রাজপথে নেমেছে দেশের সাধারণ মানুষ। কানসাটে বিদ্যুতের দাবিতে রাস্তায় নেমে পুলিশের গুলিতে জীবনও দিতে হয়েছে তাদের। রাজধানীর শনির আখড়ায় বিদ্যুৎ ও পানির দাবিতে রাস্তায় নেমে আসা সাধারণ মানুষের ধাওয়া খেয়ে পালিয়ে বাঁচতে হয়েছে প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ স্থানীয় সাংসদ সালাহ উদ্দিন আহমেদকে। রমজান মাসে দেশের বিভিন্ন স্থানেই বিদ্যুতের দাবিতে রাস্তায় নেমে ভাঙচুর করেছে বিক্ষুব্ধ মানুষ। জীবনযাত্রার সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে রাস্তায় নেমেছিল দেশের সবচেয়ে বেশি রপ্তানি আয়কারী তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। এমনকি নিজের থাকার জায়গাটুকু রক্ষা করতে ফুলবাড়ীতে বিতর্কিত এশিয়া এনার্জির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমে পুলিশের গুলিতে জীবন দিয়েছেন সাধারণ মানুষ।

Dhaka University Institutional Repository

আমদানি, রপ্তানি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, প্রবাসী-আয়, খেলাপি ঋণ, মুদ্রা সরবরাহ, সরকারি ব্যয়- অর্থনীতির প্রায় সব সূচকই ভালো। কিন্তু দেশের সীমিত আয়ের সাধারণ মানুষ ভালো থাকেনি। মূল্যস্ফীতি তাদের জীবনযাত্রার ব্যয়কে বাড়িয়ে দিয়েছে। মূল্যস্ফীতি মানেই মানুষের ক্রয় ক্ষমতাকে কমিয়ে নেওয়া। অর্থনীতির এই তত্ত্ব উল্টে দিয়ে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে বলে সরকারের নেতা-নেত্রীদের বক্তব্যে বিশ্বাস রাখেনি এসব মানুষ। বাজার নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থতায় সরকারের দুই বাণিজ্যমন্ত্রী ও এক উপদেষ্টার বদল হয়েছে। তারপরও পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি। মন্ত্রীরা তাদের ব্যর্থতার জন্য দায়ী করেছেন ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেটকে। কার্যত এ বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যেও কোনো সমন্বয় ছিল না। শেষ সময়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় উদ্যোগী হয়ে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থাকে মাঠে নামিয়েও সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিতে পারেনি এতটুকুও। ২০০১ - ২০০৬ পর্যন্ত এই পাঁচ বছরে যা কিছু সাফল্য তার প্রায় পুরোটাই ম্লান করে দিয়েছে এই দ্রব্যমুল্য পরিস্থিতি। বিদ্যুৎ-সংকট ম্লান করে দিয়েছে বাকিটা। যদিও সরকারের প্রথম বছরেই ১৩৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদান বাড়ানো হয়। বেসরকারি খাতে স্থাপিত মেঘনা ঘাট বিদ্যৎকেন্দ্র এ সরকারের সময়ে উৎপাদন শুরু করে।

জোট সরকার নির্বাচনী ইশতিহারে দুর্নীতি প্রসঙ্গে যে ওয়াদা করেছিলেন তা পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। যদিও দুর্নীতি দমন কমিশন বিল ২০০৪ সংসদে পাশ করে সরকার স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করেছে কিন্তু ২০০১ সালে ক্ষমতায় এসে তারা এ ব্যাপারে দীর্ঘদিন কোনো উদ্যোগ নেননি। বরং তারা প্রাক্তন সরকারের দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশে অধিক মনোযোগ দেয়। স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন হওয়া সত্ত্বেও আমলাতান্ত্রিক জাটিলতার কারণে এই কমিশন কাজ শুরু করতে পারেনি। কাজ পেতে হলে বিশেষ বিশেষ স্থানে কমিশন দিতে হয়-এ কথা মানুষের মুখে-মুখে। কাজ পাইয়ে দেওয়ার একটা বিশেষ গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে জোট সরকারের আমলে। এরা সবাই প্রভাবশালী, নেতা-নেত্রীদের আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠজন। সরকারের বিভিন্ন কাজে হস্তক্ষেপ ও নানা দুর্নীতি-অনিয়মের সঙ্গে 'হাওয়া ভবন'-এর নাম প্রচারে এসেছে বারবার। সরকারি কেনাকাটায় দুর্নীতি বন্ধে দাতাদের চাপে তৈরী হয়েছে সরকারি ক্রয় নীতিমালা। পরে একে আইনে রূপান্তর করা হয়েছে। বিধিমালা করেছে জোট সরকার, আবার এই বিধির ব্যত্যয় হয়েছে এ সরকারের সময়েই। মন্ত্রী, সাংসদ ও নেতাদের চাপে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) অনেক প্রশ্নবোধক প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এসব প্রকল্প একদিকে ভোটার ভুলিয়েছে, অন্যদিকে সুযোগ করে দিয়েছে দুর্নীতির।

Dhaka University Institutional Repository

জোট সরকার ক্ষমতা নেওয়ার পরপরই একের পর এক খুন, ডাকাতি ও সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনায় জনমনে ভীতি ও আতঙ্ক বেড়ে গিয়েছিল। এ সময়ে দেশব্যাপী জঙ্গি সন্ত্রাসেরও উত্থান ঘটে। সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া ও সাংসদ আহসান উল্লাহ মাষ্টার হত্যাকান্ড দেশে অস্থিরতা নিয়ে আসে। নিহত হন ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চারজন শিক্ষক। এর সঙ্গে যুক্ত হয় বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড, সন্ত্রাস দমনের নামে সেনাবাহিনী, র‍্যাব ও পুলিশের বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড ছিল দেশে-বিদেশে ব্যাপক সমালোচিত ও নিন্দিত ঘটনা।

গত পাঁচ বছরে আইন শৃংঙ্খলা বাহিনীর হেফাজতে বিনাবিচারে প্রায় এক হাজার মানুষ নিহত হয়। এর মধ্যে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) ও পুলিশের ক্রসফায়ারে সাড়ে নয়শ যৌথ বাহিনীর অভিযান অপারেশন ক্লিন হার্টে ৫৬ জন মারা যায়। এসব হত্যাকান্ডের কোনো বিচার হয়নি। অপারেশন ক্লিন হার্টের পর দায়মুক্তি দিয়ে সেনা হেফাজতে নিহতদের বিচার পাওয়ার পথ বন্ধ করা হয়। ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট দেশের ৬৩ জেলায় একযোগে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ছাড়াও ৩৮টি বোমা ও গ্রেনেড হামলার ঘটনা এ সরকারের সময় ঘটেছে। এসব বোমা গ্রেনেড হামলায় পুলিশ বিচারক আইনজীবীসহ ৯৭ জন নিহত হন। আহত হয়েছেন আরও কয়েক শ মানুষ। এ সময় দেশে বেশ কয়েকটি আলোচিত হত্যাকান্ড ঘটে। ২০০৩ সালে সবচেয়ে আলোচিত হয় চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও বিএনপির নেতা জামাল উদ্দিন অপহরণ ও হত্যার ঘটনা। যার সঙ্গে শাসক দল বিএনপির সাংসদের ভাইসহ ঘনিষ্ঠরা জড়িত বলে অভিযোগ উঠেছে।

জোট সরকারে পাঁচ বছর জুড়েই প্রশাসন ছিল অস্থির। চাকরিচ্যুত, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) হিসেবে রেখে দেওয়া, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, গণপদোন্নতি ও গণবঞ্চনা, জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন এবং দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ বদলীর কারণেই প্রশাসনে দেখা দেয় অস্থিরতা। আবার প্রশাসনের উচ্চপদে থেকে নির্বাচনী রাজনীতি করার কারণেও প্রশাসনের সমালোচনা ছিল ব্যাপক। মন্ত্রী-সচিব দূরত্ব, মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত কর্মকর্তাদের দুর্নীতি, প্রশাসনিক সংস্কারের অভাব, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা-এসব নিয়েই ছিল জোট সরকারের পাঁচ বছরের প্রশাসন।

জোট সরকারের পাঁচ বছরে উত্থান ঘটেছে হঠাৎ ধনী কিছু প্রভাবশালী মানুষের। এদের মধ্যে আছেন সরকারের মন্ত্রী সাংসদ, প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা ও তাদের ঘনিষ্ঠ কিছু ব্যবসায়ী। তারা একের পর এক ব্যবসা পেয়েছেন। গণমাধ্যমে প্রাধান্য বিস্তারের লক্ষ্য নিয়ে সরকারের ঘনিষ্ঠদের টেলিভিশন

Dhaka University Institutional Repository

চ্যানেল আর বেতারকেন্দ্র চালুর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সংবাদপত্রেও বিনিয়োগ করেছেন কেউ কেউ। বেসরকারি ব্যাংকের চেয়ারম্যান-পরিচালক হয়েছেন।

স্থানীয় পর্যায়েও তৈরি হয়েছে আরও প্রভাবশালী মানুষ। তারা টেন্ডারবাজি, কাজ ভাগাভাগি, চাঁদাবাজি, দখল-এসব করে বিপুল বিত্ত-বৈভবের মালিক হয়েছেন। মন্ত্রী-সাংসদের ছেলে, স্বজনেরা জড়িয়ে পড়েছেন এসব কর্মকান্ডে। একশ্রেণীর বড় আমদানিকারক-পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ী নানা সুযোগে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে পাঁচ বছরে বিপুল অর্থের মালিক হয়েছেন। সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি, বরং নানাভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধে জোট সরকার বহুলাংশেই সফল হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও বছরের শুরুতে পাঠ্যবই দিতে পেরেছে। মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারে পাঁচ'শ কোটি টাকার প্রকল্প অনিয়ম, অদক্ষতা ও দুর্নীতির কারণে সফল হয়নি। সরকার ক্ষমতায় আসার পর এক'শ দিনের কর্মসূচিতে শিক্ষা বিশেষজ্ঞ কমিটি এবং পরবর্তী সময়ে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করলেও এ দুটি প্রতিবেদন ফাইলবন্দী করে রাখা হয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়েও উচ্চ শিক্ষা স্তরে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে। জোট সরকারের পাঁচ বছর জুড়েই প্রায় সবকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চলেছে অবৈধ ও দলীয় নিয়োগ। এর মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ছিল শীর্ষে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আফতাব আহমাদকে নির্মমভাবে বাসায় ঢুকে হত্যা করা হয়।

সামাজিক নিরাপাত্তা বেষ্টনীর অর্ন্তভূক্ত বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি, বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা অসহায় মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচি এবং অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা প্রদান কার্যক্রমের আওতায় মাসিক ভাতার পরিমান ও উপভোগীয় সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি করা হয়। যোগাযোগের ক্ষেত্রে সারাদেশে ৫৫ হাজার কিলোমিটার নতুন সড়ক, ২৪টি বড় সেতুসহ ১৪ হাজার ২০৯ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু এবং ৩ হাজার ৪০৯ মিটার দীর্ঘ কালভার্ট নির্মাণ করে। দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচিতে ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের বাজেটে মোট সম্পদের ৫৪ শতাংশ বরাদ্দ করে।

ধূমপান বিরোধী আইন করে ধূমপানের বিজ্ঞাপন বন্ধ করা হয়েছে। সিএনজি অটোরিক্সা চালু হওয়ায় রাজধানীতে পরিবেশ দূষণ কিছুটা কমলেও সিএনজি পাম্প স্টেশন নির্মাণ এবং অটোরিক্সা আমদানি

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে এ সরকার অনেক কেলেঙ্কারির জন্ম দিয়েছে। সংসদীয় স্থায়ী কমিটি যোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমূল হুদার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তের উদ্যোগ নিয়েও পিছিয়ে যায়। ক্ষমতায় আসার পরপরই সরকার পলিথিন ব্যাগের উৎপাদন ও ব্যবহার বন্ধ করে দেয়। তবে দখল, দূষণ এবং অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে আধুনিক ঢাকা গড়ে তোলার অঙ্গীকার পাঁচ বছরেও পূরণ হয়নি। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি পরিবর্তনের ফলে সুফলের চেয়ে কুফল হয়েছে বেশি। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচন দেওয়া হয়নি।

জোট সরকারের মেয়াদকালে দূর্ঘটনার সংখ্যাও ছিল অস্বাভাবিক। লঞ্চ দূর্ঘটনায় কয়েক হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এর পাশাপাশি পোশাক কারখানার বেশ কয়েকটি অগ্নিকান্ড ও ভবন ধ্বস এবং শাখারীবাজার পুরোনো বাসভবন ধ্বসে মানুষ মারা গেছে অনেক। সাংবাদিকেরা এই পাঁচ বছর আতঙ্কে কাটিয়েছেন। হুমকি-হামলা-মামলার ঘটনা ঘটেছে অসংখ্য। ২০০২ সালে থেকে অক্টোবর ২০০৬ পর্যন্ত খুন হয়েছেন আটজন সাংবাদিক। জোট সরকার ক্ষমতা নেওয়ার পরপর আদমজী পাটকল বন্ধ করে দেয়। আর শেষ সময়ে সৌদি যুবরাজের কাছে রূপালী ব্যাংক বিক্রির প্রক্রিয়া চলছিল। মাঝে ভারতের শিল্পগোষ্ঠী টাটার তিন'শ কোটি ডলার বিনিয়োগ ব্যাপক আলোচনার জন্ম নিলেও সরকার ছিল সিদ্ধান্তহীন।

জোট সরকারের পাঁচ বছরে সংসদ ছিল মূলত অকার্যকর। শেষ সময়ের সংলাপ ছাড়া বিরোধী দলের সঙ্গে সরকারি দলের ছিল যোজন দূরত্ব। বিরোধী দল হরতাল-অবরোধ করে সরকারকে ব্যস্ত রাখতে চেয়েছে। আর পুলিশের কাজ ছিল তাদের রাস্তায় স্বস্তিতে থাকতে না দেওয়া। জোট সরকারের শরিকদের মধ্যে ও ছিল নানা টানাপোড়েন। রাষ্ট্রপতি পদ থেকে সরে যেতে হয়েছে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব অধ্যাপক ডা. এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে। তিনি গঠন করেছেন নতুন রাজনৈতিক দল। স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য কর্নেল (অব:) অলি আহমদ নতুন দল করেছিলেন। রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ড. ইয়াজ উদ্দিন আহম্মেদের অসুস্থতা নিয়েও ছিল নানা জল্পনা। বিএনপির মধ্যে নবীন-প্রবীণের দূরত্ব ক্রমেই বেড়েছে। সাবেক স্বৈরশাসক এইচ এম এরশাদকে সরকারি জোটে টানার চেষ্টা এবং একের পর এক দুর্নীতি মামলায় তার খালাস পাওয়া নিয়েও মানুষের মধ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় এ সরকারের আন্তরিকতা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। ইসলামি জঙ্গিদের পৃষ্ঠপোষকতা, নাটকীয়ভাবে জঙ্গি নেতাদের গ্রেফতার, তাদের বিচার ও শাস্তি কার্যকরের চেষ্টা নিয়েও হয়েছে নানা রাজনীতি।

Dhaka University Institutional Repository

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, জোট সরকারের (২০০১ - ২০০৬) শাসনামল সুশাসনের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত না হলেও তার ইতিবাচক ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। বরং ১৯৯১ সালের গণতন্ত্র যে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে, তার ধারাবাহিকতা রক্ষার মাধ্যেমে জোট সরকার (২০০১ - ২০০৬) সুশাসন বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১. বাংলাদেশের বিভিন্ন সংসদের মেয়াদ ঃ

সংসদ	মেয়াদকাল	মোট সময়
প্রথম জাতীয় সংসদ	৭ এপ্রিল, ১৯৭৩-৬ নভেম্বর, ১৯৭৫	২ বছর ৬ মাস
দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ	২ এপ্রিল, ১৯৭৯-২৪ মার্চ, ১৯৮২	২ বছর ১১ মাস
তৃতীয় জাতীয় সংসদ	১০ জুলাই, ১৯৮৬-৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৭	১ বছর ৫ মাস
চতুর্থ জাতীয় সংসদ	১৫ এপ্রিল, ১৯৮৮-৬ ডিসেম্বর, ১৯৯০	২ বছর ৭ মাস
পঞ্চম জাতীয় সংসদ	৫ এপ্রিল, ১৯৯১-২৪ নভেম্বর, ১৯৯৫	৪ বছর ৮ মাস
ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ	১৯ মার্চ, ১৯৯৬-৩০ মার্চ, ১৯৯৬	১২ দিন
সপ্তম জাতীয় সংসদ	১৪ জুলাই, ১৯৯৬-১৩ জুলাই, ২০০১	৫ বছর
অষ্টম জাতীয় সংসদ	২৮ অক্টোবর, ২০০১-২৭ অক্টোবর, ২০০৬	৫ বছর

উৎস ঃ গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অষ্টম জাতীয় সংসদ ২০০১ - ২০০৬, টিআইবি

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ২. অষ্টম জাতীয় সংসদ ঃ ২০০১-২০০৬ সংক্রান্ত তথ্যাবলী ঃ

১।	নির্বাচনের তারিখ	ঃ	১ অক্টোবর ২০০১
২।	অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল	ঃ	৫৫টি
৩।	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী	ঃ	১৯৩৯ জন
৪।	মোট ভোটার	ঃ	৭,৪৯,৪৬,৩৬৮ জন
৫।	মোট প্রদত্ত ভোট	ঃ	৫,৬১,৮৫,৭০৭ টি
৬।	প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার	ঃ	৭৪.৭৩%
৭।	জামানত	ঃ	১০,০০০ (দশ হাজার টাকা মাত্র)
৮।	প্রথম অধিবেশন	ঃ	২৮ অক্টোবর ২০০১
৯।	মোট অধিবেশন	ঃ	২৩ টি
১০।	মোট কার্যদিবস	ঃ	৩৭৩
১১।	সংসদ বিলুপ্তি	ঃ	২৭ অক্টোবর ২০০৬
১২।	মেয়াদ কাল	ঃ	৫ বছর
১৩।	দলগত সাংসদ	ঃ	চারদলীয় ঐক্যজোট
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	ঃ	১৯৩ + (মহিলা ৩৬)
	জামায়াতে ইসলামি বাংলাদেশ	ঃ	১৭ + (মহিলা ৪)
	জাতীয় পার্টি (এন এফ)	ঃ	৪
	ইসলামী ঐক্যজোট	ঃ	২ + (মহিলা ২)
	আওয়ামী লীগ	ঃ	৬২
	জাতীয় পার্টি (ইসলামী ঐক্যফ্রন্ট)	ঃ	১৪ + (মহিলা ৩)
	জাতীয় পার্টি (ম)	ঃ	১
	কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	ঃ	১
	স্বতন্ত্র	ঃ	৬
	মোট	ঃ	৩০০ + ৪৫ (মহিলা) = ৩৪৫

Dhaka University Institutional Repository

১৪।	রাষ্ট্রপতি	ঃ	অধ্যাপক একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী (১৪-১১-০১ হতে ২১-০৬-০২)
		ঃ	ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার (ভারপ্রাপ্ত) (২১-০৬-০২ হতে ০৬-০৯-০২)
		ঃ	প্রফেসর ডঃ ইয়াজউদ্দিন আহমেদ (০৬-০৯-০২)
১৫।	স্পিকার	ঃ	ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার
১৬।	প্রধানমন্ত্রী	ঃ	বেগম খালেদা জিয়া
১৭।	সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা	ঃ	শেখ হাসিনা
১৮।	ডেপুটি স্পিকার	ঃ	আখতার হামিদ সিদ্দিকী
	সংসদ উপনেতা	ঃ	নাই
	বিরোধী দলীয় নেতা	ঃ	এ্যাডভোকেট আব্দুল হামিদ
১৯।	চীফ হুইপ	ঃ	খন্দকার দেলোয়ার হোসেন
২০।	বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ	ঃ	উপাধক্ষ আবদুস শহীদ
২১।	প্রধান নির্বাচন কমিশনার	ঃ	আবু সাঈদ

উৎস ঃ এ.বি.এম. রিয়াজুল কবীর কাওছার, বাংলাদেশ নির্বাচন, ঢাকা ঃ আগামী প্রকাশনী, ২০০৬।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

ইংরেজি বই

1. Alamgir, F.,et al, *Corruption and Parliamentary oversight: Primacy of the Political will*, TIB, 2007.
2. Ahmed, N., *Limits of Parliamentary Control, Public Spending in Bangladesh*, Dhaka: UPL, 2006.
3. Ahmed, N., *The Parliament of Bangladesh, Dhaka: Ashgate Publication Limited*, England, 2002.
4. Ahmed Moudud, *Democracy and the challenge of Development* [A study of Politics and military intervention in Bangladesh] Dhaka: UPL, 1995.
5. Ahmed Sharif Uddin, (edt), *Dhaka Past Present Future*, Dhaka: The Asiatic Society of Bangladesh, 1991.
6. Hassanuzzaman. M., *Role of Opposition in Bangladesh Politics*, Dhaka: UPL, 1998.
7. Hye, Hasnat Abdul (edt), *Governance South Asian Perspectives*, Dhaka: UPL, 2000.
8. Human Development in South Asia 1999, *The crisis of Governance*, Dhaka: UPL, 1999.
9. Jahan Rounaq, *Pakistan Failure in National Integration*, [First Bangladesh edition] UPL, 1994.
10. Khan M.M., *Good Governance: Concept and Bangladesh case*, (Paper presented at the special meeting of the commonwealth society of Bangladesh held on October 31- November 2, 1997 at Dhaka.
11. Maniruzzaman, Talukder, *The Bangladesh Revolution and its After math*, Dhaka: UPL, [second Edition] 1988.
12. Rahim, Aminur, *Polities and National Formation in Bangladesh*, Dhaka: UPL, 1997.
13. Sobhan Rehman, *Bangladesh Problems of Governance*, Dhaka: UPL, 1993.
14. V.A. Pai Panandiketc (ed), *Problems of Governance South Asia, Dhaka*, University press Limited, 2000.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা বই

১. অনাদি কুমার মহাপাত্র, *নির্বাচিত শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি*, ১৯৯৯।

২. অসীম কুমার সাহা, *বাংলাদেশের সাংবিধানিক ইতিহাস*, ঢাকা ঃ গতিধারা প্রকাশনা, ২০০৮।

৩. আইনুল ইসলাম, *বাংলাদেশ সচিত্র সংসদ*, ২০০১।

৪. আজিজুল ইসলাম ভূইয়া, *বিএনপি ও সাম্প্রতিক রাজনীতি*, ঢাকা ঃ শ্রাবণ প্রকাশনী, ২০০৭।

৫. আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি*, ঢাকা ঃ অনন্যা প্রকাশনী, ২০০৭।

৬. আব্দুল হক, *লেখকের রোজনামচায়, চার দশকের রাজনীতি পরিক্রমা প্রেক্ষাপট ঃ বাংলাদেশ* ১৯৫৩-১৯৯৩, নূরুল হুদা সম্পাদিত, ঢাকা ঃ ইউপিএল, ১৯৯৬।

৭. আব্দুর রহমান, *আমাদের নেত্রী খালেদা জিয়া*, ঢাকা ঃ শিশু ঘর, ২০০৪।

৮. আতিউর রহমান, *সুশাসনের সন্ধানে*, ঢাকা ঃ অন্য প্রকাশ, ২০০৩।

৯. আমিনুর রশিদ ও মোস্তফা ফিরোজ, *প্রামান্য সংসদ ২০০১*, ঢাকা ঃ ২০০২।

১০. আবুল মনসুর আহমেদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবিস্থান, ১৯৭৫।

১১. আতাউর রহমান খান, *প্রধান মন্ত্রীত্বের নয় মাস*, ঢাকা ঃ মোহনা প্রকাশনী, (দ্বিতীয় প্রকাশ) ১৯৯১।

১২. আতাউর রহমান খান, *স্বৈরাচারের দশ বছর*, ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবিস্থান, ১৯৯১।

১৩. ড. আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের রাজনীতি, সংস্কৃতির স্বরূপ*, ঢাকা ঃ অনন্যা প্রকাশনী, ২০০৭।

১৪. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, *সমাজ রাজনীতি ও সমকাল*, ঢাকা ঃ ঐতিহ্য প্রকাশ, ২০০৮।

১৫. আবুল কালাম মনজুর মোর্শেদ, *গনতন্ত্রের বিশ্বাস ও প্রয়োগ*, ঢাকা ঃ গ্লোব লাইব্রেরী প্রাইভেট লিঃ, ২০০৩।

১৬. আহমেদ মুসা, *ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ*, ঢাকা ঃ ইন্টারমেক্স, ২০০৯।

১৭. ইকবাল হোসেন সানু, *১৯৭১-২০০৩ দেশনেত্রী খালেদা জিয়া*, ২০০২।

১৮. ড. এমাজউদ্দীন আহমদ, *তুলনামূলক রাজনীতি ঃ রাজনৈতিক বিশ্লেষণ*, ঢাকা ঃ গোল্ডেন বুক হাউজ, [২য় সংস্করণ], ১৯৮১।

১৯. ড. এমাজউদ্দীন আহমেদ, *বাংলাদেশ রাজনীতি কিছু কথা ও কথকতা*, ঢাকা ঃ মৌলি প্রকাশনী, ২০০২।

Dhaka University Institutional Repository

২০. এ.বি.এম. রিয়াজুল কবীর কাওছার, *বাংলাদেশ নির্বাচন*, ঢাকা ঃ আগামী প্রকাশনী, ২০০৬।

২১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ২০০১।

২২. জালাল ফিরোজ, *পার্লামেন্ট কিভাবে কাজ করে ঃ বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা*, ঢাকা ঃ নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৩।

২৩. তারেক শামসুর রেহমান, *বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও রাজনীতি*, ঢাকা ঃ উত্তরণ, ২০০০।

২৪. তারেক শামসুর রেহমান, *বাংলাদেশ রাজনীতির এক দশক*, ঢাকা ঃ গ্রন্থমেলা, ২০০৩।

২৫. তারেক শামসুর রেহমান, *বাংলাদেশে গনতন্ত্র*, ঢাকাঃ কথা প্রকাশ, ২০১০।

২৬. তারেক শামসুর রেহমান, *গণতন্ত্র সুশাসন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ঢাকা ঃ দীপ্তি প্রকাশনী, ২০০৬।

২৭. তারেক শামসুর রেহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশ রাজনীতির চার দশক*, ঢাকা ঃ শোভা প্রকাশ, ২০০৯।

২৮. তালুকদার মনিরুজ্জামান, *বাংলাদেশের রাজনীতি সংকট ও বিশ্লেষণ*, ঢাকা ঃ শুভ প্রকাশন, ২০০৩।

২৯. তানভীর মাহমুদ, *গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অষ্টম জাতীয় সংসদ (২০০১-২০০৬)*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০০৭।

৩০. দীনেশ দাস, *বেগম জিয়ার ৫ বছর*, ঢাকা ঃ উত্তরা প্রকাশনী, ১৯৯৬।

৩১. নূরুল হুদা সম্পাদিত, *লেখকের রোজনামচায় চার দশকের রাজনীতি পরিক্রমা প্রেক্ষাপট ঃ বাংলাদেশ ১৯৫৩-৯৩*, ঢাকা ঃ ইউ.পি.এল, ১৯৯৬।

৩২. ড. নাজমূল আহসান কলিম উল্লাহ, ড.এ কে এম রিয়াজুল হাসান, মোশারফ হোসেন মুসা, *গণতন্ত্র, নির্বাচন ও স্থানীয় সরকার*, ঢাকা ঃ জনপ্রিয় প্রকাশনী, ২০১২।

৩৩. অধ্যাপক নীল কমল বিশ্বাস, *বাংলাদেশের রাজনীতি একাত্তর থেকে আটানব্বই*, ঢাকা ঃ এশিয়া পাবলিকেশনস, ২০০১।

৩৪. ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি কর্তৃক সম্পাদিত, *সংবাদপত্রে তারেক জিয়ার দুর্নীতি*, ঢাকা ঃ ২০০৭।

৩৫. *ফিরে দেখা খালেদা জিয়া-নিজামী সরকারের প্রথম বছর*, ঢাকা ঃ যুবলীগ কর্তৃক প্রকাশিত, ২০১০।

৩৬. বদরউদ্দীন উমর, *নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ*, ঢাকা ঃ সুবর্ণ প্রকাশনী, ১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

৩৭.মওদুদ আহ্মদ, *বাংলাদেশ ঃ শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল*, ঢাকা ঃ ইউ.পি.এল. ১৯৮১।

৩৮.মওদুদ আহ্মদ, *স্বায়ত্বশাসন থেকে স্বাধীনতা*, ঢাকা ঃ ইউ.পি.এল ১৯৯২।

৩৯.ড. মাহবুবুর রহমান খোরশেদ, "*সুশাসন ও উন্নয়ন*" আব্দুল লতিফ মাসুম (সম্পাদিত) একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ ঃ সার্বিক উন্নয়ন সমীক্ষা, ঢাকা ঃ আফসার ব্রাদার্স, ২০০১।

৪০.মাহ্মুদ শফিক, *বাংলাদেশের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়*, ঢাকা ঃ বর্ণবীনা, ১৯৯৩।

৪১.মাহ্মুদ শফিক, *গণতন্ত্রের সংকট*, ঢাকা ঃ বর্ণবীনা, ২০০৬।

৪২.মিজানুর রহমান খান, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটের স্বরূপ*, ঢাকা ঃ শুভ প্রকাশ, ২০০৩।

৪৩.মুনতাসীর মামুন, আইন, *আদালত ও জনতা*, ঢাকা ঃ অনুপম প্রকাশনী, ২০০৫।

৪৪.মুনতাসীর মামুন, *বাংলাদেশের রাজনীতি ঃ এক দশক (১৯৮৮-১৯৯৮)* ঢাকা ঃ অনন্যা প্রকাশনী, ১৯৯১।

৪৫.মুনতাসীর মামুন, *নতুন শতকের রাজনীতি*, ঢাকা ঃ অনন্যা প্রকাশনী, ২০০৫।

৪৬.মোস্তফা কামাল, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট ঃ খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনা এবং অন্যান্য প্রসংগ*, ঢাকা ঃ শিব্বির প্রকাশনী, ১৯৯৬।

৪৭.মোনায়েম সরকার, *বাংলাদেশের গণতন্ত্রায়নের সমস্যা ও সম্ভাবনা*, ঢাকা ঃ মিজান পাবলিশার্স, ২০০৯।

৪৮.ড. মোহাম্মদ আদুল ওদুদ ভূঁইয়া, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন*, ঢাকা ঃ আজিজিয়া বুক ডিপো, (নবম প্রকাশ) ২০০৯।

৪৯.মোহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, *জোট শাসনামল ঃ রাজনীতির চালচিত্র*, ঢাকা ঃ অসডার পাবলিকেশন্স, ২০০৬।

৫০. মোহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, *অভিনব সরকার ব্যতিক্রম নির্বাচন*, ঢাকা ঃ এ.এইচ. ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ, ২০০৯।

৫১.মোহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, *সন্ত্রাস দুর্নীতি ও আগ্রাসন*, ঢাকা ঃ আখতার পাবলিকেশন্স, ২০০১।

৫২.মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত, *গণতন্ত্র*, ঢাকা ঃ মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৬।

৫৩.রেহমান সোবহান, *আমার সমালোচক আমার বন্ধু*, ঢাকা ঃ সিপিডি, ২০০৭।

Dhaka University Institutional Repository

৫৪.বিগ্রেডিয়ার শামসুদ্দীন আহমেদ (অবঃ), *বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতি*, ঢাকা ঃ আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯৬।

৫৫.শাহরিয়ার কবির, *গণ আদালতের পটভূমি*, ঢাকা ঃ দিব্য প্রকাশ, ১৯৯৩।

৫৬.শাহরিয়ার কবির, *বাংলাদেশে জঙ্গী মৌলবাদ*, ঢাকা ঃ অনন্যা প্রকাশনী, ২০০৬।

৫৭.শিরীন মজিদ, *শেখ মুজিব থেকে খালেদা জিয়া*, ঢাকা ঃ কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৩।

৫৮.সাইফুদ্দিন আহ্মেদ, *লোকপ্রশাসন ও বাংলাদেশ ঃ প্রাসঙ্গিক ভাবনা*, ঢাকা ঃ অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৯৮।

৫৯.সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১ঃ প্রথম খন্ড, (রাজনৈতিক)*, ঢাকা ঃ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩।

৬০.ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশ রাষ্ট্র, রাজনীতি, গণতন্ত্র ও সুশাসন*, ঢাকা ঃ বাংলা প্রকাশন, ২০০৬।

৬১.ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের রাজনীতি*, ঢাকা ঃ দিব্য প্রকাশ, ২০০৩।

৬২.ড. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা*, ঢাকা ঃ নবযুগ প্রকাশনী, ২০১২।

৬৩.ড. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের ক্রমবিকাশ ১৯৬১-২০০১*, ঢাকা ঃ হাসিনা প্রকাশনা, ২০০৩।

৬৪.ড. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, ঢাকা ঃ নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০১।

৬৫.ড. হাসান উজ্জামান, *নব প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থা*, ঢাকা ঃ অক্ষর প্রকাশনী, ১৯৯২।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজি জার্নাল ও প্রতিবেদন

1. Dr. Ataur Rahman, Challenges of Governance in Bangladesh, *BIIS Journal*, vol-14, No-4, 1993.
2. Md. Sohrab Hossain, Perception of Good Governance in Bangladesh, *BPSR Journal*, Volume-2, No-1, December 2004.
3. Prof. A.K.M Shahidullah, Corruption and development: Bangladesh Perspective, *BPSR Journal*, Vol-3, No-1, December 2005.
4. Dr. Gyasuddin Molla, Bangladesh's Imperiled Democracy: Change in Political culture and strengthening capacity Building-A-Sine Qua Non, *BPSR Journal,* Vol-3, No-1, December 2005.
5. Human Rights in Bangladesh 2001, ASK.
6. Human Rights in Bangladesh, 2002, ASK.
7. Human Rights in Bangladesh, 2003, ASK.
8. Human Rights in Bangladesh, 2004, ASK.
9. Human Rights in Bangladesh, 2005, ASK.
10. Human Rights in Bangladesh, 2006, ASK.
11. Corruption Database 2002, TIB.
12. Corruption Database 2003, TIB.
13. Corruption Database 2004, TIB.
14. Corruption Database 2005, TIB.
15. Corruption Database 2006, TIB.

Dhaka University Institutional Repository

পত্র-পত্রিকা ঃ ইংরেজি

1. *The Daily Star*, (Dhaka), 2 December, 2001.
2. *The Daily Star*, (Dhaka), 3 December, 2001.
3. *The Daily Star*, (Dhaka), 10 December, 2001.
4. *The Daily Star*, (Dhaka), 25 December, 2001.
5. *The Daily Star*, (Dhaka), 14 March, 2004.
6. *The Daily Star*, (Dhaka), 15 February, 2005.
7. *The Daily Star*, (Dhaka), 18 September, 2005.
8. *The Daily Star*, (Dhaka), 17 January, 2006.
9. *The Daily Star*, (Dhaka), 13 February, 2006.
10. *The New age* (Dhaka), 3 April, 2006.
11. *The Daily Star*, (Dhaka), 10 may, 2006.
12. *The Daily Star*, (Dhaka), 23 may, 2006.
13. *The Daily Star*, (Dhaka), 30 may, 2006.
14. *The New age*, (Dhaka), 10 July, 2006.
15. *The Daily Star*, (Dhaka), 13 October, 2006.
16. *The Daily Star*, (Dhaka), 6 November, 2006.
17. *The Daily Star*, (Dhaka), 20 November, 2006.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা প্রতিবেদন

১. অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় ২০০৫, *বাজেট বক্তৃতা*, ২০০৫-২০০৬।

২. ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, *সংসদ নির্দেশিকা এবং স্পিকার- সংসদ- জনগণ*, ২০০০।

৩. ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, *পার্লামেন্ট ওয়াচ সিরিজ প্রতিবেদন*, ২০০২-২০০৬।

৪. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, *প্রথম - সপ্তদশ অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ*।

৫. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *দৈনিক বুলেটিন ও কার্যাবাহের সারাংশ*।

৬. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *অষ্টম জাতীয় সংসদে সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রথম রিপোর্ট*, নভেম্বর ২০০৫।

৭. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *অষ্টম জাতীয় সংসদের যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রথম রিপোর্ট*, জুন ২০০৬।

৮. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ও খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, *বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক বিনিয়োগের গতি প্রকৃতি*, পেপার ৫৭, CPD Occasional paper series, ফেব্রুয়ারি ২০০৬।

৯. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় কর্তৃক প্রকাশিত সংসদ সদস্যদের দলভিত্তিক নামের তালিকা, ৩১ তম সংস্করণ।

১০. বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা উত্তরণের উপায়, টিআইবি, ২০১০।

Dhaka University Institutional Repository

পত্র -পত্রিকা ঃ বাংলা

১। *দৈনিক সংবাদ*, (ঢাকা), ১ জানুয়ারি, ২০০১।

২। *ভোরের কাগজ*, (ঢাকা), ২ এপ্রিল, ২০০১।

৩। *যুগান্তর*, (ঢাকা), ২৩ এপ্রিল, ২০০১।

৪। *দৈনিক প্রথম আলো*, (ঢাকা), ২৮ এপ্রিল, ২০০১।

৫। *দৈনিক প্রথম আলো*, (ঢাকা), ১৭ মে, ২০০১।

৬। *দৈনিক ইত্তেফাক*, (ঢাকা), ১৯ জুন, ২০০১।

৭। *দৈনিক ইত্তেফাক*, (ঢাকা), ২৭ জুন, ২০০১।

৮। *দৈনিক প্রথম আলো*, (ঢাকা), ৭ অক্টোবর, ২০০১।

৯। *যুগান্তর*, (ঢাকা), ২৪ নভেম্বর, ২০০১।

১০। *দৈনিক প্রথম আলো*, (ঢাকা), ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০২।

১১। *ভোরের কাগজ*, (ঢাকা), ২০ জানুয়ারি, ২০০৩।

১২। দৈনিক সংবাদ, (ঢাকা), ২৮ মার্চ, ২০০৩।

১৩। *দৈনিক প্রথম আলো*, (ঢাকা), ১২ এপ্রিল, ২০০৩।

১৪। *ভোরের কাগজ*, (ঢাকা), ১৭ এপ্রিল, ২০০৩।

১৫। *ভোরের কাগজ*, (ঢাকা), ১১ মে, ২০০৩।

১৬। *জনকণ্ঠ*, (ঢাকা), ২৪ অক্টোবর, ২০০৩।

১৭। *যুগান্তর*, (ঢাকা), ১০ নভেম্বর, ২০০৩।

১৮। *ইনকিলাব*, (ঢাকা), ২৪ ডিসেম্বর, ২০০৩।

১৯। *দৈনিক প্রথম আলো*, (ঢাকা), ২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫।

২০। *দৈনিক প্রথম আলো*, (ঢাকা), ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫।

২১। *দৈনিক প্রথম আলো*, (ঢাকা), ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫।

২২। *দৈনিক প্রথম আলো*, (ঢাকা), ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫।

২৩। *দৈনিক প্রথম আলো*, (ঢাকা), ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

২৪। *দৈনিক প্রথম আলো*, (ঢাকা), ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫।

২৫। *দৈনিক প্রথম আলো*, (ঢাকা), ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫।

২৬। *দৈনিক প্রথম আলো*, (ঢাকা), ৩ মার্চ, ২০০৫।

২৭। *দৈনিক প্রথম আলো*, (ঢাকা), ১২ মার্চ, ২০০৫।

২৮। *দৈনিক প্রথম আলো*, (ঢাকা), ১৫ মার্চ, ২০০৫

২৯। *ভোরের কাগজ*, (ঢাকা), ২৩ মার্চ, ২০০৫।

৩০। *যুগান্তর*, (ঢাকা), ২৫ মার্চ, ২০০৫।

৩১। *দৈনিক প্রথম আলো*, (ঢাকা), ২৯ মার্চ, ২০০৫।

৩২। *দৈনিক প্রথম আলো*, (ঢাকা), ১১ এপ্রিল, ২০০৫

৩৩। *দৈনিক প্রথম আলো*, (ঢাকা), ২১ এপ্রিল, ২০০৫।

৩৪। *দৈনিক প্রথম আলো*, (ঢাকা), ২৮ এপ্রিল, ২০০৫।

৩৫। *দৈনিক প্রথম আলো*, (ঢাকা), ১ মে, ২০০৫।

৩৬। *দৈনিক প্রথম আলো*, (ঢাকা), ১৬ মে, ২০০৫।

৩৭। *দৈনিক প্রথম আলো*, (ঢাকা), ২১ মে, ২০০৫।

৩৮। *দৈনিক প্রথম আলো*, (ঢাকা), ২২ মে, ২০০৫।

৩৯। *দৈনিক প্রথম আলো*, (ঢাকা), ২৫ মে, ২০০৫ ।

৪০। *দৈনিক প্রথম আলো*, (ঢাকা), ২৭মে, ২০০৫।

৪১। *দৈনিক প্রথম আলো*, (ঢাকা), ৫ জুন, ২০০৫।

৪২। *দৈনিক প্রথম আলো*, (ঢাকা), ৯ জুন,২০০৫।

৪৩। *দৈনিক প্রথম আলো*, (ঢাকা), ২৭ জুন, ২০০৫।

৪৪। *দৈনিক প্রথম আলো*, (ঢাকা), ১০ জুলাই, ২০০৫।

৪৫। *দৈনিক প্রথম আলো*, (ঢাকা), ১৮ জুলাই, ২০০৫।

৪৬। *দৈনিক প্রথম আলো*, (ঢাকা), ২৫ জুলাই, ২০০৫।

৪৭। দৈনিক সংবাদ, (ঢাকা), ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

৪৮। *দৈনিক প্রথম আলো*, (ঢাকা), ১১ অক্টোবর, ২০০৫।

৪৯। *ভোরের কাগজ*, (ঢাকা), ১২ ডিসেম্বর, ২০০৫।

৫০। *দৈনিক প্রথম আলো*, (ঢাকা), ১৩ ডিসেম্বর, ২০০৫।

৫১। *দৈনিক প্রথম আলো*, (ঢাকা), ৯ অক্টোবর, ২০০৬।

৫২। *দৈনিক প্রথম আলো*, (ঢাকা), ১০ অক্টোবর, ২০০৬।

৫৩। *দৈনিক প্রথম আলো*, (ঢাকা), ১২ অক্টোবর, ২০০৬।

৫৪। *দৈনিক প্রথম আলো*, (ঢাকা), ৭ নভেম্বর, ২০০৬।

৫৫। *দৈনিক প্রথম আলো*, (ঢাকা), ৯ নভেম্বর, ২০০৬।

৫৬। *দৈনিক প্রথম আলো*, (ঢাকা), ৩০ নভেম্বর, ২০০৬।